চাঁদমামা
সেরা গল্প সমগ্র

সেরা গল্প সমগ্র

১

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Chandmama Sera Golpo Samagra vol 1

প্রথম : প্রকাশ অগাস্ট ২০২১

সম্পাদক : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : কামিল দাস

ফ্যালকন-গ্রুপ এর পক্ষে সঞ্জয় কুমার সিং ও সঞ্জীব কুমার সিং কর্তৃক ৮১/বি, ব্লক সি, নজফগড় রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লী, ১১০০১৫ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রক : ফ্যালকন ডিজিটাল, নয়াদিল্লী, ১১০০১৮

ফ্যালকন-গ্রুপ এর আসন্ন পত্রিকা ও বইতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করতে ই-মেইল করুন : mail.freedom.group@gmail.com

যে কোনো অভিযোগ জানাতে, জিজ্ঞাসা করতে, সত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে, রয়্যালটি বিষয়ক প্রশ্ন করতে ই-মেইল করুন : book.falcong@gmail.com

লেখা পাঠানোর জন্য ই-মেইল করুন : mail.editor.falcon@gmail.com

সূচিপত্র

১. মানুষের স্বভাব

কোনো এক গ্রামে দাসু নামে এক কিষান ছিল। তার জমির ফসল দিয়ে সারাবছর কোনোরকমেই চলত না। তাই তাকে ধার করতে হত। ধার বাড়তে বাড়তে এমন দিন এল যখন সে আর ওই ধার শোধ করতে পারল না।

'থাকলে খাব আর না থাকলে উপোসে কাটাব। জমি বিক্রি করে ধার শোধ করে দেওয়াই ভালো। এই কথা দাসুর বউ বলল। দাসু জমি বিক্রি করতে চেষ্টা করতে লাগল। বিপদে পড়ে বিক্রি করছে জেনে গ্রামের লোক জলের দামে কিনতে চাইল তার জমি।'

ওই গ্রামেই শ্রীনিবাস নামে আর এক জন কিষান ছিল।

ঠাকুরদার আমলে দাসুদের অবস্থা ভালোই ছিল। সেই আমলে শ্রীনিবাসদের ঠাকুরদারা দাসুদের ঠাকুরদাদের কাছে সাহায্য নিয়ে ছিল। তাই শ্রীনিবাস ন্যায্য দর দিয়ে দাসুর জমি কিনল।

সেই টাকা দিয়ে দাসু সমস্ত ধার শোধ করে সংসার চালাবার জন্য দিনমজুরি করতে বেরুল। সেই কথা জানতে পেরে শ্রীনিবাস দাসুকে বলল, 'মজুরিই যদি করতে হয় তো তোমার বিক্রি করা জমিতেই কাজ কর না কেন। তোমার খরচ চালাবার ভার আমি নিচ্ছি।'

'তাহলে তো ভালোই। আমার কাছে আপনি ভগবান।' দাসু বলল। এবং সেই দিন থেকেই শ্রীনিবাসের জমিতে কাজে লেগে গেল।

একদিন জমিতে কাজ করার সময় দাসুর লাঙ্গলের ফলায় কী যেন ঠেকল। জমি খুঁড়ে দেখে দুটি ঘড়া। ঘড়াগুলো তুলে তার মুখ খুলে দেখতে পেল তার ভেতর রয়েছে অনেক সোনার অলংকার এবং মোহর।

দাসু তাড়াতাড়ি সেই ঘড়া দুটো বয়ে আনল শ্রীনিবাসের বাড়িতে। দাসু বলল, 'ঘড়া দুটো সাবধানে রাখুন। এসব আপনার জমিতেই পেয়েছি। খেতে লাঙ্গল আর বলদ রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

দাসুর কাণ্ড দেখে শ্রীনিবাস অবাক হল। এতখানি সততায় সে আশ্চর্য হল। পরে বলল, দাসু, তোমার সততার জন্য কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না। এত অলংকার গিনি তুমি রেখে দিতে পারতে। আর তা না করে তুমি আমার বাড়িতে এনে দিলে! শোনো, ওই জমিটা তো তোমার কাছ থেকেই কিনেছি। তাই ন্যায় বিচারে ঘড়াগুলো তোমারই।'

'তা কি কখনো হয়। ওই জমি আপনার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। অতএব, ওই জমিতে যা পাওয়া যাবে সব আপনারই। আমার কী করে হবে? আপনি দয়া করে আপনার ওই জমিতে আমাকে কাজ করতে দিলেন। ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে দিয়েও ওই জমিতে কাজ করাতে পারতেন। দাসু বলল।

'দেখ দাসু, জমিতে যে ফসল উঠবে তার উপর আমার হক আছে ঠিক কিন্তু তাই বলে এসব উঠলে কি আমার নেওয়া উচিত? আমি কে সেরকম দাম দিয়ে কিনেছি? এ জমিতে তুমি কেন অন্য কোনো লোক কাজ করলেও এই ঘড়া দুটো আমি তোমাকেই দিতাম। অন্যায় করলে ভগবানের কাছে ক্ষমা পাব?' বলল শ্রীনিবাস।।

'আমিও তো সেই কথাই বলছি বাবু, ওই ঘড়া থেকে একটি মুদ্রাও যদি নি, আমি কি ভগবানের কাছে ক্ষমা পাব? অধর্ম হবে না?' দাসু বলল।

তারা দুজনে গ্রামের বিচারপতির কাছে গেল। যে-যার বক্তব্য বলল। ওই সময়ে গ্রামাধিকারীর ছোটো ভাই গোপীনাথ সেখানেই ছিল।

দাসুর আর শ্রীনিবাসের কথা গ্রামাধিকারীর কাছে অদ্ভুত ঠেকল। সব কথা শুনে বলল, 'এর জন্য এত হইচই এর কী আছে। দুজনের প্রত্যেকে একটি করে ঘড়া নিয়ে নিলেই তো হয়।'

এই বিচারে তাদের দুজনের কেউই খুশি নয়। দু-জনই বলল এটা অন্যায়।
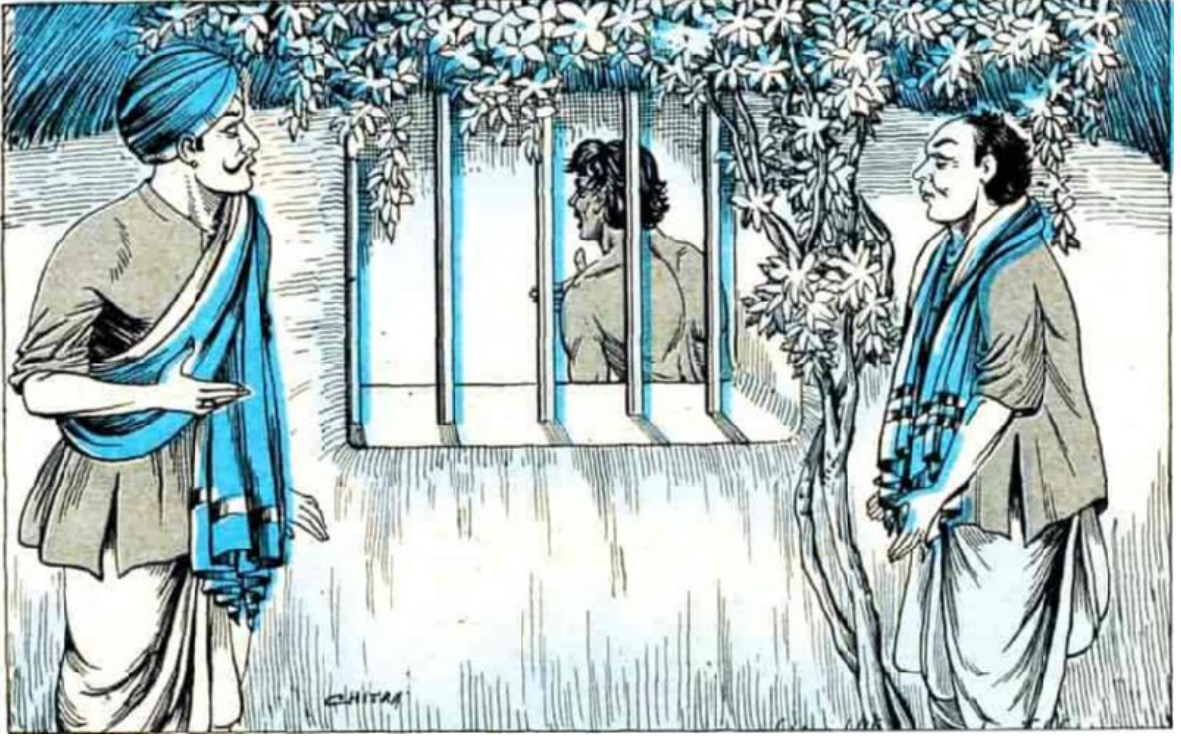
গোপীনাথ এগিয়ে এসে বলল, “আমার কথা মতো কাজ করলে তোমরা দুজনেই ন্যায় বিচার পাবে।'

‘বেশ তাই বলুন।' দাসু এবং শ্রীনিবাস বলল।

“তোমরা দুজনেই একটা করে ঘড়া নিয়ে গিয়ে যে-যার বাড়িতে এক মাস রাখ। এক মাস পরে বিচার চাও তো হবে।' গোপীনাথ বলল।

দুজনে একটা করে ঘড়া নিয়ে গেল যে-যার বাড়িতে।

তাদের চলে যাওয়ার পর গ্রামাধিকারী তার ছোটো ভাইকে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, এ তুমি কেমন বিচার করলে? এক মাস পরে আমি কী বিচার করব?’

‘এক মাস পরে ওরা তোমার কাছে বিচার চাইতে এলে তো?’ গোপীনাথ কেমন নিশ্চিন্তে হাসতে হাসতে বলল।

‘কেন? আসবে না কেন?’ গ্রামাধিকারী আশ্চর্য হয়ে বলল। ‘মাত্র এক সপ্তা ধৈর্য ধর, তারপর দেখতে পাবে। বলল গোপীনাথ।

এক সপ্তা কেটে গেল। একদিন মাঝরাতে গোপীনাথ দাদাকে নিয়ে দাসুর ঘরের ভেতর থেকে দাসুর কথা শুনতে পেল, 'আগেকার সেই খাটবার শক্তি গতরে নেই। বাচ্চারাও তো বড়ো হচ্ছে। ন্যায্য তো দুটো ঘড়া আমারই নেওয়া উচিত ছিল। জমি বিক্রির আগে পেলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু এখন এত কাণ্ডের পর দুটো ঘড়াই আমাকে দেওয়া হোক

বললে লোক হাসবে। তার চেয়ে এই ঘড়াতে যা আছে তাই দিয়ে জমি কিনে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দি।' বলল দাসু।

সেখান থেকে গ্রামাধিকারী এবং তার ছোটো ভাই গোপীনাথ গেল শ্রীনিবাসের বাড়ির কাছে। সেখানে শুনতে পেল, 'দাসুর কথামতো দুটো ঘড়াই রেখে দিলে পারতাম, জমি যখন আমি কিনেছি। ওই জমির ঘড়াগুলো তো আর দাসু জমিতে পুঁতে রাখেনি! কিন্তু এখন এই একটা ঘড়া নিয়ে আমাকে খুশি থাকতে হবে।' বলল শ্রীনিবাস।

বাড়ি ফিরে গোপীনাথকে দাদা বলল, 'তোমার কথাই দেখছি সত্য। কিন্তু সেদিন ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, দাসু আর শ্রীনিবাস খুব নীতি মেনে চলে। আচ্ছা, ওদের আসল ব্যাপারটা তুমি কেমন করে টের পেলে বল দেখি?'

'ওদের নীতি আর সততার তুমি ওভাবে বিচার করো না। নীতিহীন হলে দাসু ওই ঘড়া দুটো শ্রীনিবাসকে কিছুতেই দিত না। শ্রীনিবাসও নীতিহীন নয় বলেই ওই ঘড়া দুটো নিতে চাইল না। কিন্তু টানা এক সপ্তা ধরে ধনলক্ষ্মী চোখের সামনে থাকলে যত বড়ো নীতিবানই হোক না কেন টলে যেতে বাধ্য। এইটাই তো মানুষের স্বভাব।' বলল গোপীনাথ!

ওই রাত্রে দাসু আর শ্রীনিবাসকে দিয়ে যারা ওই ধরনের কথা বলল তারা গোপীনাথেরই লোক।

২. দেবতার সাহায্য

হিমালয়ের পাদদেশে এক ঘাঁটি ছিল। ওই ঘাঁটিতে কয়েক হাজার বছর আগে এক পাহাড়ি জাতি বাস করত। ওই জাতের লোক পশু পালন, ধানের চাষ প্রভৃতি করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু ক্রমশ ওই অঞ্চলে ফসল ফলানো আর পশুপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠল। তার কারণ উঁচু পাহাড় থেকে ছোটো-বড়ো পাথর গড়াতে গড়াতে ঘাঁটির উপর পড়ত। কয়েকশো বছর ধরে এইভাবে পড়তে পড়তে সেই ঘাঁটি পাথরের টুকরোতে ভরে গেল।

সেই ঘাঁটিতে বাস করা ক্রমশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাহাড়ি জাতের কয়েক জন যুবক নিজেদের মধ্যে কথা বলে ওদের নেতার কাছে গেল, 'দাদু, স্থান পরিবর্তন না করলে আমাদের তো নাম গোত্র লোপাট হয়ে যাবে। পেট ভরে আমরাও খেতে পাচ্ছি না আর আমাদের পশুদেরও খেতে দিতে পারছি না। এই ঘাঁটি ছেড়ে অন্য কোথাও যাই চলুন।'

বৃদ্ধ নেতা ওদের দিকে রায় ঘোষণা করার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, 'এই ঘাঁটি অনন্তকাল থেকে আমাদের। আমাদের দাদুরা আর তাদের দাদুরা এই মাটিতেই মিশে গেছে। অন্য অঞ্চলে গেলে আমাদের জীবিকা বদলে যাবে।'

'এই ঘাঁটি মরে গেছে, আমাদের নাম-ধাম মুছে যেতে বসেছে, তার চেয়ে আমাদের বদলে যাওয়াই ভালো। বলল যুবকেরা। 'ওরে, এই ঘাটি মরে যায়নি, আমি দেখাব এসো।' বলে বৃদ্ধ নেতা যুবকদের নিয়ে গিয়ে দেখাল একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড। ওই পাথর সরাতে বলল। পাথর ঠেলে সরালো। তার নীচে ছিল চমৎকার কালো মাটি।

'ওরে এই মাটিই তো সোনা। এই মাটিতেই সোনা ফলে। প্রত্যেকটা পাথরের নীচে এই ধরনের সোনা ফলানো মাটি আছে।' বলল সেই বৃদ্ধ।

'সমস্ত ঘাঁটিতে পাথর থরে থরে পড়ে রয়েছে। আমরা ক-টা পাথর সরাবো? তুমি আমাদের জন্য অন্য কোনো অঞ্চল খুঁজে বের কর।' বলল যুবকেরা।

'ঠিক আছে, তবে আমি আমাদের গণদেবতাকে জিজ্ঞেস করি উনি যে আজ্ঞা দেবেন সেই মতো আমরা কাজ করব।' বলল বৃদ্ধ দলনেতা।

তার পরের দিন গোষ্ঠীর সবাইকে ডেকে পাঠাল বৃদ্ধ দলনেতা। ছেলে মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি সবাই বসল সভায়।

‘গণদেবতা কাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে বলেছে যে তার জন্য একটি আলয় বানাতে হবে। আর আমাদের ঘরগুলো বানাতে হবে সেই আলয়কে ঘিরে। তারপর আমাদের দিন ফিরবে। ভালো দিন আসবে।' বলল সেই বৃদ্ধ।

সবাই তার কথায় উৎসাহিত হল। ছেলেরা বাচ্চারা সব ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে জড়ো করল। কিছুদিনের মধ্যেই আলয় গড়ে উঠল। বৃদ্ধের কথামতো মন্দিরকে উঁচু জায়গায় করা হল। তারপর আরও পাথর জোগাড় করে ঘর তোলা হল।

এই সমস্ত কাজ করতে অনেক পাথর তুলতে হয়েছে। ফলে চার ভাগের তিন ভাগ মাটি দেখা দিল। সেই মাটি বেশ উর্বর। মাটিতে বীজ বপন করতেই গাছ গজিয়ে ওঠে। আর যে জমিতে মাটি কম ছিল সেখানে গজিয়ে উঠল সবুজ ঘাস।

এইভাবে মানুষ আর পশুর খাবার উপযোগী অঢেল ফসল ফলল। এর ফলে সবাই তাদের গণদেবতার কাছে কৃতজ্ঞ রইল।

৩. মহাশিল্পী

কোনো এক গ্রামে হাজার বছর আগে এক মহাশিল্পী ছিল। ওই শিল্পীর রূপরেখা অনুসারে বহু বাড়ি, ভবন, মন্দির, মহল গঠিত হত। ওর খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

ওই সময়ে নাগলোকে নাগরাজার ভবনে ভূমিকম্পের ফলে চিড় ধরল। সেটা নতুন করে গড়ে তোলার জন্য মর্তভূমি থেকে ওই মহাশিল্পীকে ডেকে পাঠালে নাগরাজ। নাগরাজের আহ্বান শুনে এক নতুন ধরনের ভবন গড়ার আশায় ওই মহাশিল্পী নাগলোকের দিকে রওনা হল।

অল্প সময়ের মধ্যে নাগরাজের সাথে মহাশিল্পীর সম্পর্ক জমে উঠল। তার কোনো কিছুরই অভাব হত না। তবুও মহাশিল্পীর মন পড়ে থাকত তার বাড়িতে। তার সাধারণ বাড়ির কথা, তার মায়ের কথা ভাবত। স্ত্রীর কথাও ভাবত। কেমন আছে। কী করছে ইত্যাদি।

একদিন মহাশিল্পী নাগরাজকে বলল, "রাজা, আমার মন বাড়িতে পড়ে আছে। আমার বাড়ির, আমার গ্রামের অবস্থা কেমন আছে জানাবেন ?'

'সত্য গোপন করব না। তোমার গ্রামের দিকে কিছুকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না। ওখানে এখন ভয়ংকর আকাল।' বলল নাগরাজ।

'তাহলে ওখানে বৃষ্টি ঝরাতে পারেন না?' বলল শিল্পী।

'তা কিছুতেই হতে পারে না। ওই ভাবে বৃষ্টি ঝরানো নিয়ম বিরুদ্ধ। কবে যে কোথায় আকাল হবে তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। এই আকালের খেলা ওখানে আমাকে আরও নিরানব্বই দিন চালিয়ে যেতে হবে।' বলল নাগরাজ।

শিল্পীর মেজাজ বিগড়ে গেল। তার চোখের সামনে সবসময় ভাসতে লাগল। তার গ্রামের হাহাকারের ছবি, তার মা, তার বউ, তার বন্ধুবান্ধব সবাই না খেতে পেয়ে ধুকছে। এক একদিন মাঝ রাতে শিল্পী দেখতে পেত ভয়ংকর স্বপ্নঃ তার প্রিয়জন মারা যাচ্ছে। গাছের ডালে একটি পাতাও নেই।

'নাগরাজ, তোমার কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করছি, আমার গ্রামে বৃষ্টি দাও। আমার গ্রামের মানুষ না খেতে পেয়ে ছটফট করে মারা যাচ্ছে। আমার পরিবারের লোক মারা যাবে। আমার কথা শোনো নাগরাজ।' মহাশিল্পী বলল।

‘ওরে হরবোলা, তোমার কী দরকার এখন ওদের কথা ভেবে! আর তা ছাড়া আমার ভবন তৈরি করে ফেললেই তো তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব। অনেক জমি দেব, সোনা রুপা দেব অনেক। তুমি যতদিন বাঁচবে মহারাজার মতো কাল যাপন করতে পারবে।' বলল নাগরাজ।

‘আমি চাই আমার গ্রামে বৃষ্টি। তোমার পরিবারের লোক যদি এভাবে হাহাকার করত তখন তুমি পারতে নিশ্চিন্তে কাজ করতে?' বলল শিল্পী।

‘আমাকে অহেতুক বিরক্ত করো না। এখন বৃষ্টি হবে না। এই শেষ কথা।' বলে নাগরাজ উঠে পড়ল।

মহাশিল্পী বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরি হল। থাকল পড়ে ভবনের কাজ।

এ-কথা কানে যেতেই নাগরাজ ছুটে এসে বলল, অহেতুক এই অভিমানের কারণ কী?’

অহেতুক নয় নাগরাজ। আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে চাই প্রকৃত অবস্থা।' শিল্পী বলল।

‘এই, কে আছিস। বন্দি কর এই দুরাত্মাকে।' বলল নাগরাজ। পরক্ষণেই নাগ সেবকেরা শিল্পীকে ঘিরে ফেলল।

‘এখন বল আমার ভবন গড়ে তুলে যাবে কি না?’ নাগরাজ জিজ্ঞেস করল।

‘আমার গ্রামে বৃষ্টি ঝরাবে কি না?’ জিজ্ঞেস করল মহাশিল্পী।

‘বৃষ্টি ঝরাব না বলে তোমাকে আগেই বলেছি।' বলল নাগরাজ।

'তাই যদি হয় তাহলে আমিও ভবন তৈরির কাজ করব না।' বলল শিল্পী “ওরে, একে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ...' হঠাৎ নাগরাজ থেমে গেল। মহাশিল্পীর শিরচ্ছেদ করলে তাকে দিয়ে আর ভবন তৈরি হবে কী করে! এ-কথা মনে জাগতেই নাগরাজ বলল, ‘শিল্পীকে ছেড়ে দাও।' নাগরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

তাকে ছাড়ল বটে কিন্তু নাগলোক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা শিল্পীর রইল না। শিল্পীর চোখের সামনে থেকে নিজের গ্রামের করুণ চিত্র আর কিছুতেই সরছে না। রাতদিন গ্রামের কথা ভাবতে লাগল মহাশিল্পী। এক জায়গায় বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা থামের উপর।

শিল্পী তৎক্ষণাৎ উঠে একটা করাত দিয়ে ওই থাম কাটতে লাগল। থাম যত কাটা পড়ছে ভবন ততই টলছে। নাগরাজ হাঁকপাক করতে করতে এসে বলল, "আহা, কর কী! কর কী! থাম' বলে চিৎকার করতে লাগল।

'বৃষ্টি করাবে বল?' শিল্পীর প্রশ্ন।

'বৃষ্টি ঝরাব, বৃষ্টি হবে, কথা দিচ্ছি।' বলল নাগরাজ।

'হরিণপুরে গিয়ে অধিক বৃষ্টি ঝরিয়ে বন্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের গ্রামে গ্রামে ওসব করলে চলবে না। ঠিক যতটা বৃষ্টি প্রয়োজন ততটাই ঝরাতে হবে। মনে থাকে যেন।' বলল মহাশিল্পী।

'তুমি যা চাইছ তাই হবে।' বলল, নাগরাজ! বিরাট বিরাট ভবন যে শিল্পী বানাতে পারে তার পক্ষে কোনো ভবন ভাঙা তো আর কষ্টকর ব্যাপার নয়।

'তুমি যদি ঠিক বৃষ্টি ঝরাও তাহলে আমি এমন ভবন বানিয়ে দেব যা দেখে স্বয়ং ইন্দ্রও অবাক হয়ে যাবে। ঈর্ষান্বিত হবে।' বলল মহাশিল্পী।

নাগরাজ শিল্পীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে বলল, 'তুমি এক্ষুনি গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো ওখানে বৃষ্টি পড়ছে কি না।'

শিল্পী ভূলোকে এল। দেখল তার গ্রামে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামবাসীরা আনন্দে বিভোর। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাকে দেখতে পায়নি। গ্রামবাসীদের নজরে পড়ল এক বিরাটাকায় সর্প।

‘এই সাপই আমাদের গ্রামে বৃষ্টি আনল। এর জন্য আমরা একটা মন্দির গড়ে তুলি।' ওরা বলল। অল্পদিনের মধ্যেই মন্দির গড়ে উঠল। গ্রামের আকাল দূর হল।

শিল্পী নাগলোকে ফিরে গিয়ে নাগরাজকে বলল, 'আমাকে জাদু করে সাপ বানিয়ে ভুলোকে পাঠালে। স্বজনদের দেখছি, ওদের সাথে কথা বলতে পারলাম না।'

'তুমি খুব চতুর লোক। সেইজন্য আমি তোমার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যা করার করেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। এখন তোমার কথা তুমি রাখ।' বলল নাগরাজ।

শিল্পী নাগরাজের ভবনটিকে চমৎকার করে গড়ে তুলল। ইন্দ্র গৃহপ্রবেশের দিন এসে সেই ভবন দেখে সত্যি ঈর্ষাবোধ করল। নাগরাজ শিল্পীকে অনেক উপহার দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

মহাশিল্পীকে যারা চিনতো তারা ওকে দেখে বলে উঠল, 'আরে, এতদিন তুমি ছিলে কোথায়? তোমার না থাকার সময় এখানে ভীষণ আকাল পড়েছিল। এক সর্পদেবতা এসে এখানে বৃষ্টি ঝরিয়েছে। ওই সাপের জন্য মন্দিরও গড়ে তুলেছি।'

‘আমিই সেই সাপ।' বলল শিল্পী। অনেকেই ওর কথা বিশ্বাস করল না। পরে ওই শিল্পী গ্রামের সবাইকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলল। তখন গ্রামবাসী তার কথা বিশ্বাস করল এবং সে যে উপকার করেছে তা বুঝে তার প্রশংসা করল, নিজেরাও গর্ববোধ করল।

তারপর থেকে সেই গ্রামের নাম হল সর্পপুর।

৪. খেয়ালি রাজা

গৌড় দেশে দেববর্মা নামে এক রাজা ছিল। ওই রাজা যেমন ছিল মূখ তেমনি খেয়ালি। যখন যা ইচ্ছে করত।

দেববর্মার দর্শন প্রার্থী হয়ে একদিন এক নকল সাধু এল। বিরাট দাড়ি আর মাথায় গোছা করে জটা বাঁধা। রাজাকে ওই সাধু বলল, 'মহারাজ, আপনি অনেক বছর ধরে আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না। তারজন্য কষ্ট পাচ্ছেন। কী আপনার ইচ্ছা? আমার তপস্যা শক্তি বলে পারলে আপনার ওই ইচ্ছা পূরণ করার উপায় বলে দেব।'

তৎক্ষণাৎ দেববর্মা বলল, 'হে মান্যবর সাধু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি রাজা হয়েও ঠিক রাজ চক্রবর্তী হতে পারছি না। এটাই আমার বড়ো অনুতাপ। আপনি কি এর কোনো বিহিত করতে পারেন ?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

নকল সাধু গভীর ভাবে চিন্তা করার মতো কিছুক্ষণ অভিনয় করে রাজাকে বলল, "আপনি ভাবছেন তা মিথ্যা নাও হতে পারে। আপনার ঠিকুজিকোষ্ঠী একবার দেখাবেন?'

রাজা রাজজ্যোতিষীকে তার কোষ্ঠী সাধুকে দেখাতে বলল।

সাধু কোষ্ঠী দেখে বলল, ইস কুড়ি বছর আগে আপনার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ একেবারে কান ঘেঁষে চলে গেছে। তখন যদি গ্রহশান্তি করানো যেত তাহলে অবশ্যই আপনার ইচ্ছা পূরণ হত। এখন-ও সে সুযোগ যে চলে গেছে তা নয়। কিন্তু আরও এইভাবে আপনাকে কুড়িটি বছর কাটাতে হবে। তারপর দেখবেন আপনার সব ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাচ্ছে।' সাধু বলল। খেয়ালি রাজা সাধুর কথায় খুব খুশি হয়ে নকল সাধুকে অনেক অর্থ দিয়ে বিদায় করল।

সেই থেকে ওই রাজ চক্রবর্তীর বা সম্রাট হবার ইচ্ছা প্রবলতর হতে লাগল। রাজা ডেকে পাঠাল সমস্ত জ্যোতিষীকে। বলল, কাল থেকে সমগ্র দেশের পাঁজি কুড়ি বছর এগিয়ে দিয়ে নতুন পাঁজি তৈরি করুন। এই নতুন পাঁজিতে তিথি, বার, নক্ষত্র সবই কুড়ি বছর এগিয়ে থাকবে!'

জ্যোতিষীদের তো মাথায় হাত। কী করবে ভেবে পায় না। শেষে ওরা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সব বলল।

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আপনি পাঁজি কুড়ি বছর এগিয়ে দিতে বললেন ? তার ফলে যে জটিলতা দেখা দেবে আপনি হয়তো তা ভাবেননি।'

‘জটিলতা আবার কীসের?’ রাজা জিজ্ঞেস করল।

‘আপনার বয়স এখন চল্লিশ বছর। নতুন পাঁজি করলে আপনার বয়স হবে ষাট বছর। যুবরাজের বয়স হবে পঁচিশ। তখন তাকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনাকে যেতে হবে বানপ্রস্থে।' মন্ত্রী বলল।

রাজা বলল, 'তাহলে তো বড়ো গোলমাল। একটা কাজ করি। কুড়ি বছর পেছিয়ে দিয়ে নতুন পাঁজি তৈরি করাব। তাড়াতাড়ি গ্রহশান্তি করিয়ে আমি সম্রাট হয়ে যাব।'

'তাতে আরও বেশি করে জটিলতা দেখা দেবে। সিংহাসনে বসার অধিকার আপনার থাকবে না। আপনার পিতা এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। কুড়ি বছর পেছিয়ে দিলে উনি কি আর সিংহাসন ছাড়বেন?’ মন্ত্রী প্রশ্ন করল।

রাজা ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, 'না ! না!' জ্যোতিষীদের তক্ষুনি ডেকে পাঠিয়ে, ‘আপনাদের মধ্যে কেউ কুড়ি বছর এগিয়ে অথবা কুড়ি বছর পেছিয়ে পাঁজি তৈরি করার কথা যদি ভাবেন তাহলে তার শিরচ্ছেদ করা হবে।' রাজা সোচ্চারে ঘোষণা করে দিলেন।

৫. স্বামীর খোঁজে

সেকালের কথা। উজ্জয়িনী নগরে সাগর দত্ত নামে এক ব্যবসায়ী ছিল। তার কাছে ছিল অগাধ সম্পত্তি। একবার জাহাজে ব্যাবসা করতে বেরিয়ে মাঝ সমুদ্রে দেখল আর এক ব্যবসায়ীর জাহাজ। জাহাজের মালিক হল রাজগৃহ নামক নগরের ব্যাবসাদার বুদ্ধবর্মা।

সাগরদত্ত এবং বুদ্ধবর্মার মাঝে সেদিন থেকে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কথায় কথায় তারা এক মজার শর্ত করে ফেলল। একজনের ছেলে আর অন্য জনের যদি মেয়ে হয় তাহলে তারা ওই ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবে।

সাগরদত্ত দেশান্তরের ব্যাবসা সেরে বাড়ি ফিরতেই মল্লিকা ফুলের মালা পরিয়ে একটি মেয়েকে তার কোলে দেওয়া হল। 'এ কার মল্লিকা?' সাগরদত্ত স্ত্রীকে প্রশ্ন করল।

সাগরদত্তের স্ত্রী সলজ্জভাবে বলল, 'আপনার কন্যা।'

মেয়ের নাম রাখা হয়েছে মল্লিকা। সাগরদত্ত বুদ্ধবর্মার সাথে যে শর্ত হয়েছে তা স্ত্রীকে জানাল। তারপর রাজগৃহ নিবাসী বুদ্ধবর্মার কাছেও খবর পাঠাল।

বুদ্ধবর্মা যখন ব্যাবসার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল তার স্ত্রী তখন গর্ভবতী। সেইজন্য বুদ্ধবর্মা বাড়ি ফিরেই বলল, "আমাদের ছেলে হয়েছে না মেয়ে?' বুদ্ধবর্মার স্ত্রী শিশুকে এনে তার সামনে রাখল। শিশুটির চেহারা হাড্ডিসার। একটি মাত্র চোখ দিয়ে দেখছে। আর কুঁজো।

'তুমি এই উটের জন্ম দিলে!' বুদ্ধবর্মা স্ত্রীর উপর রেগে গিয়ে বলল। বাবা যেহেতু উট নামে ডাকল অতএব তার নামও হয়ে গেল উট।

ঠিক এমন সময় বুদ্ধাবর্মা সাগরদত্তের মেয়ে হওয়ার খবর পেল। এই খবর যারা আনল তাদের আদর আপ্যায়ন করে বুদ্ধবর্মা স্ত্রীকে বলল, 'দেখলে তো, কি হতে কি হয়ে গেল। এখন আমি কি সংবাদ পাঠাব?'

'জিজ্ঞেস করলেন যখন বলছি, ব্যাবসাদার মাত্রেই নিজের স্বার্থে কখনো সত্য আবার কখনো মিথ্যা কথা বলে থাকে। আমাদেরও ছেলে হয়েছে বলে খবর পাঠিয়ে দিন। আর এ তো মিথ্যে নয়। আর বলে দিন যে তার চেহারা বর্ণনাতীত। রূপে গুণে তার পরিচয় মেলে। কোনো অবস্থাতেই সাগরদত্তের সাথে আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন করা উচিত নয়।' বুদ্ধবর্মার স্ত্রী বুঝিয়ে বলল।

স্ত্রীর কাছে শোনা কথাই সাগরদত্তের দূতকে জানিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

তারপর আট বছর ধরে রাজগৃহ এবং উজ্জয়িনীর মধ্যে দুতের যাতায়াত চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সাগরদত্তের দূত রাজগৃহ গিয়ে বুদ্ধবর্মাকে বলল, 'মহাশয়, আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার ছেলের রূপ এবং গুণের পরিচয় জেনে যাওয়ার।

বুদ্ধবর্মা নিঃসংকোচে বলল, 'আমার পুত্র তার মামার বাড়ি তাম্রলিপ্তে লেখাপড়া করতে গেছে।'

এভাবে নানান বায়নাক্কায় আরও চার বছর কেটে গেল। একবার সাগরদত্তের চার-পাঁচ জন অনুচর বুদ্ধবর্মার কাছে এসে বলল, 'মহাশয়, আপনার বন্ধু সাগরদত্ত এবং তার স্ত্রী বলে পাঠালেন যে বারো চোদ্দো বছর হতে চলল তবু তারা তাদের ভাবী জামাইকে দেখতে কেমন তা জানতে পারল না। পাত্র না দেখে দেনা-পাওনার কথাবার্তা হবে কী করে। আজও আপনার ছেলে তাম্রলিপ্তে পড়াশুনা করছে এটা ভাবতে কেমন লাগে। তাই, এসব টালবাহানা ছেড়ে ছেলেকে দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

'ভাইসব, তোমরা বিশ্রাম কর। দূতদের এই কথা বলে বুদ্ধ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, 'দূতেরা আমাদের ছেলেকে দেখার জিদ ধরেছে যে। আমাদের এই উচু দাঁত, অন্ধ চোখ আর বেঢপ চেহারার কুঁজো ছেলেকে দেখাই কী করে? এখন তোমাকেই আবার উপায় ভাবতে হবে।'

'আমি কবে উপায় ভেবে রেখেছি।' এই কথা বলে বুদ্ধবর্মার স্ত্রী নিজের ভেবে বের করা উপায় বলে দিল।

বুদ্ধবর্মার খরচে জীবন যাপনকারী একটা ব্রাহ্মণ ছিল। বুদ্ধবর্মা গোপনে তার বাড়ি গিয়ে তাকে নিজের সমস্যা জানিয়ে বলল 'প্রিয়বর, এখন তোমার সাহায্য ছাড়া আমার মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। তোমার ছেলে যজ্ঞগুপ্ত দেখতে যেমন সুন্দর সমস্ত শাস্ত্রেও তেমনি বিজ্ঞ। আমার পুত্রের পরিবর্তে তোমার ছেলেকেই সাগরদত্তের কন্যার সাথে বিয়ে করতে হবে এবং তার কুমারীত্ব অক্ষুন্ন রেখেই আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার এই কথায় রাজি হলে বিয়েতে পণ এবং জিনিসপত্র যা পাব তার অর্ধেক তোমাকে দেব।'

'মশাই, আপনার ইচ্ছা পূরণ করা আমার কর্তব্য। আপনি ভাববেন না।'

এই কথা বলে নিজের ছেলেকে ডেকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল।

'আপনি আমার শুধু পিতা নন গুরুও। তাই আপনার আদেশের দোষ-গুণের বিচার করা আমার উচিত নয়।' বলে যত্তগুপ্ত নিজের সম্মতি জানাল।

দু-একদিন কেটে যাওয়ার পর বুদ্ধবর্মা সাগরদত্তের দূতদের বলল, 'আমার ছেলে তাম্রলিপ্ত থেকে ফিরেছে।' তারপর যজ্ঞগুপ্তকে এনে সাগরদত্তের দূতকে দেখিয়ে দিল। দুতেরা ভাবলো মল্লিকা খুব সৌভাগ্যশালিনী। ওরা বুদ্ধবর্মাকে বলল, যেকোনো শুভ মুহূর্ত

দেখে বিয়ে করাতে ছেলেকে সাগরদত্তের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। খুশি মেজাজে দূতেরা ফিরে গেল কথাবার্তা সেরে।

দু-চার দিন পরে বুদ্ধবর্মা যজ্ঞগুপ্তকে বর সাজিয়ে আর নিজের ছেলেকে ব্রাহ্মণ সাজিয়ে পরিবারের কয়েক জনকে পাঠিয়ে দিল উজ্জয়িনী।

পরের দিন সকালেই বিয়ের কাজ হয়ে গেল। বর কনে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করার সময় হঠাৎ বর এমনভাবে পড়ে গেল দর্শকরা যাতে মনে করে যে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কোনো এক অশুভ ইঙ্গিত ভেবে কন্যাপক্ষ ঘাবড়ে গেল। ছোটাছুটি পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর বর বিড়বিড় করে আধ বোজা চোখে বলল, 'আমার ভীষণ পেট ব্যথা করছে।'

বৈদ্যরা বরকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করল। কনে কোনোরকমে সংকোচ না করে বৈদ্যদের কথামতো বরের সেবা করতে লাগল। ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে লাগল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বরের পেটের ব্যথা সারেনি।
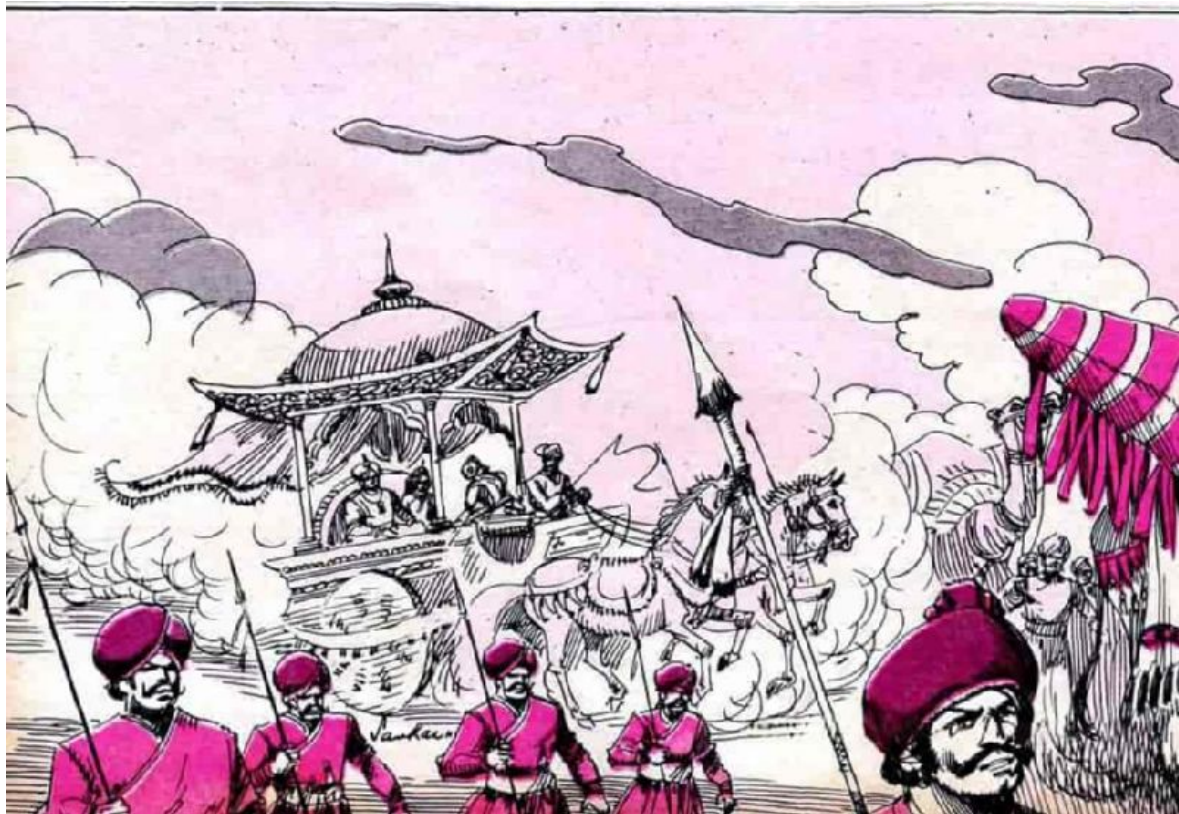
কুঁজো ছেলেটাও বরের পাশে বসে থাকা কনের সাথে ঠাট্টা করতে লাগল। এসব দেখে মল্লিকা রেখে গেল। তখন যজ্ঞগুপ্ত বলল, 'ও ঠাট্টা করছে, তুমি অত চটছ কেন? ওকে বকতে দাও।'

কিন্তু যজ্ঞগুপ্তের মনে একটা ভয় সব সময় ছিল, সেই কুঁজোটা সমস্ত গোপন ব্যাপার ফাক না করে দেয়। সাগরদত্তের কাছে বলল, 'আমার বাবা-মা-কে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

বৈদ্য বরের ইচ্ছা জানতে পেরে সাগরদত্তকে বলল, বদহজমের সমস্ত রকম ওষুধ আমি দিয়েছি কিন্তু কোনো ফল হল না। বর নিজের বাপ-মা-র সাথে দেখাসাক্ষাৎ করলে হয়তো এই রোগ সেরে যাবে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব একে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সাগরদত্ত নিজের কন্যা এবং জামাইয়ের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল। যৌতুকের জিনিস উটের পিঠে চাপানো হয়। দাস-দাসী ও দেহরক্ষী সহ বর-কনেকে রাজগৃহ পাঠানো হল। সাগরদত্তের চাকররা ওদের আগে রওনা হয়ে রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে লাগল। বর-কনে সহ যেতে যেতে মাঝে মাঝে বরের স্বাস্থ্যের খবর সাগরদত্তের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও ছিল।

রাজগৃহের দিকে যত এগোতে থাকে বরের স্বাস্থ্য তত ভালো হতে থাকে। রাজগৃহে পৌঁছাতেই তার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এই সুস্থ হবার খবর পেয়ে সাগরদত্তের মন আনন্দে ভরে উঠল। তখন সে গরিবদের মধ্যে অনেক কিছু বণ্টন করে দিল।

বুদ্ধবর্মা বধূকে দেখে খুব খুশি হল। রাতে বর আর বধূকে ফুলশয্যার ঘরে পাঠানো হল। ওই ঘরে মল্লিকার সাথে আসা তার বান্ধবীরা এবং কুঁজোটাও ছিল।

মল্লিকা ভাবল, এই কুঁজোটা এই ঘরে কেন আছে?

কুঁজোটাও মনে মনে ভাবল, এই ব্রাহ্মণের বাচ্চাটা এখনও বসে আছে। কেন? কুঁজোটা বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকল তার প্রতি। অবস্থা বুঝে যজ্ঞগুপ্ত সেখান থেকে চলে যাওয়ার উদ্দেশে উঠে দাঁড়াল।

তৎক্ষণাৎ মল্লিকা যেন আর্তনাদ করে উঠে বলল, 'একী, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমার অবস্থা কী হবে?'

'ভাদ্যদেবতা তোমার কপালে যে পতি লিখে রেখেছেন তুমি সেই পতির সাথেই জীবন যাপন করবে। মাঝখানে আমিই শুধু পাপের ভাগী হলাম।' বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। মল্লিকার সাথীরাও অগত্যা বাইরে চলে গেল।

এই অবস্থা দেখে মল্লিকাও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। হঠাৎ কুঁজো লোকটা তাকে ধরে ফেলল। মল্লিকা আর্তনাদ করে ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এক এক করে সেই বিরাট বাড়ির প্রায় প্রত্যেক ঘর পেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রত্যেকটা ঘরের লোক যেন নেশায় ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিছু দাসদাসী এক জায়গায় নাচছে।

মল্লিকা বাড়ির বাইরে এসে কাকে যেন দেখে 'ওই যে, ওই যো', বলতে বলতে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। সে যে কোথায় ছুটে চলেছে সে নিজেই তা জানে না। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পথের ধারে নজরে পড়ল এক কাপালিক নেশায় যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মল্লিকা তৎক্ষণাৎ নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। সে নিজের গয়নাগাটি পোঁটলা বেঁধে কোমরে গুঁজে নিল। কাপালিকের পোশাক খুলে নিয়ে সেই পোশাক নিজে পরে মাতালের মতো টলতে টলতে বকতে বকতে রাজগৃহ নগর পেরিয়ে একটি গ্রামের দিকে রওনা দিল।

দুই

হাঁটতে হাঁটতে মল্লিকা দেখতে পেল সেই গ্রামে এক পক্ককেশ বৃদ্ধা সুতা কাটছে। কাটতে কাটতে বলছে, 'এই বুদ্ধমবর্মা কি রকম নীচ প্রকৃতির মানুষ রে বাবা?'

'বুড়ি মা, তুমি ওই ভদ্রলোককে গাল দিচ্ছ কেন?' মল্লিকা বলল।

'তুমি শোননি বাবা লোকটার কাণ্ড ? সবাই ওর নিন্দে করছে।' মল্লিকাকে পুরুষ ভেবে বৃদ্ধা বলল।

সেই সময় ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করল একজন, 'বুদ্ধবর্মার স্ত্রীর খোঁজ যে। দিতে পারবে তাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউ যদি তাকে লুকিয়ে রাখে তার মুণ্ডু কেটে নেওয়া হবে। এ হল রাজার আদেশ।'

ব্রাহ্মণ পত্নী আনন্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপন খেয়ালে বলল, 'বেশ করেছ মল্লিকা, বাল করেছ। ওই বুড়োটাকে নিয়ে ঘর কোরো না । তোমার স্বামী যজ্ঞগুপ্তই।'

এই কথা শুনে বুড়ির ওপর মল্লিকার বিশ্বাস জাগল। সে ওই বুড়িকে নিজের সব কথা খুলে বলল। বুড়ি সস্নেহে তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। কাপালিকের পোশাক ছাড়িয়ে তার স্নানের ব্যবস্থা করল। খাওয়াল, ঘুমোতে বলল।

পরের দিন মল্লিকা কাপালিকের পোশাক পরে শহরে পৌঁছে দেখল যত্র-তত্র লোকের জটলা। মল্লিকা ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে বুদ্ববর্মা নামে এক ব্যবসাদার আছে। ওর এক কুঁজো ছেলে আছে। এক ব্রাহ্মণ যুবক এক সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে এই কুঁজোটার হাতে সঁপে দিল। তার ফলে ওই কন্যা পালিয়ে গেল।'

‘ওই পাজি ব্রাহ্মণ যুবকের বাড়ি দেখাতে পারেন?’ মল্লিকা ওই লোকটাকে প্রশ্ন করল। ওই লোকটা মল্লিকাকে যজ্ঞগুপ্তের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

যজ্ঞগুপ্তের বাড়ি অতি সাধারণ ধরনের। বাড়ির এক কোণে যজ্ঞগুপ্ত শিষ্যদের পড়াচ্ছিল।

মল্লিকা সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন গ্রন্থ পড়াচ্ছেন ?’

‘মনুধর্মশাস্ত্রের বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাখ্যা করছি।' যজ্ঞগুপ্ত বলল।

‘তোমার কোনো অধিকার নেই তা পড়ানোর। তুমি নিজে অন্য বর্ণের মেয়েকে বিয়ে করেছ সেই কনেকে এক কুঁজোর হাতে সঁপে দিয়ে কোন আক্কেলে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছ?’

‘পিতার আজ্ঞা পালন করা ছেলের কর্তব্য। রামচন্দ্র কি করে ছিল?’ বলল যজ্ঞগুপ্ত।

‘তুমি অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সাথে নিজে তুলনা করছ? বেশ তো, পিতার আদেশে না হয় বিয়ে করলে কিন্তু কোন অপরাধে তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করলে?' মল্লিকা আবার প্রশ্ন করল।

যজ্ঞগুপ্ত এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারল না।

সেদিন থেকে প্রত্যহ দিনের বেলা মল্লিকা কাপালিকের পোশাকে যজ্ঞগুপ্তর বাড়িতে কাটাত। আর রাত্রে ব্রাহ্মণীর বাড়িতে থাকত।

মল্লিকা বুঝতে পারল যজ্ঞগুপ্তের বিয়ে করার মূলে ছিল তার দারিদ্র, অর্থের লোভ। তাই সে ঠিক করল অর্থ দিয়েই তাকে আকর্ষণ করবে। মল্লিকা নিজের মুক্তার হার বিক্রি করল। সেই অর্থের অংশ দিয়ে বাসনপত্র কিনল। গাঁয়ের বাইরে পুঁতে দিল। এরপর সে যজ্ঞগুপ্তকে বলল, 'আমার মতো লোকের পক্ষে এক জায়গায় পাঁচ দিনের বেশি থাকার উপায় নেই। কিন্তু তোমার উপর আমার একটা দয়ার ভাব জাগায় পাঁচ দিনের বেশি রয়ে গেলাম। আমার কাছে মহাকাল মন্ত্রের গ্রন্থ রক্ষিত আছে। সেই গ্রন্থ পড়লে পৃথিবীর সমস্ত খাজানার সন্ধান মেলে। চাও তো আমার সাথে এসে সেই খাজানার সন্ধান পেতে পার।'
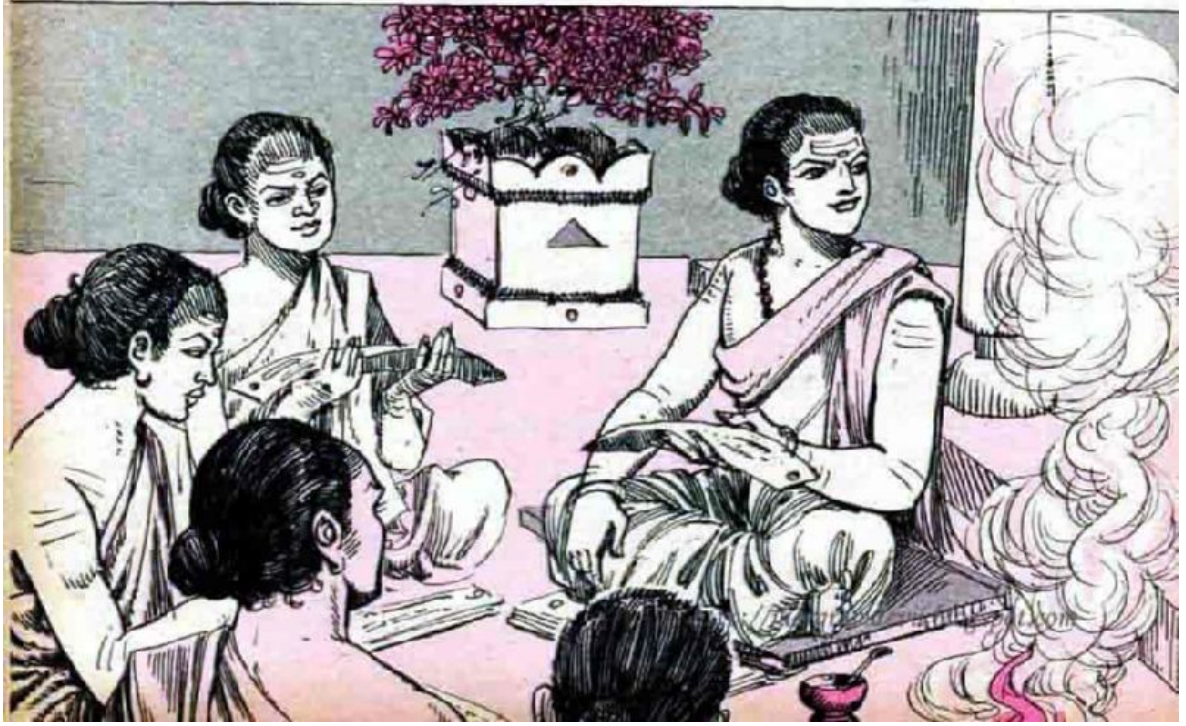
তারপর যজ্ঞগুপ্ত নিজের দু-একজন বিশ্বাসী শিষ্যকে সাথে নিয়ে মল্লিকার পেছনে গিয়ে গাঁয়ের বাইরে এক জায়গায় খুঁড়ে তামার বাসনপত্র বের করে বাড়ি ফিরল। বাবাকে জানাল সমস্ত ব্যাপার। মহাকাল গ্রন্থ যে কাপালিকের কাছে আছে তাও জানাল।

'তাই নাকি? তাহলে আর এসব শাস্ত্র পড়ে কী হবে। ছেড়ে দাও এসব পড়া। ওই কাপালিকের কাছে গিয়ে মহাকাল মন্ত্র শেখ। তারপর কাপালিকের সাথে লেগে থেকে যতদিন না ওই গ্রন্থ পাও তার সেবা করে যাও।' যজ্ঞ গুপ্তের বাবা ছেলেকে পরামর্শ দিল।

যজ্ঞগুপ্ত কাপালিককে তার কাশী যাত্রার আগে কাকুতিমিনতি করে বলল, 'প্রভু আমার মতো পাপীর পক্ষে তীর্থযাত্রা ছাড়া পূণ্য অর্জনের আর কোন পন্থা আছে!'

মল্লিকা এমন অভিনয় করল যেন সে যজ্ঞগুপ্তকে তার সাথে যেতে বারণ করছে। শেষে অবশ্য যাওয়ার অনুমতি দেয়। দু-জনে কাশী পোঁছাল। সেখানে কিছুদিন থাকার পর নৈমিশ্যারণ্য হয়ে গঙ্গার উৎস মুখে পৌছাল। সেখানে কুরু, পুষ্কর, মহালয় ইত্যাদি পূণ্যতীর্থ সেরে উজ্জয়িণী পৌঁছাল।

মল্লিকা যজ্ঞগুপ্তকে বলল, 'উজ্জয়িণী যাওয়া তোমার উচিত হবে না। সেখানে তুমি মহা অপরাধ করেছ। উজ্জয়িণীর অধিবাসী তোমাকে ক্ষমা করবে না । তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

'প্রভু, শিষ্য কি কখনো গুরুকে ছাড়তে পারে?' যজ্ঞগুপ্ত বলল।

শেষে দু-জনে উজ্জয়িণী পৌঁছাল। তখন মল্লিকা যজ্ঞগুপ্তকে ভদ্রবট নামক এক স্থানে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'একটি খাজানার তদন্তে বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না তার সন্ধান পাই আমি ফিরব না। আমার ফিরতে দেরি হলে ঘাবড়ে যেয়ো না।'

তারপর মল্লিকা সিপ্রা নদীর তীরে যায়, কাপালিকের পোশাক ঠিক মতো পরা আছে কি না দেখে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চায়। ভিক্ষে দিতে মল্লিকার এক পরিচারিকা বাইরে এসে মল্লিকাকে ঠিক চিনতে পেরে চট করে ভেতরে ঢুকে গৃহকর্ত্রীকে বলে, 'ওমা, আজ আমাদের কী আনন্দ! আপনার মেয়ে কাপালিকের পোশাকে দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে! নিজের চোখে দেখে আসুন !’

মল্লিকার মা বাইরে এসে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে কাপালিকের পোশাক টেনে খুলে ফেলে চান করিয়ে বলে, ‘এসব কী করছ মা?’

‘আচ্ছা মা, তুমি ভাবছ আমি সত্যি সত্যি কাপালিনী হয়ে গেছি না? বাবাকে ডাক, আমি আগাগোড়া যা করেছি বলছি।' মল্লিকা জবাবে বলল।

সাগরদত্তকে দেখে মল্লিকা বলল, 'বাবা, আপনাদের জামাই ভদ্রবটে আছে। ওঁকে আনতে ভাইদের পাঠিয়ে দিন।'

যজ্ঞগুপ্তের কাছে গিয়ে তার শ্যালকরা বলল, ‘পাজি কোথাকার, এখানে লুকিয়ে আছ। চল রাজার কাছে। আজ তোমার বিচার হবে।'

যজ্ঞগুপ্ত বুঝল আজ তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই বলল, 'আমার মিত্র কাপালিকের ফেরা পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন।'

মল্লিকার ভাইরা মনে মনে হেসে বলল, 'তোমার মিত্র আর কোথায়? তার যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে গেছে। সেই তো তোমাকে ধরিয়ে দিল।' এই কথা বলে তারা যজ্ঞগুপ্তকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেল।

জামাইকে সাদরে সাগরদত্ত বুকে টেনে নিল। সবাই তাকে ঘিরে রইল।

স্বামীর জন্য মল্লিকা যা যা করল সব বিস্তারিত জেনে যজ্ঞগুপ্ত বলল, ‘লোকে বলে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম। এ ডাহা মিথ্যা। পাণ্ডবরা কিছুতেই বিরাট রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতবাস করতে পারত না যদি দ্রৌপদী না থাকতেন।'

মুখে মুখে মল্লিকার কাহিনি সেদেশের রাজার কানেও পৌঁছে গেল। রাজা মল্লিকা এবং যজ্ঞগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। রাজা উপহার দিয়ে মল্লিকাকে বললেন, ‘মা, তোমার স্বামী যাতে ব্রাহ্মণের কর্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখ।'

তারপর যজ্ঞগুপ্ত সস্ত্রীক সুখে জীবনযাপন করতে লাগল। যশও সে পেল।

৬. বুদ্ধির জোর

উত্তরদেশের একটি গ্রামে বীরসিংহ ও জ্ঞানপ্রকাশ নামে দু-জন যুবক ছিল। ওদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু স্বভাবে ওরা ছিল পরস্পরের বিপরীত। জ্ঞানপ্রকাশ ছিল রোগা, দুর্বল কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। আর বীরসিংহ ছিল শক্তিশালী, সাহসী আর তড়িঘড়ি করে কাজ করা লোক। ওর বুদ্ধি ছিল কম। দু-জনেই গরিব পরিবারের।

দুই বন্ধুতে একবার দূরের গ্রামে রওনা হল। মাঝ পথে বীরসিংহের খিদে পেল। দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেল। সেখানে গিয়ে কাউকে খেতে দিতে বলব বলল বীরসিংহ।

'আমার অত খিদে নেই। গ্রাম দেখে মনে হচ্ছে এখানে গরিব মানুষই বেশি আছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কারো বাড়ি যেতে ভালো লাগে না। আর তা ছাড়া আমরা দু-জনে গেলে খেতে পাব কিনা সন্দেহ। তুমি আগে গিয়ে খেয়ে এসো। তারপর দেখা যাবে' বলল জ্ঞানপ্রকাশ।

আসল ব্যাপার হল যা-তা ব্যবহার করে বীরসিংহ সবার সাথে ঝগড়া করে। আর খিদে পেলে ওর কোনো জ্ঞান থাকে না। বুদ্ধি খেলে না। এ-কথা জ্ঞানপ্রকাশ ভালোভাবেই জানত। ওর সাথে গেলে ভাত তো দুরের কথা জলও খেতে পাবে না। সেইজন্যই বীরসিংহকে একাই যেতে বলল গ্রামে।

গাঁয়ে ঢুকেই এক চাষিকে দেখতে পেল বসে খাচ্ছে। খেতে যাওয়ার আগে খেতে বসেছে। বীরসিংহ হঠাৎ তার বাড়িতে ঢুকে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, আমাকেও খেতে দাও' জোর করে যেন দাবি করছে সে।

চাষি আর চাষি বউ লোকটার চোটপাট দেখে তো অবাক!

'হাঁ করে দেখছ কী? তোমাদেরই বলছি। তাড়াতাড়ি খেতে দাও।' বীরসিংহ দুমদাম করে বলল। এমনভাবে বলল যেন ওদের কাছে তার বলার অধিকার আছে!

'তোমার এত মেজাজ কীসের? তোমাকে আমরা খেতে দেব কেন? তুমি কি আমাদের আত্মীয়? যাও, ভাগ এখান থেকে।' বলল চাষি।

'খেতে দেবে কি না জানতে চাই। আমার হাতের লাঠিটা দেখছ তো!' বলল বীরসিংহ!

ওরা দু-জনে এই ধরনের কথা বলাবলি করছে এমন সময় চাষির বউ খিড়কির দরজা দিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে দশ-বারো জনকে ডেকে আনল।

বীরসিংহ লাঠি মারার কথা বলতে-না-বলতে তার পিঠেই কয়েকটা লাঠির ঘা। পড়ল। বীরসিংহ আর্তনাদ করতে করতে ছুটছে তো ছুটছে। শেষে জ্ঞানপ্রকাশের কাছে পৌছে গেল। ওর অবস্থা দেখে ওর কাছে সব কথা শুনে সে বীরসিংহকে বলল, 'তুমি ঘণ্টাখানেক এই গাছের নীচে বসো। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে খাবার আনব। তুমিও খাবে আমিও খাব।'

এবারে জ্ঞানপ্রকাশ সেই কিষানদের বাড়ি গেল। বীরসিংহকে তাড়াবার পর তখনও সে-ব্যাপারে আলোচনা করছিল গ্রামের লোকেরা, এমন সময় জ্ঞানপ্রকাশ গিয়ে খাবার দিতে বলে।

কিষান রেগে গিয়ে বলে, 'খাবার-দাবার কিছু হবে না। যাও, না হলে লাঠি খেতে হবে।'

জ্ঞানপ্রকাশ হাতজোড় করে বলল, ‘আমি খেতে চাই ঠিক কিন্তু তাই বলে লাঠি খেতে চাই না।'

তার কথা শুনে সবাই হাসল। জ্ঞানপ্রকাশ আবার বলল, 'আমি শুনেছি, এই গ্রামের লোক খুব বনেদি, যাক সে কথা, আপনারা হাঁড়ি আর জল দিলে আমি আপনাদের চমৎকার এক খাবার রান্না করে খাওয়াতে পারব।'

গ্রামের লোকের মনে কৌতুহল জাগল। জ্ঞানপ্রকাশ কিষানের কাছ থেকে। হাঁড়ি আর জল পেল। একটা গাছের নীচে তিনটে ইট বসিয়ে উনুন বানাল। এদিক-ওদিক থেকে ক-টা কাঠ কুড়িয়ে উনুন ধরাল। উনুনের উপর জলভরতি হাঁড়ি বসিয়ে পকেট থেকে একটি পাথরের টুকরো বার করে সেই হাঁড়িতে ফেলল। ওর এই কাণ্ডকারখানা সবাই দেখল। কিছুক্ষণ পর ওই হাঁড়ির গরম জল কয়েক ফোঁটা মুখে দিয়ে সুস্বাদু কোনো কিছু খাবার মতো ভঙ্গি করল। বলল, 'চমৎকার হয়েছে, এতে দু-একটা আলু পড়লে আরও স্বাদ হত।'

এরপর ওখানে যারা জমেছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন দু-তিনটি আলু আনল। ওই আলু হাঁড়িতে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে সেই জল চেখে জ্ঞানপ্রকাশ বলল, 'বা! চমৎকার হয়েছে। এতে যদি দু-মুঠো চাল পড়ত তাহলে আরও জমতো! এক এক করে চাল, তরিতরকারি সবই কেউ-না-কেউ এনে দিল।

গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই জ্ঞানপ্রকাশকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সব শেষে আবার ওই রান্না করা জিনিস মুখে দিয়ে জ্ঞানপ্রকাশ বলল, 'এ-হে-হে মস্তবড়ো ভুল হয়ে গেছে। নুন পড়ল না!' তৎক্ষণাৎ একজন ছুটে গিয়ে নুন আনল। তারপর গাছের পাতা পেড়ে জ্ঞানপ্রকাশ ওই পাত্র নিয়ে বীরসিংহ যেখানে বসে ছিল সেখানে গেল। তার সাথে সাথে কিছু বাচ্চারাও গেল।

দুই বন্ধুতে পাতায় ওই খাবার বেড়ে পেট পুরে খেল। বাকি যা ছিল তা ওই বাচ্চাদের খেতে দিয়ে ওই হাঁড়িটা মেজে ওই কিষানকে দিয়ে দিতে বলল।

তারপর ওরা দু-জনে নিজেদের পথে পা বাড়াল।

৭. হৃদয় ফলক

সুন্দরপুরের যুবরাজ সুশীলকুমার পোশাক বদলে দেশান্তরে গেল। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছ মাস ধরে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিখল। তারপর ফেরার পথেও অনেক নতুন দেশ দেখতে দেখতে শেষে রাজপাট নামক দেশে পৌঁছাল। সুন্দর দেশ রাজপাট। সেখানকার মহল, বন আর উদ্যান দেখে যুবরাজ মুগ্ধ হল।

সেই নগরে ঘুরতে ঘুরতে সুশীলকুমার হঠাৎ দেখতে পেল এক বিরাট প্রাচীর। দ্বারপালকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে সেটা রাজকুমারী শালিনীর নিজস্ব উদ্যান। সেই উদ্যানে কোনো পুরুষের ঢোকা নিষেধ।

কিন্তু সুশীলকুমারের ভীষণ ইচ্ছা করল সেই উদ্যানে ঢোকার। সে উঁচু দেয়ালের চারদিক একবার ঘুরে দেখে পেছন দিক থেকে লাফ দিয়ে সেই উদ্যানে ঢুকল। সেই উদ্যান সত্যি ইন্দ্রের নন্দনকাননের চেয়ে সুন্দর ছিল। সুশীলকুমার কিছুক্ষণ ধরে উদ্যানের বিভিন্ন গাছ এবং ফুল আর ফল দেখে অবাক হয়ে গেল। শেষে একটি গাছের নীচে বসে বাঁশি বাজাতে লাগল। কাছের একটি সাপের ঢিপির গর্ত থেকে এক জাত-সাপ বেরিয়ে ফণা তুলে সুশীলকুমারের সামনে দুলতে থাকে। অত বড়ো সাপ দেখেই সুশীলকুমার বাঁশি বাজানো বন্ধ করে দেয়। পরক্ষণেই ওই সাপ তাকে ছোবল মেরে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ নীল হয়ে গেল। সুশীলকুমার অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল সেখানে।

সুশীলকুমারের বাঁশির আওয়াজ ওই উদ্যানের ক্রীড়া ভবন থেকে রাজকুমারী শালিনী শুনতে পায়। কোথায় কে বাঁশি বাজাচ্ছে দেখার জন্য সে পথে কয়েক জন সখীদের নিয়ে ওই ভবন থেকে বেরুল।

রাজকুমারী কাছে গিয়ে দেখে এক যুবক অজ্ঞান হয়ে হাতে বাঁশি নিয়ে পড়ে আছে। শালিনী তার চিকিৎসা করাল। তাকে ক্রীড়া ভবনে নিয়ে গেল।

সেখানে চারদিন তাকে গোপনে রেখে তাকে ভালোভাবে সারিয়ে তুলল।

রাজকুমারী নিজস্ব উদ্যানে ঢোকাই সুশীলকুমারের এক মস্তবড়ো অপরাধ । রাজা অথবা তার পরিষদ কেউ জানতে পারলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। সেইজন্যই রাজকুমারী তাকে নিজের ক্রীড়া ভবনে গোপনে রেখে সখীদের সাহায্যে চিকিৎসা করাল। তারপর রাজকুমারী জানতে পারল সেই যুবকের পরিচয়। সে এক দেশের যুবরাজ। কথাবার্তায় আচার-আচরণে তার ব্যবহার দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়। তাদের দুজনের মধ্যে প্রীতির

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশেষে ওরা শপথ করল পরস্পরকে বিয়ে করবে।

তারপর সুশীলকুমার গোপন পথে উদ্যানের বাইরে গিয়ে নিজের আস্তানায় গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে এল।

যুবরাজের ফেরার পর রাজা খুব খুশি হলেন। মন্ত্রীকে ডেকে যুবরাজের যোগ্য কনে খোঁজ করার নির্দেশ দিলেন। সুশীলকুমার কিন্তু বাবাকে জানায়নি যে সে ইতিমধ্যেই কথা দিয়েছে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিয়ের কথা বলতে তার ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল। আর একটি কারণ হল তার বাবা যদি একবার ওই রাজকুমারী শালিনীর সাথে বিয়ে হবে না বলে আর কোনো ক্রমেই তাঁকে রাজি করানো যাবে না!

তারপর যখন সে জানতে পারল যে বাবা তার জন্য কনে খুঁজতে মন্ত্রীকে বলেছেন তখন সে খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে একটা ঘরে চুপচাপ বসে থাকত। তার শরীর ভেঙে পড়ছিল। মন্ত্রীপুত্র দেবদত্ত সুশীলকুমারের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। সবার আগে সেই বুঝতে পেরেছিল সুশীলকুমারের মনের অবস্থা।

নানান কথার পরে দেবদত্ত জানতে পারল সুশীলকুমারের ওই উদ্যানে যাওয়ার কথা। রাজকুমারীকে বিয়ে করার শপথের কথা। রাজকুমারের অসহায় অবস্থার কথা।

'যুবরাজ, কিছু ভেবো না। তেমন যদি দরকার পড়ে তো আমাদের দরবারি জাদুকরের সাহায্যে এমন এক উপায় বের করব যাতে তোমার বিয়ে ওই রাজকুমারীর সাথেই হয়।' এই কথা বলে দেবদত্ত রাজকুমার সুশীলকুমারকে আশ্বাস দেয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই নানান দেশের রাজারা সুশীলকুমারের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে দূত পাঠাতে থাকে। ওই রাজাদের মধ্যে শালিনীর বাবাও ছিলেন।

কিন্তু রাজা এবং মন্ত্রী দেখে-শুনে যে তিন চার জন কনেকে ঠিক করলেন তাদের মধ্যে শালিনী নেই। এই কথা দেবদত্ত বাবার কাছে জেনে নেয়। তখন দেবদত্ত ভেবে ঠিক করল সুশীলকুমারের ইচ্ছা পূরণ করতে হলে এমনি কাজ হবে না। জাদুর সাহায্যেই কাজ সারতে হবে।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'মন্ত্রীবর, আমরা যে রাজকুমারীদের বাছাই করেছি তাদের ঠিকুজি আনিয়ে জ্যোতিষীকে দেখানো দরকার।'

'মহারাজ, তার আগে যুবরাজের মতামত বোধ হয় জেনে নেওয়া ভালো।' মন্ত্রী বুঝিয়ে বলল।

'আমার মতই আমার ছেলের মত। সে আমার মুখের উপর কথা বলবে । আপনি আপনার কাজে এগোতে পারেন।' বলল রাজা। রাজা বাচ্চা বয়স থেকেই ছেলেকে মনের মতো করে গড়ে নিয়েছেন।

'কথাটা সত্য' কিন্তু এ তো কোনো রাজনীতির ব্যাপার নয়। বিয়ে ব্যাপারটা যতই হোক যুবরাজের নিজের সমস্যা। আপনি অনুমতি দিলে আমি তার মতামত জেনে নিতে পারি।' মন্ত্রী বলল।

'ঠিক আছে। তাই করুন।' রাজা বললেন।

দেবদত্ত অনেকক্ষণ ধরে সুশীলকুমারকে বুঝিয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল।

'আমার হৃদয় ফলকে যে তরুণীর নাম আঁকা আছে তার সাথেই আমার বিয়ে করান।' সুশীলকুমার বলল।

'কার নাম আঁকা আছে বল, তুমি যার নাম বলবে আমি তার সাথে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।' মন্ত্রী বলল।

'আমি জানলে তো বলব। আমি জানি না তার নাম! আপনারাই চেষ্টা করে জানার চেষ্টা করতে পারেন।' সুশীলকুমার বলল।

'তা কী করে সম্ভব যুবরাজ?' মন্ত্রী নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করল।

কথার পিঠে দেবদত্ত বলল, 'হৃদয়ের কথা ইচ্ছে করলে জানা যায় বলে আমাকে জাদুকর মায়াধর জানিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করব?'

এই কথায় মন্ত্রী দরবারি জাদুকর মায়াধরকে ডেকে পাঠাল। তাকে সব কথা জানিয়ে বলল, 'আমাদের যুবরাজের হৃদয় ফলকে কোন কোনের নাম খোদাই করা আছে তা যুবরাজ যদি নিজে না জানে, অন্যের পক্ষে জানা কি সম্ভব?'

মায়াধর স্বাভাবিক ভাবে হেসে বলল, 'যোগবলে জানা যায়। যুবরাজকে আমার কাছে একটি রাত রাখতে হবে। তারপর আমি তার হৃদয় ফলকের লিখন সভার সমক্ষে দেখাতে

পারব। কিন্তু যে কনের নাম বুকে ফুঠে উঠবে সেই কনের সাথেই বিয়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে যুবরাজের পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আপনি এবং রাজা যদি রাজি থাকেন তো আমি কাজ শুরু করব। আশা করি, আজ্ঞা দিবেন।'

মায়াধরের কথা শুনে রাজার মনে যুগপৎ সন্দেহ এবং বিস্ময় জাগে। কিন্তু রাজা ভাবলেন, যোগের ফলে কী হবে কে জানে, আগে দেখা যাক। কীভাবে কী করে এই জাদুকর। এইসব ভেবে রাজা মত দিলেন।

একটি রাত সুশীলকুমার জাদুকরের ঘরে কাটাল। পরের দিন তাকে দরবারে আনা হল। মন্ত্রী সমস্ত রাজকুমারীদের নাম জোরে জোরে পড়ে ওই নাম লেখা কাগজ জাদুকরের হাতে দিল। জাদু দেখার জন্য সবাই হাঁ করে বসে আছে।

জাদুকর ওই কাগজ একটি থালায় রেখে সেই কাগজ পোড়াল। সেই ছাই নিজের হাতে রগড়াল। তারপর যুবরাজের নগ্ন বুকে সেই ছাই মাখা হাত ঘষল। শীঘ্রই যুবরাজের বুকে 'শালিনী' নাম ফুটে উঠল। সভার সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়! পরক্ষণেই সভার সবাই সরব হল।

'বাকি কাজ আপনারা করুন' বলে জাদুকর নিজের আসনে বসল।

রাজা শালিনীর সাথে যুবরাজের বিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। বিয়ের রাতে যুবরাজ শালিনীকে একটি সাবান উপহার দিল।

'এ আবার কেমনতর উপহার। এর চেয়ে দামি জিনিস আপনি পাননি?' শালিনী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এই সাবানের সাহায্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে পেরেছি। জাদুকর মায়াধর এই সাবান দিয়েই তোমার নাম আমার বুকে লিখে তার উপর কায়দা করে ছাই ঘষে তোমার নাম ফুটিয়ে সভার সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এইভাবে কৌশল করে তোমাকে বিয়ে না করলে বাবা হয়তো তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতেন না।' সুশীলকুমার বলল!

৮. চার জন পথযাত্রী

বিমলাবতী বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখল তার স্বামী ভীষণ বদরাগী। লোকটা বউয়ের জন্য কয়েকটা কড়া নিয়মকানুন বানিয়ে বউকে বলল, 'তুমি ভুলেও কখনো অন্যের সাথে কথা বল না। নীরবে কাজ করে যাবে।'

বিমলাবতী খুব বুদ্ধিমতী। লোকের সাথে কথা বলার অভ্যাস তার ছিল। তার স্বামী তার জন্য যে কড়া নিয়ম চাপাল তা তার কাছে ভালো লাগল না। তার কারণ হল বিমলাবতীর বাপের বাড়ির পরিবেশ। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তার বাপের বাড়িতে যাতায়াত করত। ওদের কথা সে শুনত। শ্বশুর বাড়ির চেহারা আলাদা। কোনো আত্মীয় আসে না। তার স্বামী যে বদমেজাজি তা গ্রামের সবাই জানে। তাই কেউ তার সাথে কথা বলত না।

একদিন বিমলাবতী পাড়ার বাইরের কুয়া থেকে জল আনতে গেল। জল তুলছে এমন সময় চার জন পথযাত্রী ওই কুয়ার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। তাই এরা ওদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে যে সবচেয়ে বড়ো তাকে কুয়ার কাছে পাঠাল। আগে ও জল খাবে তারপর ওরা খাবে। ওই যাত্রী বিমলাবতীর কাছে গিয়ে বলল, 'দিদিভাই, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াবে?'

'কে আপনি?' বিমলাবতী জিজ্ঞেস করল।

'আমি এক যাত্রী। বলল আগন্তুক।

'এই বিশ্বে শুধু মাত্র দু-জন যাত্রী আছে। তৃতীয় কোনো যাত্রী তো নেই।' বলে বিমলাবতী নিজের কাজে মন দেয়।

প্রথম যাত্রীকে জলপান না করে কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় যাত্রীও সেখানে এল। বিমলাবতী দ্বিতীয় যাত্রীকে বলল, ইনি নিজেকে যাত্রী বলে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন, আপনিও কি আর এক যাত্রী?'

সেও যদি নিজেকে যাত্রী বলে পরিচয় দেয় তাহলে তাকেও জল দেবে না ভেবে সে বলল, 'আমি এক গরিব মানুষ।'

'এই বিশ্বে মাত্র দু-জন গরিব আছে। এ ছাড়া অন্য কেউ গরিব নেই। আপনার কথা, সঠিক নয়।' এই কথা বলে বিমলাবতী আবার নিজের কাজে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় যাত্রী কুয়ার কাছে এল। বিমলাবতী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এরা দু-জনে নিজেদের যাত্রী এবং গরিব বলে মিথ্যা কথা বলেছেন, আপনি কে?'

‘আমি এক মূখ।' তৃতীয় জন বলল।

‘আপনিও মিথ্যা কথা বলছেন। এই বিশ্বে দু জনই মূখ আছে।' এই কথা বলে বিমলাবতী নিজের কাজে মগ্ন হয়।

শেষে চতুর্থ জন কুয়ার কাছে এল।

‘আপনি কে দাদা? এই তিন জন নিজেদের যাত্রী, গরিব এবং মূখ বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। অন্তত আপনার কাছ থেকে কি সত্য কথা শুনতে পাব? বিমলাবতী জিজ্ঞেস করল।

‘আমি বলবান।' চতুর্থ জন বলল।

‘এই বিশ্বে দু-জনই বলবান আছে। আপনিও দেখছি মিথ্যা কথাই বললেন।' বলে বিমলাবতী কাপড় নিংড়ে নিল।

‘আপনারা বেচারা খুবই তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা মিটিয়ে এবেলা খাওয়ার জন্যও আসুন আমাদের বাড়ি।' এ-কথা বলে বিমলাবতী ওদের জল খাইয়ে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

নিজের স্ত্রীর পেছনে চার জন পুরুষকে দেখে বিমলাবতীর স্বামী লাঠি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা? তোমার পেছনে পেছনে আসছে কেন?’

‘ওদেরই জিজ্ঞেস করুন।’ বলে বিমলাবতী ঘরের ভেতরে চলে গেল।

‘মশাই, আমরা চার জন পথ যাত্রী। আমাদের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। তাই আপনার স্ত্রীর কাছে কুয়ার জল চাইলাম। উনি জল খাইয়ে খেতে ডেকেছেন। তাই আমরা এসেছি। লাঠি হাতে চোটপাট দেখানো আপনার উচিত হচ্ছে না।' যাত্রীরা বুঝিয়ে বলল।

‘তোমরা মেয়েছেলের কাছে জল চাইছ, তোমাদের সাহস তো কম নয়!’ এ-কথা বলে বিমলাবতীর স্বামী ওদের উপর লাঠি তোলে। সঙ্গেসঙ্গে যে লোকটা নিজেকে বলবান বলে পরিচয় দিয়েছিল সে তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। পরক্ষণেই উভয়ের মধ্যে ঘুষোঘুষি চলে। মারামারির ফলে লোক জমে যায়।
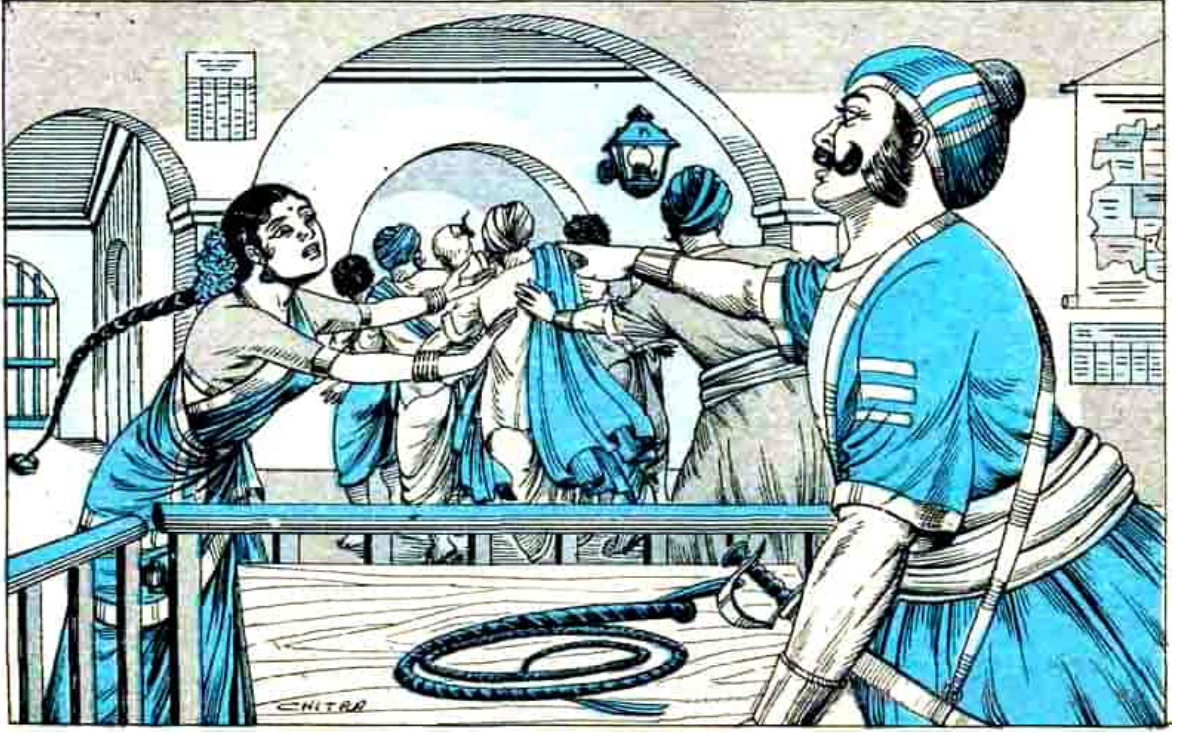
ওদের মারামারির খবর রাজার লোক জানতে পেরে ওদের ধরে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'এরা প্রকাশ্য রাস্তার মাঝে ঝগড়াঝাটি করছে।'

কোতোয়াল ওদের প্রত্যেককে দশটা করে চাবুক মারার হুকুম দেয়।

বিমলাবতী সেই মুহূর্তে সেখানে এসে বলে, 'কোতোয়াল মশাই, আপনার বিচার সঠিক নয়। আপনি আমার কথা না শুনলে আমি রাজার কাছে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব।

'যাও, যাও নালির করগে।' কোতোয়াল ধমক দিয়ে বলল।

'বেশ, তাই যাচ্ছি আর যাচ্ছি বলেই আপনার এখন চাবুক মারা চলবে না । আগে শুনুন রাজার বিচার।' বলে বিমলাবতী সোজা রাজ দরবারে গিয়ে। রাজাকে বলল, "মহারাজ, কোতোয়াল মশাই, অকারণে আমার স্বামী এবং চার জন পথযাত্রীকে সাজা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আপনি কোতোয়ালের কাছে কৈফিয়ত তলব করুন মহারাজ।'

রাজা কোতোয়াল এবং ওই পাঁচ জনকে ডেকে গোটা ব্যাপারটা জানতে চাইলেন।

'এরা কারা? কেন রাস্তার উপর ঝগড়া করছিল?' রাজা বিমলাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মহারাজ, কোতোয়াল এই প্রশ্ন করে থাকলে আমাকে আপনার কাছে আসতে হত না। বিমলাবতী জবাবে বলল।

তারপর বিমলাবতী আগাগোড়া যা ঘটছে তা জানিয়ে বলল, 'এ ব্যাপারে অপরাধ শুধু আমার। আর আমাকে শাস্তি দেবার জন্য তো স্বয়ং আমার স্বামীই আছেন।'

'তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তুমি যে এই পথযাত্রীদের বললে, এই বিশ্বে দু-জন মাত্র যাত্রী, দুজনই গরিব, দুজনই মুখ আর মাত্র দু-জনই বলবান আছে। এখন আমার প্রশ্ন এই দুজন কারা?' রাজা বিমলাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন।

বিমলাবতী জবাবে বলল, 'এই বিশ্বে সূর্য এবং চন্দ্রই সত্যিকারের যাত্রী। গোরু এবং মেয়ে সত্যিকারের গরিব। বরুণ এবং বায়ু এই দু-জনই বলবান। আসল কথা না জেনে যে শাস্তি দেয় আর বাড়িতে আসা লোকের উপর যে। লাঠি তোলে, আমার চোখে এই দু-জনই মুখ মহারাজ!"

রাজা বিমলাবতীর প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন। কোতোয়ালকে তার ওই কাজের জন্য বকলেন এবং বিমলাবতীর স্বামীকে স্ত্রীর উপর ওই সব কড়া নিয়ম চাপানোর ব্যাপারে কটাক্ষ করে বুজিয়ে শুনিয়ে ওদের সবাইকে বাড়ি যেতে বললেন।

৯. গুরু পরমানন্দের ঘোড়া

গুরু পরমানন্দ ও তাঁর শিষ্যদের কাণ্ডকারখানা যেমন হাসির তেমনি বোকামির। একবার শিষ্যদের নিয়ে মঠে গুরু বসে আছেন। কথাবার্তা চলছে। এক শিষ্যের মনে একটা কথা জাগল। শিষ্য তার সাথীদের বলল, 'আমাদের গুরু কত বড়ো একজন মহান ব্যক্তি। এমন কোনো বিদ্যা নেই যা উনি জানেন না। উনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে কত কষ্ট হয়। তাই আমাদের উচিত কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁর জন্য একটা ঘোড়া কেনা।'

প্রত্যেকে এ কথা শুনে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। শেষে সবাই এই প্রস্তাব মেনে নিল। গুরু পরমানন্দও শেষে নিজের সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'তোমাদের মতো শিষ্য থাকতে আমার আর কীসের ভাবনা।'

দু-জন শিষ্যের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হল। তারা যেন চমৎকার লম্বা-চওড়া ঘোড়া দেখে কিনে আনে।

দুই শিষ্য ঘোড়া কিনতে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দূর যাওয়ার পর এক সবুজ ফসলের খেতে চমৎকার পাঁচ-ছ-টা ঘোড়া চরছে নজরে পড়ল। ওই খেতে বড়ো বড়ো কুমড়ো ফলে ছিল। ওই কুমড়ো দেখে এক শিষ্য বলল, 'আরে, ভাই ঘোড়া কিনতে তো খরচ কম হবে না। তার চেয়ে এই ঘোড়ার ডিম পড়ে রয়েছে। ভালো আর বড়ো দেখে একটা ডিম কিনে নিয়ে গিয়ে তা দিতে পারলে গুরুর জন্য অল্প খরচে একটা ভালো ঘোড়া হয়ে যাবে। দুই শিষ্য গুরুর কাছে ফিরে এসে আবার বলল, ‘গুরুদেব, এক জায়গায় দেখলাম অনেক ঘোড়ার ডিম গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওই ডিম কিনে তা দিতে পারলে অতি অল্প খরচে বাচ্চা পাব। আপনার কী নির্দেশ গুরুদেব?’

‘বা! বা! চমৎকার! ভালো কথা, ঘোড়ার ডিম তা দেওয়া হবে কী করে? গুরুর প্রশ্ন।

শিষ্যরা আলাপ-আলোচনা করে শেষে ঠিক করল প্রতিদিন এক একজন শিষ্য ডিমের উপরে বসে বসে তা দেবে। শেষে ওই দুজন শিষ্য টাকা নিয়ে সেই খেতে গিয়ে কিষানকে বলল, 'মশাই ঘোড়ার এই ডিমগুলো দাম কত করে?'

'মাত্র কুড়ি টাকা!' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিষান বলল। তাই দিয়ে একটা বড়ো কুমড়ো মাথায় করে নিয়ে হাঁটা দিল শিষ্যরা। চলতে চলতে এক জায়গায় একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে নীচে পড়ে গেল। কুমড়োও নীচে পড়ে ফেটে দু-ভাগ হয়ে যায়। ঠিক সেই জায়গায় বনের মধ্যে থেকে একটা খরগোশ এখলাফে বেরিয়ে আবার ছুটে পালাতে লাগল।

'আরে, এ তো সর্বনাশ হল। চোখের পলকে ডিম ফেটে তার ভেতর থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ছুটে পালাল। কী তীব্র গতি তার। ওরে বাবা ডিম থেকে বেরিয়েই যে বাচ্চার এত গতি সে বড়ো হলে হয়তো মেঘের বুকেই উড়ে উড়ে বেড়াবে।' এসব কথা বলাবলি করতে করতে গুরু পরমানন্দের দুই শিষ্য ওই খরগোশকে ধরার জন্য তার পেছনে ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু খরগোশ কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গলে কোথায় যে পালিয়ে গেল ধরতে পারল না।

শিষ্য দুজন তো ক্লান্ত হয়ে গেল। এক জায়গায় বিশ্রাম করল। আস্তে আস্তে মঠে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার গুরুকে জানাল।

'এক কাজ কর। ঘোড়া থাক। আমার কপালে ঘোড়ায় চড়া নেই তার আর কী হবে!' এই সব কথা বলে গুরু শিষ্যদের সান্ত্বনা দিলেন।

১০. রাজার জ্ঞাতি

এক হাজার বছর আগের কথা। বঙ্গদেশে এক বড়ো বিবেকবান ধর্মাত্মা রাজা শাসন। করছিল। তার কাছে অনেক ধনসম্পত্তি ছিল। রাজ দিলদরিয়া হয়ে দু হাতে দান করত।

একদিন দরবার বসেছে। এক গরিব বৃদ্ধ দরবারের দরজায় এসে প্রহরীর কাছে রাজার দর্শনের অনুমতি চায়।

'তুমি কে? কোন কাজে এসেছ রাজার কাছে?' প্রহরী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি রাজার জ্ঞাতি। রাজার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।' বৃদ্ধ জবাবে বলল।

প্রহরী এই সংবাদ রাজাকে জানাল। রাজা বৃদ্ধকে দরবারে ঢোকার অনুমতি দিল। রাজার জ্ঞাতিকে দেখার জন্য দরবারের সবাই উৎসুক হয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ দরবারে প্রবেশ করল। ঝুঁকে রাজাকে নমস্কার করল। বৃদ্ধের হাতে একটা লাঠি ছিল। তার পোশাক ছিল ছেড়া এবং নোংরা।

'তুমি কে?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'মহারাজ আমি আপনার বড়ো মাসির ছেলে। এই সম্পর্কে আমি আপনার জ্ঞাতি।' জবাব দিল বৃদ্ধ।

রাজা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আমার বড়ো ভাই, কুশলে আছ তো?'

'কুশলের কথা আর কী বলব মহারাজ? আমার জীবন একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে। আমার সুন্দর ঘর হেলে-দুলে গেছে। আমার বত্রিশ জন লোক, যারা আমার সেবা করত, তারা সব এক এক করে বেরিয়ে গেছে। যে কাজ আগে দু জনে করে ফেলত, এখন ওই দুটির কাজ তিন জনে করছে। আমার কাছের দুই মিত্র দূরে সরে গেছে। যে দুই মিত্র দূরে ছিল তারা কাছে এসে গেছে।' বৃদ্ধ বলল।

'তাহলে তুমি আমার কাছে এলে কেন?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'মহারাজ আমার শেষ জীবন আরামে কাটাতে হলে আপনার সাহায্য নিতেই হবে।' বৃদ্ধ উত্তর দিল।
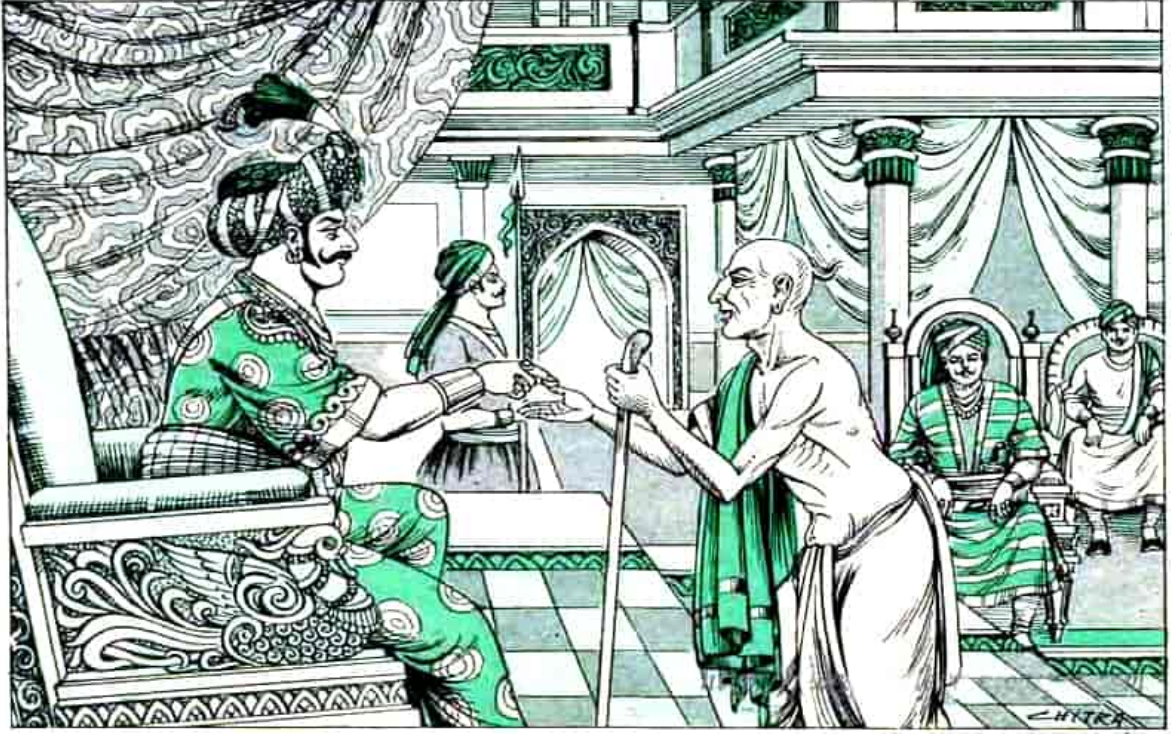
রাজা বুড়োর হাতে এক টাকা দিল। এতে বৃদ্ধ নিরাশ কণ্ঠে বলল, 'মহারাজ, এ আপনি কী দিলেন? আমি ভেবেছিলাম কম করে এক হাজার টাকা পাব। আপনার দানশীলতার এত খ্যাতি, এত প্রশংসা!'

'আরে ভাই আজ খাজনা খালি হয়ে গেছে।' রাজা বলল।

'খাজনা খালি হয়ে গেলে লঙ্কায় যাচ্ছেন না কেন? ওখানে অগাধ সোনা পড়ে আছে।' বুড়ো বলল।

'লঙ্কায় পৌঁছাতে হলে তো সমুদ্র পার হতে হবে। আমি কী করে পার হব?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

'এ আর এমনকী সমস্যা। প্রথমে আমাকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দেবেন তারপর আপনি পায়ে হেঁটেই লঙ্কায় যেতে পারবেন।' বুড়ো বলল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠে খাজানা থেকে এক লক্ষ টাকা আনিয়ে বৃদ্ধকে দিয়ে দিল। বুড়ো বিদায় নিল।

এরপর দরবারে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। রাজা এবং বৃদ্ধের মধ্যে যে কথাবার্তা হল দরবারের কেউ তার অর্থ বুঝতে পারেনি। এই ব্যাপার অনুমান করে রাজা সবাইকে বুঝিয়ে বলল :

'আমার ধারণা বৃদ্ধের কথা সবার কাছে পরিষ্কার হয়নি। উনি আমার জ্ঞাতি বললেন। আমার বড়ো মাসির ছেলে।' সবাই জানে দারিদ্র্য দেবী আর লক্ষ্মী দেবী দুই বোন। বৃদ্ধ

জানাতে চাইল যে আমি লক্ষ্মীপুত্র আর বুড়ো হল লক্ষ্মীর বড়ো বোন দারিদ্র্য দেবীর পুত্র। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমরা দুজন জ্ঞাতি। ওর নড়বড়ে ঘর হল ওর শরীর। ওর বত্রিশটি সেবক হল ওর বত্রিশটা দাঁত। ওই দাঁতগুলো পড়ে গেছে। বাইরের কাজ করতে আগে যেখানে দুটির প্রয়োজন হত আজকাল তিনটি লাগে। তার মানে আগে দু-পায়ে চলত আর আজকাল সেখানে দরকার পড়ছে একটি লাঠির। আগে দুই মিত্র দূরে ছিল এখন তারা কাছে এসে গেছে। ওই দুই মিত্র হল তার চোখ। আর আগে যে দুই মিত্র কাছে ছিল তারা এখন দূরে সরে গেছে। এই দুই মিত্র হল কান। অর্থাৎ সে চোখে ভালো দেখে না, কানে ভালো শোনে না। এই সব কথার চেয়ে সে আর একটা চমৎকার কথা বলল। তা হল আমি তাকে লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। তার পেছনে আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারব। আমি যখন বললাম যে খাজানা খালি হয়ে গেছে তখনই আমার কথার পিঠে বুড়ো লঙ্কার কথা বলল। এই কথার মানে হল সে যেহেতু দারিদ্র্য দেবীর পুত্র, সে যেহেতু আমার ঘরে এসেছে সেইহেতু খাজানা খালি হয়ে গেছে। তাকে দেবার কিছুই বাকি নেই। শুধু এই একটি মাত্র কথার জন্য আমি তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিলাম।'

এরপর দরবারের সবাই বুড়োর চাতুর্যপূর্ণ কথা এবং রাজার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হল।

১১. দু-জন ভিখারি

দক্ষিণের এক গ্রামে রাঘব ও শংকর নামে দুই বন্ধু ছিল। রাঘব ছিল বৈষ্ণব এবং শংকর ছিল শৈব। দুজনেই একসাথে ভিক্ষে করতে বেরুত। যেখানে ভিক্ষে করতে করতে রাত হয়ে যেত সেখানেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ত।

রাঘব ভিক্ষে করতে যেদিকে গেল সেদিকের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, 'মাগো, মা, ভিক্ষে দিন মা।'

ওই ঘরের গৃহিণী নিজের বাচ্চা মেয়ের কান্না থামাতে না পেরে সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ফের যদি বিরক্ত করিস তো দেখবি। দিয়ে দেব ওই বৈষ্ণব ভিখারিকে।' এরপর ওই গৃহিণী ভিক্ষে দিয়ে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু ভিখারি দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে বলল, 'মাগো, তোমার মেয়েকে যে দেব বললে, দাও। বলে দোর গোড়ায় বসে পড়ল। গৃহিণী ভিখারির কথায় চটে গিয়ে বলল, 'মেয়েকে দিতে হবে? দিচ্ছি, কর্তা খেত থেকে ফিরুক। ওঁকে না জিজ্ঞেস করে মেয়েটাকে তোমাকে দিই কী করে বল।'

রাঘব ঠায় বসে রইল সেখানে।

'আমাদের মেয়েটা কাঁদছিল। হঠাৎ বললাম, কাঁদলে দিয়ে দেব ওই ভিখারিকে। সে কথা শুনে লোকটা ঠায় বসে আছে।' গৃহিণী তার স্বামীকে বলল।

খেত থেকে খেটে খুটে এসে বউ-এর কথা শুনে ওর ভীষণ রাগ ধরল ভিখারির উপর। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে রাঘবকে ঠেঙিয়ে তাড়িয়ে দিল। মনে মনে রাঘব ঠিক করল শংকরকেও মার খাওয়াবে।

রাঘব মার খেয়ে কুঁকতে ধুকতে ওই আশ্রমে ফিরে এলে শৈব শংকর বলল, 'কী হে রাঘব, তোমার এত দেরি হল কেন? কী ব্যাপার?'

'ওপাড়ার চৌধুরিদের বাড়িতে আজ মেয়ের জন্মদিন পালন করছে। বাবা, এই মাগগিগণ্ডার দিনে কী খরচ করল! ভিখারিদের এত মাংস, পায়েস, দই, রসগোল্লা খাওয়াতে আমার বাপের জন্মে দেখিনি। তা পেলুম যখন ধীরে ধীরে বসে বসে খেলুম। আবার ভাবলাম কী জানি, ঘুরতে ঘুরতে যদি তুমিও চলে আস, তাহলে এক সাথেই ফিরব। কিন্তু তুমি তো আর গেলে না।' রাঘব বলল।
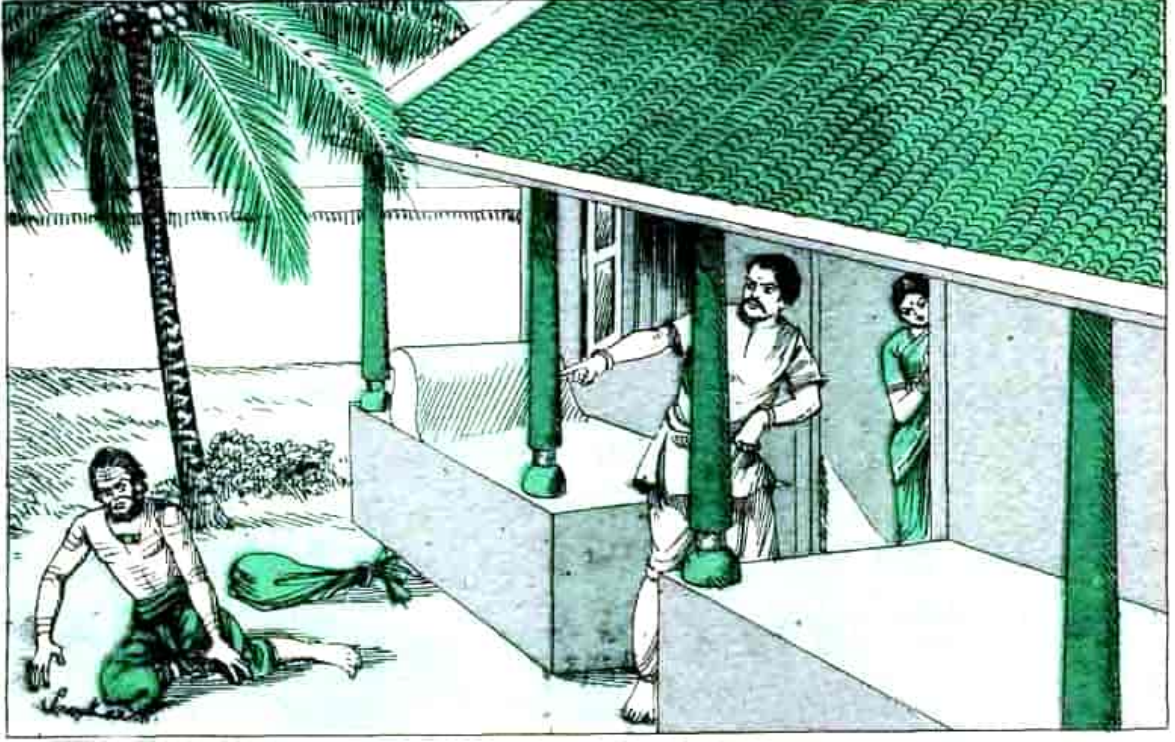
মাংস পায়েস দই রসগোল্লার কথা শুনে শংকর চৌধুরিদের বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল ওই পাড়ার দিকে। চৌধুরিদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'বাবু, আজ আপনার মেয়ে—'

'পাজি, নচ্ছার তোকে এত পিটলাম তাতেও তোর জ্ঞান হল না।' বলে ওই বাড়ির কর্তা একটা লাঠি নিয়ে মেরে তাড়াল।

শংকর আস্তানায় ফিরে এসে রাঘবকে কিছু বলল না। রাঘবও শংকরের সাথে খাওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বলল না। কিন্তু শংকর মনে মনে ঠিক করে নিল রাঘবের এই অপরাধের বদলা নেবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। শংকর বলল, 'বুঝলে রাঘব, আমি তো শৈব। তোমার কপালের তিলক উপর নীচে কাটা। সোজাসুজি টানা। আমি যেহেতু শৈব, আমার কপালের বিভূতিরেখা আড়াআড়ি টানা। এই আশ্রমের চালের দিকে তাকাও। সোজাসুজি কাঠের উপরে আড়াআড়ি কাঠগুলো আছে। অতএব তোমার উপরে আমার স্থান।'

'তা হতেই পারে না। এ অসহ্য।' বলে, রাঘব চালে উঠে আড়াআড়ি যত কাঠ ছিল সব টেনে তুলে ফেলে দিল নীচে। তারপর শংকরও চালে উঠে সোজাসুজি যে কাঠগুলো ছিল সেগুলো টেনে তুলে নীচে ফেলে দিল।

কিছুক্ষণ পর শংকর রাঘবকে বলল, 'আমরা দুজনে তো চালের সব কাঠ তুলে ফেলে দিয়েছি। সকালে গাঁয়ের লোক, কে ফেলেছে জিজ্ঞেস করলে তুমি মুখে কিছু বলবে না। আমার কপালের বিভুতিরেখা আড়াআড়ি আছে তাই আমি মাথাটাকে আড়াআড়ি নাড়ব। আর তোমার কপালের তিলক রেখা। উপরে নীচে সোজাসুজি কাটা আছে, তাই তুমি মাথাটাকে উপর নীচে নাড়বে।'

রাঘব বুঝতেই পারল না যে উপর-নীচে মাথা নাড়লে 'হ্যাঁ' হয়; আর আড়াআড়ি মাথা নাড়লে 'না' হয়। সকালে গাঁয়ের লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে এসব কাঠ তুলে ফেলেছে।' তৎক্ষণাৎ শংকর আড়াআড়ি মাথা নাড়ল। আর রাঘব উপর-নীচে মাথা নাড়ল। গাঁয়ের পাঁচজন বুঝলো যে এ অপকর্ম রাঘবেরই। সেই সব কাঠ তুলে ফেলেছে। তাই এরা রাঘবকে ভীষণ মারল।

'এ কী করলে বল দিকি? আমাকে শেষে মার খাওয়ালে?' রাঘব বলল।

'আর তুমি যখন আমাকে চৌধুরিদের বাড়িতে মার খাওয়াতে পাঠালে। তখন কেমন লাগছিল? তাই বলি আর কোনোদিন অমন কাজ কোরো না।' শংকর বলল।

১২. ক্ষতি করতে গিয়ে

এক দেশে এক বুড়ো ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। বড়ো ছেলের নাম প্রাণেশ্বর আর ছোটোর নাম কনকেশ্বর। ওদের বিষয়সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু ছিল না । বাড়ি, কয়েকটি মুরগি ও একটি কুকুর।

মৃত্যুর আগে বুড়ো দুই ছেলেকে ডেকে বলল, 'বাছা ধনেরা, আমার মারা যাওয়ার পর তোমরা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া না করে আপোষে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে সুখে দিন যাপন কর। কেউ কাউকে ঠকিয়ো না।' বুড়ো ছেলেদের উপদেশ দিল। দুই ছেলে বাবার কথামতো চলার কথা দিল।

বাবার মারা যাবার পর তারা ঘরবাড়ি সব ভাগ করে নিল।

বড়ো ছেলে প্রাণেশ্বরের নজর পড়ল মুরগিগুলোর উপর। কুকুর পোষা বৃথা। মুরগি ডিম পাড়ে, বাচ্চা হবে। এসব বিক্রি করে অনেক অর্থ রোজগার করা যাবে। এই কথা ভাবল প্রাণেশ্বর।

তারপর প্রাণেশ্বর ছোটো ভাই কনকেশ্বরকে বলল, 'ভাই, বাবা সব কিছু আপোষে ভাগ করে নিতে বলেছেন। তাই ভাবছি, মুরগিগুলো আমি নিয়ে নিই। আর তার চেয়ে অনেক দামি জিনিস কুকুর তুমি নিয়ে নাও। কুকুরের সাহায্যে তুমি অনেক রোজগার করতে পারবে। তোমার কী মত?' প্রাণেশ্বর জিজ্ঞেস করল।

অমায়িক কনকেশ্বর তাতেই রাজি হল। কনকেশ্বরের দোরগোড়ায় কুকুর বাঁধা হল।

কিছুদিনের মধ্যেই কনকেশ্বরের টান পড়ল। কিছু রোজগার না করলে খেতে পাবে না। কুকুরকেও খেতে দিতে পারছে না। তাই সে কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বনে। ওই কুকুরের সাহায্যে এক হরিণ শিকার করে তা শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ভালো রোজগার করল। প্রয়োজনীয় সব কিছু সে কিনে আনল বাজার থেকে।

প্রত্যেক দিন কনকেশ্বর কুকুর নিয়ে বনে যেত। কোনো-না-কোনো জন্তু শিকার করে শহরে বিক্রি করে রোজগার করতে লাগল। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যে কনকেশ্বর অনেক রোজগার করল।

এসব দেখে প্রাণেশ্বরের কনকেশ্বরের উপর ও তার কুকুরের উপর ভীষণ ঈর্ষা জাগল। যেকোনো ভাবে ওই কুকুরকে মেরে ফেলার প্রতিজ্ঞা করল।

সন্ধের দিকে কনকেশ্বর কোথায় যেন গিয়েছিল। প্রাণেশ্বর তাড়াতাড়ি ভাতের সাথে বিষ মিশিয়ে ওই কুকুরকে খেতে দিয়ে ঝট করে নিজের ঘরে ঢুকে কী যেন একটা কাজ করতে লাগল।

প্রাণেশ্বরের মনে আনন্দ আর ধরে না। ছোটো ভাইয়ের কুকুর এখন মারা যাবে। কুকুর মারা গেলে শিকার হবে না। শিকার না হলে রোজগার হবে না । অপর পক্ষে তার নিজের মুরগিগুলো প্রতিদিন ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়।

কুকুর বিষ মাখানো ভাত পেটে রাখতে না পেরে প্রাণেশ্বরের ঘরের পেছনে গিয়ে সব বমি করে দেয়।

তার কিছুক্ষণ পরে প্রাণেশ্বরের মুরগিগুলো ওদের ঘরের পেছনে গিয়ে ওই বমি করা ভাত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেলে প্রাণেশ্বর সমস্ত মুরগি খোপরে পুরে রাখল।

পরের দিন ঘুম ভাঙার পর প্রাণেশ্বর ভাবল কনকেশ্বরের কুকুর নিশ্চয়ই মারা গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখতে পেল কনকেশ্বর কুকুর নিয়ে অন্য দিনের মতোই বেরুচ্ছে।

কুকুরকে বেঁচে থাকতে দেখে প্রাণেশ্বর অবাক হল। বিষে কোনো কাজ হল না। তারপর সকাল হয়ে গেছে তাই মুরগিদের ছাড়ার জন্য খুপরির কাছে এসে দেখে সব মুরগি মরে পড়ে রয়েছে।

১৩. আলাভোলা

এক গ্রামে জানকী নামে এক বিধবা ছিল। তার রামু নামে এক আলাভোলা ছেলে ছিল। তার মা অনেক কষ্টে তাকে লালনপালন করে বড়ো করল।

একদিন জানকী রামুকে বলল, 'বাবা, কোথাও গিয়ে একটা কাজের খোঁজ কর। কাজ না করলে দু-পয়সা রোজগার হবে কী করে।'

'ভালো কথা মা। আমাকে খাবার বানিয়ে দাও। শহরে গিয়ে কাজের খোঁজ করে সন্ধের সময় ফিরব।' বলল রামু।

জানকী খাবার বানিয়ে পোঁটলা বেঁধে রামুর হাতে দিল। রামু তা নিয়ে শহরের দিকে রওনা দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর রামু ক্লান্ত হয়ে যায়। খিদেও পায়। তাই সে এক পুকুরের ধারে গাছের নীচে বসল। খাবার খেয়ে জল খেল। তারপর ওই গাছের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতেই রামু দেখে সন্ধে হয়ে গেছে। ঠিক তখনই সে দেখল একটা গিরগিটি নিজের মাথা একবার উপর আর একবার নীচের দিকে দোলাচ্ছে। রামু ভাবল গিরগিটি তাকে হয়তো জিজ্ঞেস করছে, 'কী চাই?'

রামু বলল, 'কাজ চাই।' গিরগিটি আবার মাথাটাকে উপর-নীচ করল।

'ও তুমি আমাকে কাজ দেবে? তাহলে কাল থেকেই তোমার কাজে লেগে যাব। এখন তো সন্ধে হয়ে গেছে।'

বলে রামু বাড়ি ফিরে গেল, মাকে বলল যে সে কাজ পেয়ে গেছে।

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন রামু খাবার নিয়ে যেত। ওই গাছের নীচে বসে খেত। জল খেত আর ঘুমোত।

গিরগিটি কাজ দিলে কাজ করবে, এই হল রামুর মনোভাব। এইভাবে একমাস কেটে গেল। তার মা বলল, 'হ্যাঁরে রামু, তোর মালিক তোর মাসমাইনে দেয়নি?'
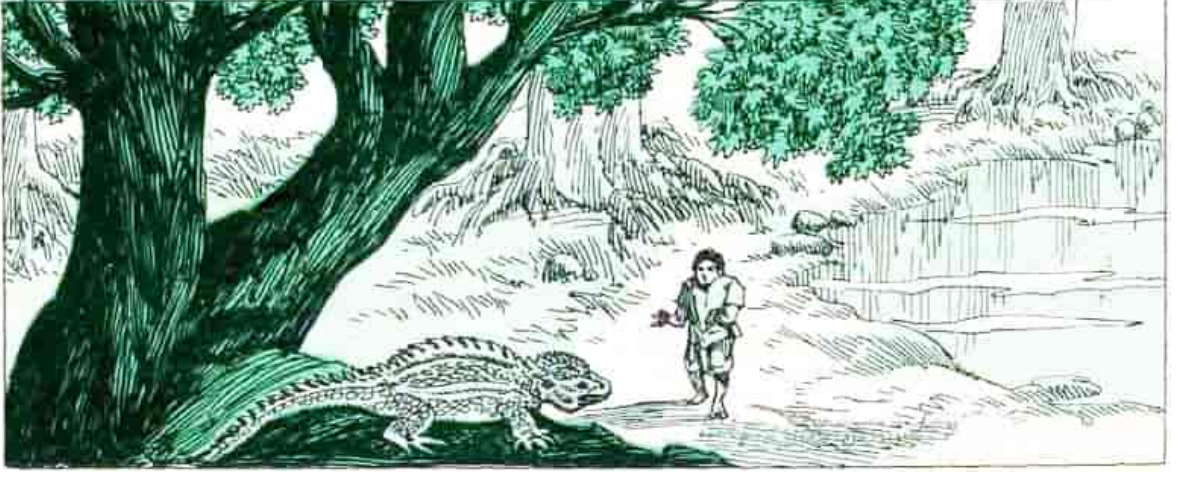
''আজকেই মাইনে চাইব মা।' বলল রামু। সেদিন সে ওই গাছের নীচে বসে খাবার খেয়ে ঘুমোল না। ঠায় বসে রইল রামু। ওই গিরগিটির অপেক্ষায়। ঘুম পেলেও ঘুমলো না। অনেকক্ষণ পরে সে গিরগিটিকে দেখতে পেল। গাছের নীচের এক গর্ত থেকে সে বেরুচ্ছিল। রামু তাকে প্রশ্ন করল, 'আমি এক মাস ধরে তোমার কাজে আসি, আমাকে মাইনে দাও।' গিরগিটি সেই মাথা নাড়াচ্ছে।

'ও কাল দেবে? ঠিক আছে।' রামু বলল। বাড়ি ফিরে এসে রামু মাকে বলল, কাল মাইনে দেবে বলেছে।'

পরের দিন রামু গিরগিটিকে দেখেই বলল, 'মাইনে এনেছ?' গিরগিটি যথারীতি মাথা উপর নীচে নাড়ল।

ওর এই একইভাবে মাথা নাড়ানো দেখে রামুর ভীষণ রাগ ধরল। সে একটা ঢিল হাতে তুলে নিয়ে গিরগিটির দিকে ছুঁড়ল। গিরগিটি ঘাবড়ে গিয়ে গাছ থেকে নেমে ওই গর্তের ভিতর ঢুকে গেল।

রামু ভীষণভাবে খেপে গিয়ে ছুটে বাড়ি গিয়ে শাবল এনে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলল। কিন্তু গিরগিটির পাত্তা নেই। সে কোন ফাঁকে কোথায় পালিয়েছে। রামুর জিদ তখনও রয়েছে। সে খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই। অবশেষে হঠাৎ তার শাবলের ঘা লাগল মণি মুক্তোভরা এক কলসির গায়ে।

যত পারল ওই মণি মুক্তো পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল। মার প্রশ্নের জবাবে রামু আদ্যোপান্ত যা ঘটল সব জানাল। অন্ধকার হয়ে গেলে জানকী ছেলেকে নিয়ে ওই গাছের নীচের গর্তের কাছে এসে ওই কলসি তুলে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর থেকে আলাভোলা রামুর জীবনে আর কাজ করার দরকার পড়ল না।

১৪. বিনিদ্র রাজা

সেকালের কথা। সে দেশের রাজার কোনো কিছুর অভাব ছিল না। ঐশ্বর্যে ভরপুর। সারাবছর ধরে রাজার উদ্যানে নানান রকমের ফুল ফুটত। উদ্যানের অন্য পাশে রাজার শিকারের এক বিশাল বন ছিল। রাজা সেখানে শিকার করতেন।

রাজার সব রকমের সুখ ছিল। ছিল না একটির। রাজার চোখে ঘুম ছিল না। কিছুতেই ঘুম পেত না। এই নিদ্রা সুখ থেকে রাজা একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন। এই রোগ সারানোর জন্য রাজা বহু বৈদ্য বা চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন। কত চিকিৎসক এলেন, কত ওষুধ খেলেন কিন্তু কোনো ফল হল না।

সারারাত বিছানায় ছটফট করে রাজার বিরক্তি ধরে যেত। মনে হত তার জীবন বৃথা। একদিন রাজা ভোরে এক সাধারণ লোকের পোশাক পরে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চলে গেলের জঙ্গলে। হাঁটতে লাগলেন। কীসের যেন শব্দ ভেসে এল তাঁর কানে। যেদিক দিয়ে শব্দ আসছে সেদিকে তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন একটা লোক কুঠার দিয়ে গাছ কাটছে। রাজা ভাবলেন, বেচারা কত পরিশ্রম করছে। রোদও বাড়ছে। চড়চড় করে।

কিছুক্ষণ পর লোকটা কুঠার নীচে রেখে নিজের ময়লা কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে মাটিতে সটান শুয়ে বলে ওঠে, 'উফ মাগো!' তারপর লোকটা পাশ ফিরেই অচেনা একজনকে দেখে ঝট করে উঠে বসে।

রাজা দরদি চোখে কাঠুরের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলেন, 'তুমি হয়তো ক্লান্ত হয়েছ। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।'

'আপনাকে মশাই দেখেই প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের সর্দার। তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনো পরিশ্রমই করেন না।' কাঠুরে বলল।

'ঠিকই বলেছ।' রাজা জবাব দিলেন।

'আপনার পোশাক ধবধবে পরিষ্কার। আপনার হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ নরম। আমার হাত দেখুন কীরকম কড়া পড়ে গেছে। আপনি বোধ হয় পোশাক সেলাই করা দর্জি।' কাঠুরে বলল।

'আমি দর্জি নই। সে যাই হোক। আচ্ছা এত পরিশ্রমের পর তোমার ঘুম কী করে পায়?' রাজা জিজ্ঞেস করল।

কাঠুরের কাছে এই প্রশ্ন পাগলের প্রশ্নের মতো লাগল। হো-হো করে হেসে উঠে বলে, 'আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমোতে পারি। ছারপোকা কামড়ালেও আমি টের পাই না।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' রাজা বললেন।

'আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমার কাছে টাকা থাকলে আমি টানা এক সপ্তাহ ঘুমোতাম। কিন্তু আমি যে গরিব। কাজ না করলে আমার বউ-ছেলে-মেয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে।' কাঠুরে বলল।

আচ্ছা, তুমি শোননি, আমাদের রাজার ঘুম পায় না।' রাজা বলল।

আমিও তো ভেবে পাই না কেন ঘুম পায় না। তাকে তো আমার মতো খাটতে হয় না। ঘুমানোর ভালো মোলায়েম নরম বিছানা আছে। কেন যে ওঁর ঘুম পায় না!' কাঠুরে বলল।

রাজা মৌন রইলেন। কাঠুরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি আর বসে বসে কথা বলতে পারব না। আমাদের সর্দার এসে যাবে। আমাকে বসা দেখলে একেবারে দূর করে দেবে।' এই কথা বলে কাঠুরে আবার কুড়ুল হাতে তুলে নিয়ে গাছ কাটতে লাগল।

কাঠুরের কাঠ কাটা রাজা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করে মনে মনে বলল, রাজা হয়েও আমি ঘুমোতে পারছি না। এই কাঠুরে কেমন সুন্দর ঘুমোতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে রাজা কাঠুরেকে বলল, 'তুমি ওই গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়। তোমার ঘুমোনো আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'ভালো কথা বললেন। আমাকে সন্ধের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে!' কাঠুরে বলল।

'সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি।' এই কথা বলে রাজা কাঠুরের কাছ থেকে কুড়ুল কেড়ে নিল।

কাঠুরে রাজার দিকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভেবে গাছের ছায়ায় শুয়ে পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাজা লোকটার ঘুম দেখে মনে মনে বললেন, আশ্চর্য! বিছানা নেই, বালিশ নেই, নিদেন পক্ষে একটা মাদুরও নেই। এ কেমন করে ঘুমোতে পারল।

হঠাৎ রাজার খেয়াল হল, তাঁকে তো ওই বাকি কাজটা করে দিতে হবে। তাই রাজা কুড়ুল নিয়ে ওই গাছ কাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার শরীর ঘেমে গেল। আর পারছেন না। ঘেমে-নেয়ে অস্থির। রাজা গায়ের জামা খুলে ফেললেন।

অনেক পরিশ্রমের পর রাজার গাছ কাটা হল। রাজার হাতের ছাল চামড়া যেন উঠে গেল। কোমার আর হাত ব্যথায় টন টন করতে লাগল। ক্লান্ত শ্রান্ত। রাজা টলতে টলতে গিয়ে ওই কাঠুরের পাশে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার চোখ ভারী হয়ে এল।

পরক্ষণেই গভীর ঘুমে যেন হারিয়ে গেল।

সন্ধে হয়ে গেল। সর্দার প্রত্যেকের কাজের হিসেব নিতে নিতে সেখানে পৌঁছে গেল। এসে দেখে তার কাঠুরে অন্য একটা লোকের পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে! দেখে সর্দারের পিত্তি জ্বলে গেল। কাজ ফেলে ঘুমোনো হচ্ছে। গজ গজ করতে করতে সর্দার টেনে এক লাথি কষিয়ে বলল, 'আরে হেই, ওঠ!'

রাজার ঘুম ছুটে গেল। সদারকে বললেন, 'তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? বেচারা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ঘুমোতে দাও।'

'তুমি কে হে আমাকে বোঝাতে এসেছ? তুমি জান আমি এই জঙ্গলের সর্দার।' ভীষণ মেজাজে বলল সর্দার।

ফলে রাজার ভীষণ রাগ ধরল। দাঁত রগড়াতে রগড়াতে বললেন, ‘ওকে যদি তোল, তাহলে তোমার গলা টিপে দেব।'

সর্দার এই ধরনের কথা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। পেছতে পেছতে বলল ‘আমি আবার আসছি। তোমাকে একচোট দেখে নেব।'

ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদে হইচই পড়ে গেল। ভোর থেকে রাজার কোনো পাত্তা নেই। রাজার খোঁজে প্রাসাদের লোক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একদল রাজার খোঁজে জঙ্গলেও এল। রাজাকে যে সর্দার শাসিয়ে ছিল তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে ও মশাই, এখানে রাজাকে দেখেছেন?’

'রাজাকে আমি চিনি না। কিন্তু আমার এই জঙ্গলে একটা লোকের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই ব্যাটাই রাজার রাজা। চল লোকটাকে দেখিয়ে আসি।' ওই কথা বলে ওদের নিয়ে গিয়ে সর্দার সাধারণ পোশাক পরা রাজার দিকে তর্জনি দেখাল।

রাজপ্রাসাদের লোক চিনতে পেরে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আজ সকাল থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি।'

রাজা ওই ঘুমন্ত কাঠুরেকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমরা এই লোকটাকে যত্ন করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে মখমলের বিছানায় শুইয়ে দাও। যতক্ষণ না লোকটা জাগে ততক্ষণ ঘুমোতে দাও। জাগার পর পেট ভরে খাইয়ে দিও ! এই কাঠুরে আমার অসুখ সারিয়েছে। কোনো বৈদ্য যা পারেনি এ তাই পেরেছে।'

১৫. ধর্মদাতা

সেকালের কথা। বাগদাদ শহরে এক লক্ষপতি ছিল। অনেক দানধর্ম করে সে ধর্মদাতা নামে যশ প্রাপ্ত হয়। সেই নগরেই আর এক লক্ষপতি ছিল। সে ছিল খুব লোভী। সে কোনোদিন কাউকে এক কানাকড়িও দান করত না। সেইজন্য লোকে যেখানে ধর্মদাতার প্রশংসা করত সেখানে ওই লোভীটার নিন্দেও করত।

লোভী ভাবল তার এই অপযশ দূর করতে হবে। সে তার এক বিশ্বাসী চাকর আবদুল রজাককে একটা উপায় বের করতে বলল। আবদুল রজাক ভেবে বলল, 'লোকের কাছ থেকে ধর্মদাতা হিসেবে যশ পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এরজন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর চেয়ে সহজ পন্থা আছে। ধর্মদাতা নামে যে যশ পেয়েছে তাকে দিয়ে কৌশলে যশ প্রচার করানো সহজ ব্যাপার। ধর্মদাতাকে একদিন আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করুন। আমি নানান পোশাক পরে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে আসব। আপনি প্রত্যেক বার একশো দিনার আমাকে ভিক্ষে দিয়ে যাবেন। সেই দৃশ্য দেখে উনি সবার কাছে আপনার দানের কথা প্রচার করবেন। এইভাবে আপনার শ ছড়িয়ে পড়বে।' বলল আবদুল রজাক।

‘তোমার পরামর্শ মনে হচ্ছে ভালো। তুমি কালকেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমার বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ করে এসো।' লোভী বলল।

আবদুল রজাক ধর্মদাতার বাড়ি গিয়ে নিজের মালিকের নাম জানিয়ে বলল, 'হুজুর, কাল সকালেই আমার মালিকের বাড়ি যাওয়ার এবং খাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করার জন্য মালিক আমাকে পাঠিয়েছেন।' আবদুল সবিনয়ে বলল।

‘তোমার মালিক তো কাউকে কানাকড়িও দেন না বলে শুনেছি। আমাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করছেন এ বড়ো আশ্চর্যের ব্যাপার।' ধর্মদাতা বলল।

‘হুজুর, আমার মালিকের ব্যাপারে লোকের প্রচারে কান দেবেন না। আসলে উনি কিন্তু বিরাট দাতা। তবে উনি প্রকাশ্যে কাউকে দান করেন না। গোপনে দান করেন। তৃতীয় জন ওঁর দানের কথা জানে না। কালকে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।' আবদুল রজাক বলল।

'ভালো কথা। তুমি তোমার মালিককে জানিয়ে দাও আমি কাল সকালেই যাব।'

এ-কথা জানিয়ে আবদুল রজাককে বিদায় দিল। ওর চলে যাওয়ার পর ধর্মদাতা নিজের বিশ্বাসী চাকর আজীজকে ডেকে কী যেন বলল কিছুক্ষণ।

পরের দিন সকালে ধর্মদাতা লোভীর বাড়ি গেল। লোভী সাদরে তাকে ডেকে বসিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলল, 'দেখুন, আমার দানধর্ম সম্পর্কে প্রচার হোক এ আমি চাই না। এ আমার একেবারে অপছন্দ। আমি দান করতে চাই যশলাভ করতে চাই না।'

ওরা দুজন কথা বলার সময় আবদুল রজাক এক ফাঁকে সরে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে এক অন্ধ ভিখারির বেশ ধারণ করে নিজের মালিকের কাছে ভিক্ষে করতে এল। লোভী থলি থেকে এক-শো দিনার বের করে ভিখারির হাতে দিল।

অন্ধ ভিখারি যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ভিখারি এল। লোভী থলি থেকে এক-শো দিনার বের করে তাকে দিল। দুপুরের মধ্যে এইভাবে একের-পর-এক ফকির, বোবা, খোঁড়া প্রভৃতি বেশে দশ জন ভিখারি এল। প্রত্যেককে লোভী এক-শো দিনার বের করে দিল। আর মনে মনে চাকরের বেশ বদলের তারিফ করল।

ধর্মদাতা এসব লক্ষ করে লোভীকে বলল, 'আপনার মতো দানধর্মকারীকে আমি জীবনে দেখিনি। আমার চোখের সামনেই আপনি এক হাজার দিনার দান করে দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আপনার কাছে আশ্চর্য লাগলেও আমার কাছে এসব সাধারণ ব্যাপার।' লোভী বলল।

দুপুরে আবদুল রজাক নিজের সাধারণ পোশাকে ফিরে এসে অন্য ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছু পিছু লোভী ওই ঘরে ঢুকে বলল, 'চমৎকার বেশ ধারণ করেছ। চিনতেই পারিনি। কই, সব দিনার বের কর।' লোভী চাইল।

'নিন এই তিন-শো দিনার।' এ কথা বলে আবদুল রজাক তিন-শো দিনার দিল।

'কেন, কেন তিন-শো কেন? আমি তো এক হাজার দিনার দিয়েছিলাম।'

লোভী ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'এক হাজার কেন হবে! আমি তো মাত্র তিন বার বেশ বদলে এসেছিলাম।' আপনি আমাকে তিন বার তিন-শো দিনার দিয়েছিলেন। বলল আবদুল রজাক।

'তুমি মাত্র তিন বার এলে, বাকি সাত বার ভিক্ষে করতে কে এল?' লোভী চটে গিয়ে বলল।

'ওই সাত বার হয়তো আমার চাকর আজীজ এসেছিল।' ধর্মদাতার কণ্ঠস্বর।

দু-জনে ফিরে দেখে ধর্মদাতা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। লোভীর পেছন পেছন এসে আড়ি পেতে এতক্ষন ধর্মদাতা সব কথা শুনছিল। লোভীর মুখ সাদা হল ।

'আজীজ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। সেও বিশ্বাসী চাকর। আপনার অর্থ হারাবে না।' ধর্মদাতা লোভীকে সাহস জোগাল।

ঠিক সেইসময় আজীজ এসে সাত-শো দিনার লোভীর হাতে দিল। বিস্মিত ও অপমানিত হয়ে লোভীর চেহারায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। লোভীর মুখ থেকে আর একটি শব্দও বেরুল না। লোভীর ঘাড় হেট করা রইল।

১৬. কুশল প্রশ্ন

এক গ্রামে এক ধনী ছিল। শংকর নামে তার একটি ছেলে ছিল। শংকর এক গরিব মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করল। বউটির নাম বিশালাক্ষী। শ্বশুর-শাশুড়ি বউমাকে পছন্দ করত না। উপেক্ষা করত।

গরিব ঘরের মেয়ে বিশালাক্ষী প্রায়ই শ্বশুর শাশুড়ির কাছে কথা শুনত। তার স্বামী শংকরের মাধ্যমে সে বাপের বাড়ির কুশল প্রশ্ন জানতে পারত। শংকর একবার খবর আনল তার বাবা মেয়েকে দেখতে চায়।

বিশালাক্ষী স্বামীকে বলল, 'বাবার কাছে ভালো কাপড় জামা না পাঠালে বাবা কী করে আসবে?'

কিছুদিন পরে জামাইয়ের পাঠানো জামাকাপড় পরে মেয়েকে দেখতে এল বিশালাক্ষীর বাবা। শংকরের বাবা বেয়াইকে তেমন সাদর অভ্যর্থনা জানাল না। বউমাকে বলল, 'তোমার বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

বিশালাক্ষী বারান্দায় বাবাকে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন করল। সে জানত বাবার সাথে কী ধরনের কথা হচ্ছে তা শোনার জন্য ঠিক তার শ্বশুর-শাশুড়ি আড়ি পেতে শুনছেন। তাই সে কায়দা করে প্রশ্ন করল, 'আমাদের সিন্দুক সবসময় বেশ ঝমঝম আওয়াজ দিচ্ছে তো?'

বিশালাক্ষীর বাপের বাড়ি কুঁড়ে ঘরের। দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ছিল। ঝড় উঠলে পড়ো পড়ো অবস্থা হত।

'সিন্দুক তো মা আগের মতোই আওয়াজ দিচ্ছে!' ওর বাবা জবাবে বলল।

'খেতের ধান ভালো করে ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরে যত্ন করে ঘরে তোলা হচ্ছে তো?' বিশালাক্ষী জিজ্ঞেস করল। ওদের বাড়ির লোক বেচারা খুদকুঁড়ো জোগাড় করে এনে ঝেড়ে বেছে খেত।

'ও তো, আনতেই হবে মা, সব ঠিক আগের মতোই চলছে। বাবা বলল। 'বাড়ির কোনায় যে দাঁত দুটো ছিল তা ঠিক আছে তো? নতুন দাঁত লাগানোর যে কথা ছিল তা হয়নি?' মেয়ে আবার প্রশ্ন করল। দাঁত মানে হাতির দাঁত নয়। বাঁশের খুঁটি।

'নতুন দাঁত লাগানোর কথা ভাবছি।' বিশালাক্ষীর বাবা বলল।

'আমাদের আকাশ-দীপ তেমনি আছে তো?' মেয়ের প্রশ্ন। ওদের বাড়ির চালে ফুটো ছিল। ওগুলো দিয়ে ওরা সূর্য চন্দ্র দেখত। তাই ওই ফুটোগুলোর নাম রেখেছিল আকাশ-দীপ।

'হ্যাঁ মা তেমনি আছে। এখন বদলানো হয়নি।' ওর বাবা বলল।

'মা, বোন আর ভাইদের হাতে মণিমুক্তোগুলো তেমনি আছে তো? '

'সেগুলো তেমনি আছে মা।' বলল ওর বাবা। মা, বোন, ভাইদের হাতে হাজা ফেঁড়া হয়েছিল। সেগুলো সেরেছে কি না জানতে চাইল।

প্রশ্ন করে যা জানতে পারল তাতে বিশালাক্ষীর মনে দুঃখ হল। বাপের বাড়ির কোনো উন্নতি হয়নি। এতক্ষণ আড়ি পেতে শুনে শ্বশুর-শাশুড়ির ধারণা হল তাদের বেয়াই গরিব তো নয়-ই, বরং বেশ ধনী।

তৎক্ষণাৎ শাশুড়ি বাইরে এসে বউমাকে বলল, 'তোমার বাবা এসেছে কতক্ষণ হয়ে গেল, এখন তাকে খালি প্রশ্ন করে চলেছ! হাত-মুখ ধোয়ার জলও এগিয়ে দাওনি। অ্যাঁ?'

বিশালাক্ষী বুঝল তার বাবাকে ওইভাবে প্রশ্ন করায় কাজ হয়েছে। তারপর তার বাবাকে শ্বশুর-শাশুড়ি শুধু যে সসম্মানে আদর আপ্যায়ন করল তাই নয় রীতি অনুযায়ী নতুন ধুতি দিয়ে বিদায় দিল। জামাই শংকরও গোপনে তার শশুরের হাতে টাকা গুজে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় দিল।

১৭. অপূর্ব কঙ্কন

অনেকদিন আগের কথা। কাশীতে রুইদাস নামে এক মুচি ছিল। কবীরের গুরু রামানন্দই ওই অচ্ছুত রুইদাসেরও গুরু ছিলেন। প্রাচীন কালের নামকরা হিন্দি কবিদের মধ্যে রুইদাসও একজন।

রুইদাস জাতের পেশা অনুসারে জুতো সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন সকালে সে জুতো সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিল। কিন্তু কোনো খদ্দের এল না সেদিন।

সন্ধ্যা নাগাদ এক ব্রাহ্মণ নিজের ছেড়া জুতো রুইদাসের কাছে সারাতে রাখল। রুইদাস তাকে বলল, 'বাবু আপনি কোন গ্রামের লোক?'

ব্রাহ্মণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি কাবেরী নদীর তীরের অধিবাসী। গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হতে এসেছি।'

এই কথা শুনে রুইদাস বলল, 'বাবু, আপনার কাবেরী নদীতে কি জল নেই? আপনি শুধু স্নান করার জন্য এত দূর থেকে এত কষ্ট করে হেঁটে এসেছেন?'

ওর কথা শুনে ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বলল, তুমি কী বলছ! গঙ্গার তীরে কাশীতে বাস করে তুমি এই ধরনের কথা বলছ? মনে হচ্ছে তুমি মা গঙ্গার মহিমার কোনো খবর রাখো না। গঙ্গায় কোনোদিন চান করেছ কি না শুনি?'

'বাবু, আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন গঙ্গায় চান করিনি।' রুইদাস বলল।

রুইদাসের কথা শুনে তার উপর ব্রাহ্মণের করুণা জাগল। সে গঙ্গার মহিমার কাহিনি শুনিয়ে অবশেষে বলল, 'তুমি যে গঙ্গায় স্নান করনি এ তোমার দুর্ভাগ্য। সত্যি কথা বলতে কী, তোমার জীবন বৃথা।'

এ-কথায় রুইদাস বলল, 'মন যদি পবিত্র হয়, ঘটির জলে গঙ্গা পায়।'

এইসব কথা বলতে বলতে রুইদাস জুতো সেলাইয়ের কাজ শেষ করে বলল, 'বাবু, আপনি আমার একটা ছোট্ট উপকার করবেন?'

ব্রাহ্মণ জবাবে বললেন, 'আমার দ্বারা সম্ভব হলে কেন করব না।'

‘আমার জীবনের চার ভাগের তিন ভাগ এখানেই কেটে গেছে। গঙ্গা-দর্শন আমার কপালে আছে কি না, আমি জানি না। তাই আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখতে বলছি। আপনি গঙ্গায় স্নান করার সময় আমার নামে এই সুপারি গঙ্গায় অর্পণ করে দিন।' রুইদাস থলি থেকে একটা সুপারি বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিল।

ব্রাহ্মণ সুপারি নিয়ে গঙ্গায় চলে গেল। তারপর গঙ্গায় চান করার সময় গঙ্গার জল প্রবাহে ওই সুপারি অর্পণ করতে করতে ব্রাহ্মণ বলল : 'হে মা গঙ্গা, রুইদাস তোমাকে এই ভেট দিয়েছে। গ্রহণ কর।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সুন্দর হাত জল থেকে জেগে উঠল। সেই হাতে নবরত্ন খচিত একটি কঙ্কণ জ্বল জ্বল করে উঠল। 'এই কঙ্কণ রুইদাসকে ভেট দাও।' কোত্থেকে যেন শব্দ ভেসে এল।

ব্রাহ্মণ একেবারে থ বনে গেল। সে ওই কঙ্কণ হাতে নিয়ে তীরে উঠে এল। অনেকক্ষণ ভেবে সে মনে মনে নিজেকে যেন বলল, জুতো সেলাইকারী রুইদাস কেমন করে জানবে যে তার সুপারির পরিবর্তে সে মা গঙ্গার কাছ থেকে নববত্ন খচিত কঙ্কণ ভেট পেয়েছে! অতএব, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে এই কঙ্কণ ফেরত দেওয়া নিরেট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এটাকে বিক্রি করতে গেলে দোকানদার হয়তো আমাকে সন্দেহ করবে। ঝামেলা হতে পারে। তার চেয়ে এটাকে সোজা নিয়ে গিয়ে রাজাকে ভেট দিলে কাজের কাজ হবে। মা গঙ্গার কৃপায় হয়তো এইভাবে আমার দারিদ্র্য দূর হতে পারে।

কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে ব্রাহ্মণ সোজা কাশীর রাজার দরবারে গিয়ে, রাজাকে আশীর্বাদ করে ওই কঙ্কণ ভেট দিল।

সেই নবরত্ন খচিত কঙ্কণ দেখে রাজদরবারের প্রত্যেকে আশ্চর্যান্বিত হল। রাজদরবারের জহুরিরা পরীক্ষা করে বলল, 'এ তো দেবলোকের কঙ্কণ, মানবলোকের কঙ্কণ তো এটা নয়!' তার ফলে রাজা দারুণ খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ যা চাইবে তাই দান করবে ঠিক করে নিয়ে ওই কঙ্কণ অন্তঃপুরে রানির কাছে পাঠিয়ে দিল।

ওই কঙ্কণ পেয়ে রানির আনন্দের আর সীমা ছিল না। রানি তৎক্ষণাৎ সেই কঙ্কণ বাঁ-হাতে পরে নিয়ে সোজা রাজদরবারে গিয়ে রানি ব্রাহ্মণকে বলল, 'প্রিয়বর, এই একটা কঙ্কণে ভাল দেখাচ্ছে না। এর অন্য জোড়া চাই। এনে দিতেই হবে।'

রানির কথা শুনে ব্রাহ্মণের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে! কিছুক্ষণ ভেবে সে রাজার কাছে নিবেদন করে জানাল যে ওই কঙ্কণের মতো আর একটা কঙ্কণ জোগাড় করা তার পক্ষে অসম্ভব। রাজা ব্রাহ্মণের কথা কানে না তুলে বলল, 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই কঙ্কণের জোড়া যদি না আন তাহলে আমি ধরে নেব যে তুমি এই কঙ্কণটি চুরি করে এনেছ।'

ব্রাহ্মণ যেন মাটিতে বসে পড়ল। আসলে যে যা করল তা বলতে গেলে তো চুরি। চুরির শাস্তি মৃত্যু। অতঃপর ব্রাহ্মণ রাজাকে সন্ধ্যের মধ্যে ফেরার আশ্বাস দিয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে চলে গেল। ব্রাহ্মণ যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তারজন্য রাজা তাকে অনুসরণ করতে কয়েক জন অনুচর পাঠাল।

তারপর ব্রাহ্মণ সোজা রুইদাসের কাছে গেল। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে বাঁচানোর প্রার্থনা করল।

রুইদাস চোখ বুজে গঙ্গার ধ্যান করে ব্রাহ্মণকে বাঁচানোর প্রার্থনা করল। তারপর চামড়া ভেজানোর পাত্রে হাত ডুবিয়ে আর একটা কঙ্কণ বের করল। সেখানে সমবেত সবাই এ-দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ রুইদাসের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কঙ্কণ নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে সেই কঙ্কণ তাকে সমর্পণ করল।

রুইদাস যেভাবে কঙ্কণ বের করে দিল তা শুনে কাশীরাজ অবাক হল। সুখে রাখার সমস্ত ভার নিতে চেয়ে কাশীরাজ রুইদাসকে জুতো সেলাইয়ের কাজ ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু রুইদাস রাজি হল না।

১৮. পাঁচটি রুটির গল্প

দুজন যাত্রী। একজনের নাম সোমনাথ। অন্যের নাম কাশীনাথ। অনেক দূরের যাত্রী ওরা। পথে সোমনাথ উঠল এক ঠানদির বাড়ি। কাশীনাথও উঠল ওই ঠানদির বাড়ি। ওই ঠানদি ছিল যাত্রীদের উপকারী ঠানদি। এক ডাকে সবাই চিনত ঠানদিকে। রাত্রে ঠানদির বাড়ি ঘুমিয়ে সকালে উঠে সোমনাথ আর কাশীনাথ যাত্রা শুরু করল।

ওদের যাওয়ার আগে দুজনের পোঁটলায় ঠানদি মোটা মোটা রুটি বানিয়ে পুরে দিল। সোমনাথের মন উদার। কাশীনাথ খুব হিসেবি ও কৃপণ। তাই ঠানদি সোমনাথের পোঁটলায় তিনটে রুটি এবং কাশীনাথের পোঁটলায় দুটো রুটি পুরে দেয়।

ওরা দুজন একই পথের যাত্রী। পাশাপাশি ওরা হাঁটছে। মাথার উপর সূর্য। ওদের খিদে পেয়ে গেছে। ওরা দুজনে পুকুরঘাটে গেল।

দু-জনে মুখ-হাত-পা ধুয়ে রুটি খেতে গাছের ছায়ায় বসল। পুঁটলি খুলে দেখে সোমনাথের পুঁটলিতে তিনটে আর কাশীনাথের পুঁটলিতে দুটো রুটি আছে।

'দেখলেন, ঠানদি নাকি যাত্রীদের বন্ধু। কতখানি পক্ষপাতিত্ব। আপনাকে তিনটে রুটি দিয়ে আমাকে দিল মাত্র দুটো।' বললে কাশীনাথ।

সোমনাথ বলল, "যা মোটা মোটা বড়ো বড়ো রুটি, দুটোই খেতে পারব না। ঠিক আছে খান না। কম পড়লে পাঁচটা রুটি দু-জনে সমান ভাগ করে খাব।'

এই কথায় কাশীনাথ খুশি হল। দু-জনে রুটি খেতে যাবে এমন সময় ওই গাছের ছায়ায় আর একজন যাত্রী এল। নাম তার রামনাথ। রামনাথ দেখল ওদের দুজনের কাছে খাবার রয়েছে।

'মশাইরা, আমিও আপনাদের মতো যাত্রী। খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু আমার কাছে খাবার নেই। তাই আপনাদের খাবার থেকে কিছুটা আমাকে দিলে ঋণী থাকব।' রামনাথ বলল।

'আমাদের কাছে যে রুটিগুলো আছে তাতে তিন জনের হয়ে যাবে।'

সোমনাথ বলল। সোমনাথের ওই কথার পিঠে কাশীনাথ আর অন্য কথা বলেনি।

রামনাথ ঝটপট খেতে বসে গেল। তিন জনে পাঁচটি রুটি খেল। পুকুরের জল খেল। ওদের পেট ভরে গেল।

রামনাথ ওদের দু-জনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হঠাৎ সোমনাথের হাতে কিছু পয়সা দিতে গেল। সোমনাথ নিজে রাজি হল না। রামনাথ ওর কথা কানে না তুলে পাঁচ আনা সোমনাথের হাতে গুজে নিজের পথে চলে গেল।

সোমনাথ ওই পাঁচ আনার মধ্যে দু-আনা তুলে কাশীনাথের হাতে দিতে দিতে বলল, 'আপনার ভাগ আপনি নিন। আমার তিনটে রুটি আর আপনার তো দুটো রুটি, তাই পাঁচ আনার মধ্যে আপনাকে দু-আনা দিচ্ছি।'

'এ ভারি অন্যায়। রামনাথ আমাদের দুজনের খাবার খেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে পয়সা দিয়েছে। এতে আমাদের দুজনেরই সমান ভাগ আছে। আমি আরও আধ আনা পাব। দয়া করে

দিন।' বলল কৃপণ কাশীনাথ।

সোমনাথের কাছে আধ আনা বড়ো কথা নয়। দিতে পারত। কিন্তু কাশীনাথের হিসেব করার ঢঙ-এ তার গা জ্বালা করল।

'ঠিক আছে চলুন। কাছেই গ্রাম আছে। সেখানে বিচারকের কাছে যাব। উনি যে রায় দেবেন সেটাই মেনে নেব।

বিচারপতি ওদের দু-জনের কথা শুনে বলল, 'আমার বিচারে রামনাথ যে পাঁচ আনা দিয়েছে তার মধ্যে চার আনা পাবে সোমনাথ। আর কাশীনাথ পাবে এক আনা। এখন সোমনাথকে এক আনা ফেরত দাও।

বিচারের কথা শুনে কাশীনাথ থ বনে গেল। কোথায় ভেবেছিল আধ আনা পাবে এখন দেখছে উলটে এক আনা সোমনাথকে ফেরত দিতে হবে!

'মশাই, এ-কী বিচার করলেন? আমাদের যার যতগুলো রুটি ছিল সে আমার মতে তত আনা পাবে। আর আপনি বলছেন এক আনা মাত্র পাব!'

কাশীনাথ বিচারককে বলল। বিচারক বলল, 'ঠিকই বলেছি। আমার বিচারের আগে ওই পাঁচটি রুটি আপনারা কীভাবে ভাগ করেছেন, ভেবেছি। '

'আজ্ঞে এক একটা রুটিকে তিনটে করে ভাগ করেছি। পাঁচটা রুটিতে পনেরোটি ভাগ হয়েছে। তার থেকে এক-এক জন পাঁচটি করে টুকরো খেয়েছি।' বলল কাশীনাথ।

বিচারক বলল, 'বেশ, সত্যি কথা বল দেখি তুমি নিজের রুটি ক-টা টুকরো করেছ?'

'আজ্ঞে, আমার দুটো রুটিতে ছটা টুকরো হয়েছে।' কাশীনাথ বলল।

'তার মধ্যে পাঁচটি টুকরো তুমি নিজে খেয়ছ। রামনাথকে দিয়ছ মাত্র একভাগ। আর সোমনাথের ছিল তিনটে রুটি। তিনটেতে ন-টা ভাগ হয়েছে। তার থেকে চারভাগ সে রামনাথকে খেতে দিয়েছে। নিজে খেয়েছে পাঁচটি। রামনাথ যে পাঁচটি টুকরো খেল তারমধ্যে চারটে টুকরো সোমনাথের। অতএব রামনাথের দেওয়া পাঁচ আনার মধ্যে চার আনা পাবে সোমনাথ আর তুমি পাবে এক আনা।' কি ন্যায় বিচার করিনি?' বিচারক বলল।

কাশীনাথ অগত্যা সোমনাথকে এক আনা ফেরত দিতে গেল। সোমনাথ তা না নিয়ে বলল, 'কথায় কথায় বিচারকের কাছে ছুটে গেলে এই হয়। সব জায়গায় নিজের হিসাব চলে না।'

১৯. ধানিলঙ্কা

চার-পাঁচ-শো বছর আগেকার কথা। রাজস্থানে বানাজি নামে এক বালক ছিল। বাচ্চা বয়সেই তার বাবা মারা যাওয়ায় বানাজি কাকা এবং জ্যাঠাদের বাড়িতেই মানুষ হতে লাগল।

রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে যা যা শেখানো হয় তার প্রত্যেকটাই সে শিখল অল্পবয়েসেই। ঘোড়ায় চড়া, তির ছোঁড়া, তরবারি চালানো সব সে শিখল।

এক দেমাকি ঘোড়াকে কেউ বাগে আনতে পারছিল না। বানাজি সেই ঘোড়াকে বাগে এনে তার উপর চড়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাকা আর জ্যাঠাদের সাথে সেও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। সেই ঘোড়াটাও বানাজি বাদে অন্য কাউকে তার পিঠে চড়তে দিত না।

একবার এক ব্যবসায়ী কাগুলা থেকে কয়েকটা তরবারি বিক্রির জন্য আনল। বানাজি সেই তরবারিগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখল। কোনটা লম্বা কম, আবার কোনটা তেমন ধারালো নয়।

ছেলেটা তরবারি ঠিক চিনেতে পারে ভেবে ওই ব্যবসায়ী ভালো তরবারি একটা বের করে তার হাতে দিল।

সেই তরবারি পরীক্ষা করেই বানাজি বলল, 'আমি ঠিক এইরকমটি চাই। এইরকম তরবারি আমার হাতে থাকলে আমাকে কেউ হারাতে পারবে না।'

বানাজি তার কাকা-জ্যাঠাকে ওই তরবারি কিনতে বলল।

'আমরা বেঁচে থাকতে তরবারি দিয়ে তুমি কী করবে?' বানাজির জ্যাঠা বলল।

'এই তরবারি অনেক বড়ো। তুমি তো এটা ভালো করে নাড়তেই পারবে না।' বলল বানাজির কাকা।

'বারে আমি বড়ো হচ্ছি না? আমার তরবারিটা খুব ছোটো।' বলল বানাজি

'ওরে পাগলা ছেলে, তরবারি বড়ো হলেই হয় না, সেই তরবারি ধরার মতো শক্তি আর সাহসও চাই। তরবারি ছোটো থাকলে একটু এগিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়। বলল বানাজির জ্যাঠা।
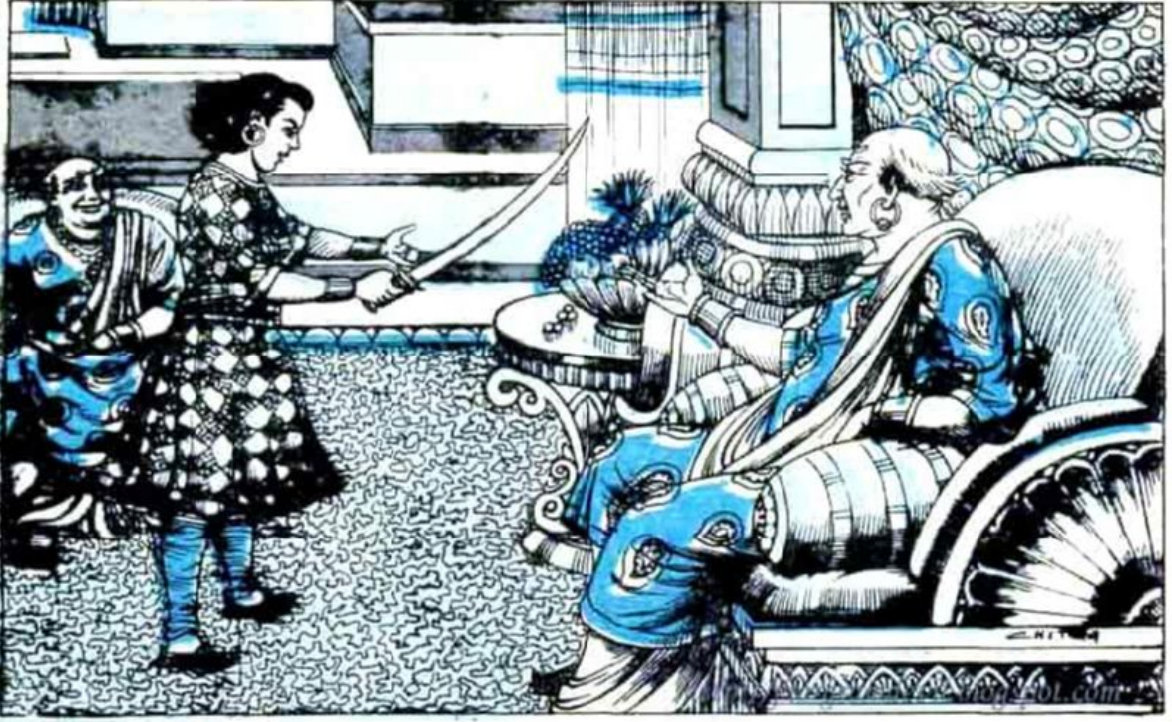
বানাজি নিরাশ হয়ে ওই তরবারি ব্যবসায়ীকে ফেরত দিল।

কিছুদিন পরে এক লুণ্ঠনকারীর দল বানাজির গ্রামে ঢুকে সমস্ত গোরু নিয়ে পালাতে লাগল। কেউ লুণ্ঠন করতে গ্রামে ঢুকলে গ্রামের লোকের ঢাক-ঢোল পেটানো রেওয়াজ। কাকা-জ্যাঠাদের বাড়িতে বসে বানাজি সেই ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শুনল। সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে লুণ্ঠনকারীর দল গ্রামে ঢুকে গরু নিয়ে পালাচ্ছে।

বানাজি মনে মনে বলল, এত বড়ো একটা কাণ্ড গ্রামে ঘটে যাবে আর আমি ঘরে বসে থাকব! এত বড়ো অপমান।

বানাজি তৎক্ষণাৎ ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে খাপখোলা তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লুণ্ঠনকারীদের ধাওয়া করল।

খুঁজে খুঁজে অবশেষে অরণ্যের এক প্রান্তে বানাজি ওই লুণ্ঠনকারীদের দেখল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা বানাজিকে বলল, 'ওরে ছোকরা, তোর তো গোঁফ-দাড়ি ওঠেনি, তুই পারবি কী করে এতগুলো গোরু ফেরত নিয়ে যেতে?'

বানাজি বুঝল কথা চিড়ে ভিজবে না। তাই সে নিজের ঘোড়াটাকে লুণ্ঠনকারী নেতার কাছে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ তার মাথার উপর তরবারি চালিয়ে দিল। লুণ্ঠনকারীদের নেতা তৎক্ষণাৎ মাথা সরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও তার নাক, মুখ কেটে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল, "ওই কুকুরের বাচ্চাটাকে মেরে ফেল! ধর! ওকে টুকরো টুকরো করে ফেল।' নেতা আর্তনাদ করে উঠল।

সেই হুড়োহুড়ি আর চিৎকারের মধ্যে গোরুগুলো সব গ্রামের দিকে টেনে ছুটতে লাগল। বানাজিও বুঝল লুণ্ঠনকারীদের সবাইকে সে জব্দ করতে পারবে না। তাই সে আর দেরি না করে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

লুণ্ঠনকারীরা বানাজিকে ধরার জন্য পিছু পিছু ছুটলো বটে কিন্তু বানাজির ঘোড়ার তীব্র গতির ফলে তারা কেউ তার নাগাল পেল না।

গোরু হারিয়ে যারা কাঁদতে বসে ছিল তারা নিজেদের গোরু ছুটতে ছুটতে ফেরত আসছে দেখে অবাক হয়ে গেল। বানাজিকে দেখে তাদের বুক আনন্দে ভরে উঠল।

কেউ বুঝতে পারল না অত কমবয়সি বানাজি কেমন করে লুণ্ঠকারীদের কবল থেকে গোরুগুলোকে ছাড়িয়ে আনল।

সব ঘটনা জানতে পেরে বানাজির কাকা-জ্যাঠারা বলল, 'এখন থেকে তোমার এসব ব্যাপারে ছোটাছুটি করা কেন রে বাবা! আরও বড়ো হও। তারপর তোমার বীরত্ব আরও ভালো করে দেখাতে পারবে। অনেক সুযোগ পাবে।'

'ছোটো হলেই বা, কী হয়েছে? আমি তো ধানিলঙ্কা। ধানিলঙ্কা ছোটোতেই ঝাল হয়।' ওর কথা শুনে আনন্দে ও গর্বে সবাই হেসে উঠল।

২০. সন্দেহ বাতিক

এক শহরে সত্য সাহা নামে এক ব্যাবসাদার ছিল। অন্যান্য ব্যাবসার সাথে সে সুদের ব্যাবসাও করত। তার অধীনে বড়ো কেরানির কাজ করত চিত্তবাবু। ছোটো কেরানির কাজ করত নিত্যবাবু। ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একজন চাকরও ছিল। এরা তিন জনই বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সত্য সাহা ওই তিন জনের প্রত্যেককে সন্দেহ করত, কারণ সে ছিল সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক।

সত্য সাহা ওই তিন জনের প্রতি এমন কোনো ব্যবহার করত না যাতে তারা তার মতলব ধরতে পারে। ওদের তিন জনের প্রত্যেকে ভাবত তাকেই সত্যবাবু বিশ্বাস করে।

একবার সত্যবাবুকে ব্যাবসা উপলক্ষে অনেক দূরের শহরে যেতে হল। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে সে স্ত্রীকে বলল, তুমি চাকরের উপর নজর রেখ। লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

সত্যবাবুর বউ বলল, 'ঠিক আছে, নজর রাখব।'

তারপর সত্যবাবু চাকরকে আলাদাভাবে ডেকে গোপনে বলল, 'শোনো, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বুঝলে?'

'আজ্ঞে, বলুন কী কাজ করতে হবে। আপনি যা বলবেন তাই করব।' চাকর বলল।

'না, তেমন কোনো কাজ নয়। আমাদের ছোটো কেরানি নিত্যকে জানো তো, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না, ওর হাবভাব চালচলন ভালো নয়। আমি যতদিন না ফিরি তুমি ওর উপর নজর রেখ। তবে দেখো, তুমি যে ওর উপর নজর রেখেছ তা যেন সে টের না পায়। ব্যাবসাদার বুঝিয়ে বলল।

'ঠিক আছে বাবু। আপনি যা বলেছেন তাই করব। চাকর বলল।'

তারপর ব্যাবসাদার সত্যবাবু ছোটো কেরানি নিত্যবাবুকে ডেকে গোপনে বলল, 'নিত্য, তোমার উপর ভরসা রেখে আমি দূরের শহরে যাচ্ছি। আমাদের বড়ো কেরানি চিত্তর উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। তার উপর একটু নজর রেখো।'

মালিক তাকেও এত বিশ্বাস করে ভেবে নিত্যবাবু খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'বাবু, আপনি একটুও ভাববেন না। আমি তার উপর হাজার চোখে নজর রাখব। ও কোনোক্রমেই আপনাকে ধোঁকা দিতে পারবে না।'

অবশেষে, ব্যাবসাদার বড়ো কেরানি চিত্তবাবুর কাছে গিয়ে তাকে গোপনে বলল, 'চিত্ত, আমি দূরের শহরে ব্যাবসার কাজে যাচ্ছি। তোমাকে বিশেষভাবে আর কী বলব। এ-দিকের ব্যাবসাপত্তর খুব সাবধানে দেখাশোনা করো। কোনো কিছুই সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করো না।'

এইভাবে ব্যবসায়ী সত্যবাবু সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দূরের শহরে চলে গেল।

সবাই নিজের কাজ খুব সাবধানে করে যাচ্ছিল। দু-চার দিনের মধ্যেই বড়ো কেরানি চিত্তবাবু বুঝল যে নিত্যবাবু তার উপর নজর রেখেছে। আবার নিত্যবাবুও বুঝল যে তার উপর চাকর নজর রেখেছে। চাকরের মনে হল মালিকের স্ত্রী তার উপর বিশেষ নজর রেখেছে।

কিন্তু কেউ একথা ভাবতে পারল না যে এসব ব্যাবসাদারের কারসাজি অনুসারেই হচ্ছে।

একদিন বড়ো কেরানি চিত্তবাবু কাউকে কোনো কথা না বলে ছোটো কেরানি নিত্যবাবুর নাকের ডগা দিয়ে বড়ো বড়ো থালায় করে চাল, ডাল এবং এক ঘটি ঘি নিয়ে গেল। তা লক্ষ করে নিত্যবাবু আঁতকে উঠল। মালিককে এই খবর দেওয়ার জন্য সে একটা কাগজে ওই জিনিসের নাম সযত্নে লিখে রাখল। মালিককে তা দেখিয়ে চাকরিতে উন্নতি করবে এই তার আশা।

অন্য একদিন চাকরের চোখের সামনে ছোটো কেরানি নিত্যবাবু, টাকার থলি নিজের পকেটে পুরে নিল। চোর ধরার আনন্দে মনে মনে নেচে উঠল চাকরটা। সে ওই চুরির দিনক্ষণ সব মনে রাখল।

পরের দিন ওই ব্যাবসাদারের বাড়িতে এক তরিতরকারি ফেরিওয়ালি এল। চাকর হাতের কাজ ফেলে রেখে ওই ফেরিওয়ালির সাথে হেসে হেসে কথা বলতে লাগল।

এসব দেখে মালিকের বউ রেগে গিয়ে চাকরকে এক ধমক দিয়ে বলল, ‘তোর এত বড়ো স্পর্ধা, আঁ! তুই আমার সামনে এই ফেরিওয়ালির সাথে হেসে হেসে কথা বলছিস।

তোর সাহস তো কম নয়! বাবু আসুক, মজা দেখাচ্ছি!

'আসুক না বাবু, আমি ভয় পাই নাকি!' চাকর বলল। ব্যাবসাদার সত্যবাবুর ফেরার পর তার বউ তার কাছে চাকরের বিরুদ্ধে গোপনে নালিশ করল। চাকর ছোটো কেরানির বিরুদ্ধে এবং ছোটো কেরানি বড়ো কেরানির বিরুদ্ধে গোপনে নালিশ করল।

সবার নালিশ শোনার পর ব্যবসায়ী ওদের সবাইকে ডেকে বলল, 'দেখ, আমার না থাকার সময় তোমরা তিন জনে ন্যায় এবং ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির ক্ষতি করেছ। তোমাদের মতো নিমকহারামদের আমার বাড়িতে স্থান দেওয়া আমার মূর্খতা।'

বড়ো কেরানি চিত্তবাবু বলল, 'আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলুন।'

'বলব আবার কী, তোমরা যে ধোঁকাবাজি করেছ, আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। প্রমাণ দিলে তোমরা নিজের নিজের অপরাধ কি স্বীকার করবে?'

তারপর মালিক বড়ো কেরানিকে বলল, 'থালায় করে চাল-ডাল আর ঘটিতে করে ঘি নিয়ে যাওনি?'

এ-কথার জবাবে চিত্তবাবু বলল, 'সত্যবাবু সেদিন ছিল শ্রাবণ মাসের শুক্রবার। সেদিনই লক্ষ্মীব্রতও ছিল। ওই দিন চাল-ডাল-ঘি দেওয়া হয়ে থাকে। আমি তাই নিয়ে গিয়ে দিয়েছি।'

ব্যাবসাদার আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, 'ওহো ঠিক, ঠিক। কিন্তু আমি বলছি, এই নিত্যর কথা। অত টাকা থলিতে পুরে বেরিয়ে গেল।'

নিত্যবাবু বলল, 'আজ্ঞে হ্যা, টাকার থলি পকেটে পুরেছি। কিন্তু সে টাকা আমার মাইনের। কত টাকা নিয়েছি তা খাতায় লিখেছি। দেখে নেবেন।'

ব্যাবসাদার কেমন যেন আমতা আমতা করে বলল, তা ঠিক, তোমার মাইনের দিন এর মধ্যে পড়েছিল বটে। কিন্তু আমাকে যে নালিশ করেছে তার তো জানা উচিত কীসের টাকা নিয়ে গেলে! যাক কিছু মনে করো না!'

'তারপর ব্যাবসাদার চাকরের দিকে ঘুরে বলল, হ্যারে, তুই যে কাজ ফেলে ফেরিওয়ালির সাথে হেসে হেসে কথা বললি তার কারণ কী?'

'বলেন কী বাবু, ওই ফেরিওয়ালি তো আমার বউ। মা হয়তো এ-কথা জানেন না, তাই আপনার কাছে তিলকে তাল করে নালিশ করেছেন।'

এর ফলে ওরা তিন জনে পরিষ্কার বুঝল যে ওদের মালিকই ওদের মনে পরস্পরকে সন্দেহ করার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর ওরা তিন জন একসাথে মালিককে বলল, 'বাবু, আপনার মতো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোকের অধীনে কাজ করলে আমরা সত্যি সত্যি একদিন নিমকহারাম হয়ে যাব। তাই আমরা আর আপনার কাছে চাকরি করতে চাই না।

আমাদের পাওনাগণ্ডা দয়া করে চুকিয়ে দিন।' এই কথা বলে ওরা তিন জনে একসাথে বেরিয়ে গেল।

২১. এক দিনের রাজা

বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের আমলে বাগদাদের কথা। সেই কালে বাগদাদে এক অদ্ভুত ধরনের অবিবাহিত যুবক ছিল। নাম তার আবুল হোসেন। সে প্রত্যেক দিন নগরের নদীর সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। কোনো নতুন লোককে শহরে ঢুকতে দেখলেই তাকে তার অতিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করত। অতিথি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আবুল হোসেন, ছেলে বুড়ো, ধনী-গরিব বাছাই করত না, নিজের শহরের অথবা অন্য কোনো শহরের লোক হোক, তা নিয়েও সে মাথা ঘামাত না । একটি রাত কাটানোর পরই, পরের দিন সকালেই সে ওই অতিথিকে বিদায় করে দিত। সেই অতিথি অন্য কোনো দিন ওই সাঁকো দিয়ে শহরে ঢোকার সময় তার দিকে আবুল হোসেন এমনভাবে তাকাত যেন সে তাকে চিনতেই পারছে না। প্রতিবেশীদের কাছে আবুল হোসেনের এই ব্যবহার বড়ো বিচিত্র এবং অদ্ভুত ঠেকল।

একদিন সূর্যাস্তের সময় আবুল হোসেন সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে নতুন অতিথির অপেক্ষা করছে, এমন সময় মোসল শহরের এক ব্যাবসাদার শহরে ঢুকতে গেলেন সাঁকো থেকে নেমে। তার সাথে ছিল এক লম্বা-চওড়া গোলাম।

সেই ব্যাবসাদার ছিলেন স্বয়ং হারুন-অল-রশীদ। ছদ্মবেশে বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বাস্তব অবস্থা নিজের চোখে তিনি দেখে ফিরতেন। কিন্তু সে কথা আবুল হোসেন জানে না। সে যথারীতি সেই ব্যাবসাদারের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে সেলাম করে তাকে সেই রাতের জন্য তার ঘরে অতিথি হতে অনুরোধ করল। 'আজ রাত্রে দয়া করে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। কাল সকালেই আপনি বিদায় নিতে পারবেন।'

আবুল হোসেনের ব্যবহার বাদশাহের কাছে বিচিত্র লাগল। বাদশাহ ভাবল, এই ধরনের লোকের কাছ থেকে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। এই সব সাতপাঁচ ভেবে বাদশাহ আবুল হোসেনের আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজি হয়ে তার বাড়ি গেলেন।

হোসেনের মা নানান ধরনের রুচিকর সুস্বাদু খাবার বেঁধে খাওয়াল বাদশাহকে। দু-জনে খাওয়ার পর গল্পগুজব করতে বসলেন। পান পাত্র হাতে তুলে নিলেন দু-জনে। আবুল হোসেন অতিথিকে বলল, 'আপনি আমাদের বাড়িতে আসায় আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।'

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা ভাই, এইভাবে অচেনা অজানা লোককে অতিথি হতে বল কেন?'

আবুল জবাবে বলল, 'আমার নাম আবুল হোসেন। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বাবা আমার জন্য অনেক বিষয়সম্পত্তি জমিজায়গা রেখে গেছেন। বাবা আমাকে বাচ্চা বয়স থেকে সবসময় অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাবার মারা যাওয়ার পর আমার মনে সুখ ভোগের ইচ্ছা জাগল। তখন আমি একেবারে বোকার মতো খরচ না করে, সমস্ত টাকা পয়সাকে দু-ভাগে ভাগ করে দিলাম। অর্ধেক অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি করে ফেললাম। আর বাকি অর্ধেক অর্থ আমি একেবারে কোটিপতির মতো বন্ধুবান্ধব নিয়ে মনের আনন্দে খেয়ালখুশি মতো খরচ করতে লাগলাম। সবসময় বন্ধুরা আমাকে ঘিরে থাকত। যে যা বলেছে, করেছি। সে কী আনন্দ! কিন্তু এক বছর পূর্ণ হতেই আমার হাতে কানাকড়িও রইল না। তখন আর কী করি, আমার সেই বন্ধুদের কাছে হাত পাতলাম। কিন্তু কী বলব কেউ এক পয়সা দিল না। আমার অবস্থা জনে জনে ধরে ধরে বললাম কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। এ-কথা ও-কথা বলে প্রত্যেকে এড়িয়ে গেল। এমনকী আমাকে কেউ একদিন ডেকে খাওয়াল না! ভীষণ দুঃখ হল। বাড়িতে বসে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনোদিন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঘুরব না এবং একমাত্র অপরিচিত লোককেই অতিথি হিসেবে বরণ করব। আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি বহু দিনের বন্ধুত্বের চেয়ে অল্প সময়ের প্রীতির সম্পর্ক অনেক বেশি মধুর। আর একটি প্রতিজ্ঞা করলাম, অপরিচিত অতিথিকেও একদিনের বেশি রাখব না। কাল সকালে আপনাকে বিদায় দিলে, আশা করি, কিছু মনে করবেন না। কারণ আমাদের মধুর সম্পর্ক আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে।'

আবুল হোসেনের কথা শুনে বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ বললেন, 'তোমার ব্যবহার আমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকলেও এখন তুমি যা করছ সত্যি ভালো। ভাগ্যিস অর্ধেক অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি করে রেখেছিলে। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। তুমি আমাকে এত গভীর আন্তরিকতার সাথে আতিথ্যে বরণ করলে, ভাবছি কেমন করে এই ঋণ। শোধ করব। আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। তোমার কোনো ইচ্ছা যদি অপূর্ণ থাকে আমাকে বলতে পার। আমি সাধারণ ব্যাবসাদার হলেও তোমার যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখি।'

এ-কথা শুনে আবুল হোসেন কোনোরকম বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়েই আমি খুশি। আমার অপূর্ণ কোনো ইচ্ছা নেই।'

'তোমার না থাক আমার তো থাকতে পারে। আমাকে এভাবে এড়িয়ে গেলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব। আমার মনে হবে, আমি ঋণের বোঝা বইছি। উপকারীকে দ্বিগুণ প্রতি-উপকার করা মানুষের কর্তব্য।' বাদশাহ বললেন।

অতিথির দরদি মনের পরিচয় পেয়ে আবুল হোসেন একটু ভেবে বললেন, 'কোনো অপূর্ণ ইচ্ছাই যে আমার মনে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন।'

'কোন ইচ্ছা না জেনে পাগল বলি কী করে! আমি সাধারণ এক ব্যাবসাদার বটে, কিন্তু আমি তো বলেছি আমি যেকোনো ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা রাখি। তাই বলছি, কোনোরকম সংকোচ না করে তোমার ইচ্ছার কথা আমাকে বল।' বাদশাহ বললেন।
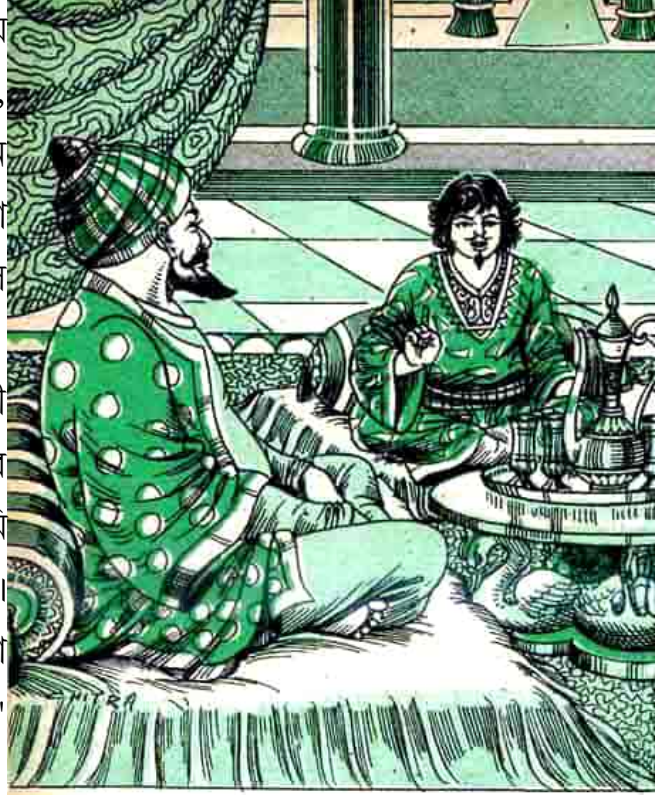
'আপনি জিজ্ঞেস করছেন, তাই বলছি। তবে আমার ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা একমাত্র বাদশাহেরই আছে। আমার একটি মাত্র ইচ্ছা, মাত্র একদিনের জন্য আমি যেন হারুন-অল-রশীদের রাজসিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে পারি।' আবুল হোসেন বলল। বাদশাহ মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, তুমি একদিনের জন্য রাজা হয়ে কী করতে চাও?'

'মশাই, এই বাগদাদ চার ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক ভাগে একজন করে অধিকারী আছে। আমাদের ভাগের অধিকারীটি অত্যন্ত খারাপ লোক। নীচ প্রকৃতির। আর এই জঘন্য লোকটির সাথে দুজন শাকরেদ রয়েছে। একজন ঘোড়ামুখো আর অন্য জন টেকো। বহু পাপ কাজ এরা করেছে। অনেক সৎ লোককে এরা পথে বসিয়েছে। কত লোকের সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। অন্যায়ভাবে, বিনা বিচারে বহু লোককে বধ করেছে। আমি একদিনের জন্য রাজা হতে পারলে, আমি নিজের জন্য একটি পয়সাও নেব না, আমার বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়স্বজনকে এক পয়সাও দেব না। শুধু ওই তিন জনকে চরম শাস্তি দেব।' আবুল হোসেন বললেন।

'সত্যি তোমার ইচ্ছা প্রশংসার যোগ্য। তোমার ইচ্ছা পূরণ হতেও পারে। কারণ, আমাদের বাদশাহ দারুণ কৌতুহলী মানুষ। বাদশাহকে জানালে উনি তোমাকে একদিনের রাজা করতেও পারেন।' বললেন বাদশাহ।

আবুল হোসেন এ-কথা শুনে একগাল হেসে বলল, 'এমনি সময় কাটানোর জন্য আবোল তাবোল বকছি। আমার ইচ্ছার কথা কোনোরকমে বাদশাহের কানে গেলে আমাকে

একেবারে পাগলা গারদে পুরে দেবে। তাই বলছি, বাদশাহের লোকজনের সাথে আপনার যদি চেনা-শোনা থাকে তো ভুলেও তাদের কাছে এসব কথা বলবেন না।'

'আমি শপথ করে বলছি, তোমার ইচ্ছার কথা আমি কাউকে বলব না।' বাদশাহ বললেন। বললেন বটে কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন আবুল হোসেনের ইচ্ছা পূরণ করবেন। বহু বার বাদশাহ নানান পোশাকে রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু এই ধরনের ইচ্ছার কথা তিনি কোনোদিন শোনেননি।

তারপর বাদশাহ আবুল হোসেনের হাত থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে বললেন, 'এবার গেলাসে আমি ঢালছি।' পানপাত্রে সরাব ঢালতে ঢালতে এক ফাকে, আবুল হোসেনের চোখের আড়ালে, বাদশাহ কী এক নেশার ওষুধ সরাবে মিশিয়ে দিলেন।

আবুল হোসেন অতিথির হাত থেকে সরাব ভরতি গেলাস হাতে তুলে বলল, 'আমি এখনই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, সকালে আপনার যাওয়ার সময় হয়তো আমার ঘুম ভাঙবে না। আপনি দয়া করে, যাওয়ার সময়, দরজা বন্ধ করে যেতে ভুলবেন না।'

বাদশাহ রাজি হওয়ার পর সরাবের পাত্র উজাড় করে আবুল হোসেন বিছানায় শুয়ে পড়ল। সেইভাবে তার শুয়ে পড়া দেখে বাদশাহের হাসি পেল।

তারপর বাদশাহ নিজের গোলামকে ডেকে বললেন, 'তুমি এই লোকটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আমার সাথে চল। এই বাড়িটা চিনে রাখ। প্রয়োজন হলে আবার তোমাকে এ-বাড়িতে পাঠাতে পারি।'

ওরা দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে বাদশাহ ভুলে গেলেন। গোপন পথে রাজপ্রাসাদের বাদশাহের শোয়ার ঘরে পৌছালেন। 'এই লোকটার সমস্ত পোশাক খুলে, রাত্রে আমি যে পোশাক পরে থাকি সেই পোশাক পরিয়ে একে আমার বিছানায় শুইয়ে দাও।' বাদশাহ আদেশ দিল। তারপর বাদশাহ রাজপ্রাসাদের কর্মচারী উজির, পাহারাদার এবং অন্তঃপুরের মহিলাদের ডেকে পাঠালেন।
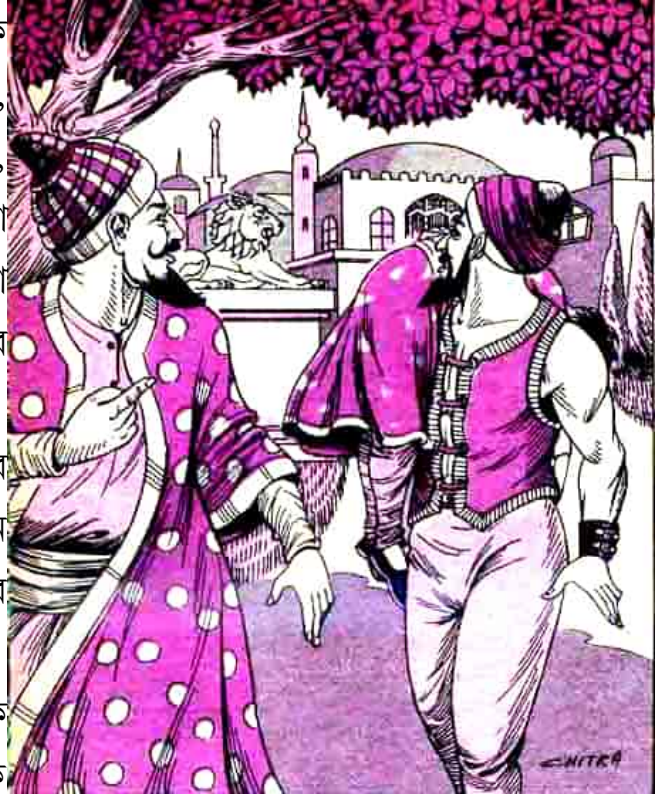
সবার আসার পর বাদশাহ বলল, 'কাল সকালে তোমরা সবাই এই ঘরে চলে আসবে। এই লোকটি যা বলবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তোমরা আমার সাথে যে ধরনের ব্যবহার করে থাক এই লোকটির সাথেও ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার করবে। এর কোনো ইচ্ছা, তা সে যত ছোটোই হোক না কেন, তোমরা পালন করবে! যে তা পালন করবে না, সে আমার ছেলে হলেও নিস্তার নেই। তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে।' তারপর, সবাই বাদশাহের কাছে অনুমতি নিয়ে একে একে চলে গেল। বাকি রইল উজির জফর এবং বেত্রহস্ত মন শুর।

বাদশাহ ওদের বললেন, 'তোমরা দু-জনে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে আসবে। এ যাই বলুক না কেন, কোনোরকম ইতস্তত কর না। এমনকী এ যদি বলে যে সে বাদশাহ নয় তবু তোমরা এমন অভিনয় করবে যেন তোমরা একমাত্র তাকেই বাদশাহ হিসেবে জানো, অন্য কাউকে নয়। এ যাকে যা দান করতে বলবে তাকে তাই দান করবে। খাজানা খালি হয়ে গেলেও সংকোচ করার কিছু নেই। এর আদেশ অনুসারেই শাস্তি, পুরস্কার, ফাসি, চাকরি প্রভৃতি দেবে। এর নির্দেশে চাকরিও খাবে। একটি কথা, এসব কিছু আমার ইচ্ছা পূরণের জন্যই যে তোমরা করছ তা যেন এ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তোমরা ঘুম থেকে উঠে আমাকেও ডেকে তুলে দিও।'

দুই

পরের দিন সকালে জফর এবং মনশুর গিয়ে বাদশাহকে জাগাল। তৎক্ষণাৎ তিনি আবুল হোসেনকে যে ঘরে শোয়ানো হয়েছিল সেই ঘরের পর্দার আড়ালে লুকালেন। সেখানে যা কিছু ঘটবে তা দেখার এবং যে কথা হবে তা শোনার সুবিধা ছিল সেই পর্দার আড়াল থেকে।

তারপর জফর এবং মনশুর সহ রাজমহলের প্রত্যেক প্রধান কর্মচারী, নারী এবং গোলাম ওই ঘরে ঢুকল। সবাই যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় এমনভাবে দাঁড়াল যেন ঘুম থেকে সত্যি সত্যি তাদের বাদশাহ উঠবেন।

আতর লাগানো এক রুমাল আবুল হোসেনের নাকের ডগায় ধরল এক গোলাম। সাথে সাথে আবুল হোসেন তিন বার হাঁচি ফেলল। তারপর, গোলাম আবুলের নাক, মুখ গোলাপ জলে ধুয়ে মুছে দিল। তখন, আবুলের ঘুম একটু একটু করে ভাঙতে লাগল এবং সে চোখ খুলে তাকাতে লাগল চারদিকে।

আবুল চোখ খুলে দেখল সে যে বিছানায় শুয়ে আছে তা অপূর্ব মনোরম। বিছানার উপরের লাল চাদরে জরির কাজ করা। মাঝে মাঝে মুক্তা লাগানো রয়েছে ওই চাদরে। মাথা তুলে দেখল বিরাট এক ঘরে সে আছে। ওই ঘরের মধ্যে চারদিকে দামি দামি

বেনারসি কাপড় ঝুলছে। ঘরের কোনো কোনো সোনা এবং স্ফটিক পাত্র রয়েছে। আবুল চারদিকে তাকিয়ে দেখল বহু নারী এবং গোলাম তার চারপাশে রয়েছে। ওরা প্রত্যেকে নত হয়ে তাকে সেলাম করছে। আবুলের পেছনে রয়েছে আমির ওমরা, মন্ত্রী, পাহারাদার এবং কালো রঙের হিজড়েও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক উঁচু গদিতে সংগীত বিশারদ গান গাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আবুলের বিছানার কাছেই বাদশাহের পোশাক ছিল। সেই রং-বেরঙের পোশাক দেখে আবুল ভাবল ওই পোশাক বাদশাহের।

আবুল আবার চোখ বুজল। তখন জফর তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তিন বার সেলাম ঠুকে সবিনয়ে বলল, 'হুজুর, ঘুমন্ত লোককে ঘুম থেকে তোলার অনুমতি দিন। নামাজ পড়ার সময় হয়েছে।'

আবুল চোখ কচলাল। নিজের হাতে নিজেই চিমটি কেটে বলল, 'বাপরে বাপ একি আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! আমি কি বাদশাহ! ওই ব্যাবসাদারের সামনে আমি যা মুখে এসেছে তাই বলেছি। তারই ফলে হয়তো আমার এ অবস্থা হয়েছে।' বলে মুখ ঘুরিয়ে আবার ঘুমোনোর চেষ্টা করল।

উজির জফর আবার তার কাছে গিয়ে বলল, 'হুজুর মনে হচ্ছে আপনি সকালের নামাজে যেতে চান না। তাই আপনার গোলামরা একটু ইতস্তত করছে। আপনার ওঠার সময় হয়ে গেছে।'

আবুল গাইয়েদের দিকে তাকিয়ে কী যেন ইশারা করল। গান শুরু হল। গান আর বাজনার সে এক গমক ও মূর্ছনা। আবুল ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে মনে বলল, 'ওরে এই আবুল, আর কোনোদিন তুই শুয়ে শুয়ে এরকম গান শুনেছিস?' এই কথা বলে হঠাৎ উঠে বসল! সে নিজের চোখকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মগজে কিছু যেন ঢুকছে না।

সে স্বপ্ন দেখছে কি না তাও সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

আবুল নিজের দু-হাত ছড়িয়ে দেখল তার হাতগুলো আগের মতোই আছে। সে আপন মনে বলল, 'আরে এই আবুল 'তুই

আছিস কোথায়? তুই কি ঘুমোচ্ছিস না জেগে আছিস? তুই আবার বাদশাহ হলি কবে? এই মহল, এই বিছানা, এই গেলামের দল, এই ঘরানার মেয়েরা, এই নাচিয়েরা, সুন্দরীরা গাইয়েরা—এরা সব কবে তোর হল?'

ঠিক তখনই গান থেমে গেল। মনশুর আবুলের সামনে নুয়ে তিন বার সেলাম করে বলল, 'হুজুর আমার নিবেদন এই যে আপনার নামাজ পড়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনার দরবারে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

আবুল কী যেন বলতে গেল। তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। সে মনশুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে এই, তুমি কে? আমি-বা কে?'

'আপনি আমাদের বাদশাহ, মুসলমানদের সুলতান ! আপনি খলিফা হারুন-অল-রশীদ। আব্বাসের পঞ্চমজন আর আমি আপনার বান্দা, আপনার তরবারি ধরার আজ্ঞা প্রাপ্ত মনশুর!' মনশুর সবিনয়ে নিবেদন করল।

'এই সব মিথ্যা!' আবুল হোসেন চিৎকার করে উঠল।

'হুজুর আমাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য এ ধরনের কথা বলছেন। আপনি হয়তো কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখছেন।' মনশুর বলল।

আবুল হোসেন কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। কখনো হাত নাড়ছে, কখনো পা ছুঁড়ছে আবার কখনো চাদর গুটিয়ে ছড়াচ্ছে। এসব কিছু পর্দার আড়াল থেকে বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ দেখছেন আর অনেক কষ্টে হাসি চাপছেন।

কিছুক্ষণ পরে আবুল বিছানায় উঠে বসে এক কালো গোলামকে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাকে চেন? আমার নাম বলতে পার?

গোলাম মাথা নত করে বলল, আপনি একমাত্র আমাদের বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ।'

'ওরে কালো মুখো, তুমি সত্য কথা বলছ না।' আবুল হোসেন বলল।

তারপর সে এক কালো রমণীকে ডেকে একটা আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'তুমি এটাতে একটা কামড় দাও তো।' সেই রমণী আবুলের আঙুলে জোরে কামড়ে দিল। আবুল তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক আছে। আমি তাহলে ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছি। কিন্তু এরা আমার ব্যাপারে যা করছে তা কি সত্য?' ওই রমণী হাত নেড়ে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। আপনিই তো বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ।'

'ওরে ব্যাটা, শুনছিস? তুই তো বাদশাহ!' আবুল চিৎকার করে আবার সেই রমণীর দিকে ফিরে বলল, 'আজে বাজে কথা বকছিস কেন? আমি কি জানি না, আমি কে?'

ততক্ষণে হিজড়েদের নেতা এসে বলল, 'হুজুর, আপনার স্নানের সময় হয়েছ।'

এ-কথা বলতে বলতে আবুল হোসেনকে সে বিছানা থেকে নাবাল। আবুলকে বিছানা থেকে নাবানোর সাথে সাথে সবাই বলে উঠল, 'বাদশাহের জয় হোক।'

'এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কাল আমি ছিলাম আবুল হোসেন আর আজ বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ হয়ে গেলাম।' আবুল এ কথা মনে মনে বলল। হিজড়েদের নেতা আবুলের পায়ের কাছে খড়ম রাখল। ওই ধরনের খড়ম আবুল কোনোদিন দেখেনি। তাতে নকশা করা সোনার পাত লাগানো আছে, আর মুক্তা জড়ানো আছে। কেউ যেন তাকে ওই খড়ম জোড়া পুরস্কার দিয়েছে এমনভাবে আবুল তাতে পা গলিয়ে দিল।

এসব যারা দেখছিল তারা মনে মনে হেসে খুন হচ্ছিল। পর্দার আড়াল থেকে বাদশাহ হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন।

তারপর গোলাপ জলে আবুলকে স্নান করানো হল, বাদশাহের সেই সময়কার পোশাক পরানো হল, আর তার হাতে রাজদণ্ড দেওয়া হল।

মনে মনে আবুল ভাবল, 'আমি কি আবুল হোসেন?' পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'আমি আবুল হোসেন নই, যে আমাকে আবুল হোসেন বলবে তাকে আমি ফাসি দেব। আমি, আমিই। আমিই হারুন-অল-রশীদ।'

তারপর সে সবার সাথে দরবারে গেল। মনশুর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজদণ্ড তার সামনে আড়াআড়ি রাখল। দরবারের সবাই সহাস্যে আনন্দ প্রকাশ করল।

আবুল দরবারের চারদিকে তাকাল। দরবারে চল্লিশটা দরজা ছিল। দরজায় দরজায় জনতার ভিড়। তরবারি হাতে উজির, জফর, তরবারি হাতে মশুর, সেপাই, আমির, রাজদূত সবাই কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। ওই ভিড়ের মধ্যে আবুল লক্ষ করল আরও অনেক কর্মচারীকে। জফর এক তাড়া কাগজ আবুলের সামনে এনে এক এক করে পড়তে লাগল। এসব সেই দিনের বিচারের কাগজ।

বিচারের ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রত্যেকটি বিচারের বিষয় মন দিয়ে শুনে প্রত্যেকটার ব্যাপারে সুচিন্তিত মত জানাল আবুল। পর্দার আড়াল থেকে ওই বিচার শুনে বাদশাহ বিস্ময় বোধ করছিলেন।

জফরের সমস্ত বিচারের কাগজ পড়ার পর আবুল কোতোয়ালকে ডাকল। আহমদ তার সামনে এল। আবুল তাকে বলল, 'তুমি আবুল হোসেনের বাড়ি যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলের অধিকারীকে ধর। ওর দুজন অনুচর আছে। ওকে আর ওই দু-জনকে ধরে প্রথমে চার-শো করে চাবুক শবে। তারপর ওই তিন জনকে ছেড়া কাপড় পরাবে। উটের পিঠের উলটো দিকে মুখ করে বসিয়ে চারটি অঞ্চল ঘোরাবে। ঘোরাতে ঘোরাতে ঢাক পিটিয়ে বলবে, যারা অন্যদের ইজ্জত নেয়, যারা মেয়েদের ইজ্জত নেয়, যারা মেয়েদের অসম্মান। করে, সৎ

লোকের নামে যারা নিন্দা প্রচার করে তাদের এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। ওই অঞ্চলের অধিকারীকে ফাঁসি দেবে, অধিকারীর মৃতদেহ আবর্জনায় ফেলে দেবে। অনুচর দুজনকে লঘু শাস্তি দেবে।'

আবুলের কথা শেষ হতেই তাকে সেলাম করে তার নির্দেশ কার্যকরী করতে কোতোয়াল চলে গেল।

তারপর আবুল আরও অনেক নির্দেশ দিল। চাকরিও দিল কয়েক জনকে। কয়েক জনের চাকরি খেল। অন্যান্য রাজকার্যও অনেক নিপুণতার সাথে করল। এসব আড়াল থেকে দেখে বাদশাহ কখনো কৌতুকবোধ করছিলেন।

ওই কোতোয়াল সমস্ত নির্দেশ পালন করে ফিরে এসে আবুলের হাতে একটা কাগজ দিল। ওই কাগজে বিশিষ্ট কয়েক জনের স্বাক্ষর ছিল। আবুলের আদেশ কার্যকরী হাতে যারা দেখেছে তাদের স্বাক্ষর ছিল ওই কাগজে।

'ভালো কথা, আগামী দিনে যারা মিথ্যা অপবাদ রটাবে, মেয়েদের ইজ্জত যারা নষ্ট করবে, অন্যদের ব্যাপারে যারা অহেতুক নাক গলাবে তাদের আমি এই ধরনের শাস্তি দেব। সবাই ভালো করে শোনো।' আবুল ঘোষণা করল।
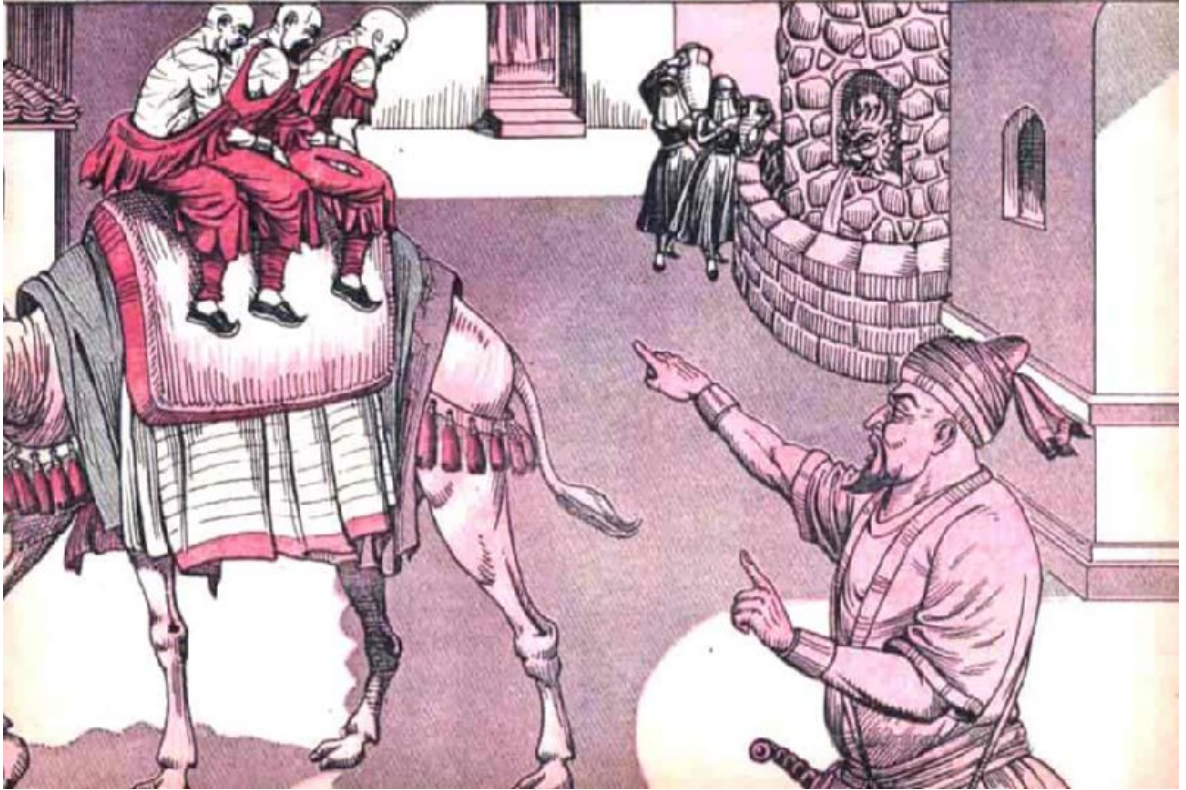
তারপর কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আবুল বলল, থলিতে এক হাজার দিনার নিয়ে আবুল হোসেনের বাড়িতে যাও। আবুলের মাকে প্রণাম করে বলবে, এই হাজার দিনার উপহার

দিয়েছেন বাদশা! আরও বলবে, খাজানায় তত বেশি দীনার না থাকায় এর বেশি দিনার বাদশাহ্ দিতে পারেননি। এই কথা বলে দীনার দিয়ে ফিরে এসে উনি কীভাবে নিলেন, কী বললেন, আমাকে জানাবে।'

কোষাধ্যক্ষ আবুলের নির্দেশ মতো কাজ করতে চলে গেল।

আবুল তারপরেইশারায় জফরকে নির্দেশ দিল দরবারের কাজ শেষ হয়েছে ঘোষণা করতে। জফর দরবারের সবাইকে সেই নির্দেশ জানিয়ে দিল। সবাই সিংহাসনের সামনে এসে নত হয়ে সেলাম করে চলে গেল। শেষপর্যন্ত সেখানে রইল শুধু মনশুর ও জফর। ওরা আবুলকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

সেখানে খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করা ছিল। রমণীরা আবুলকে ঘিরে তাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। ভেতরে সুন্দরীরা মধুর গান গাইছিল।

'এ-ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ নেই যে আমি হারুন-অল-রশীদ। আমি শুনছি দেখছি, সুগন্ধও পাচ্ছি, হাঁটছি। পদে পদে খাতির পাচ্ছি। তাই আমি নিশ্চয় বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ।' আবুল মনে মনে বলল।

তিন

আবুল হোসেনের এখন পূর্ণ বিশ্বাস হল যে সে সত্যি খলিফা। তার ভোজন শালায় নানান রঙের আলোর বাহার। সোনার মনোরম পর্দার শোভা। সব মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। ঘরের মাঝে সাতটা সোনার থালায় মাংসসহ সাত রকমের খাবার সাজানো রয়েছে। তার আশেপাশে সাত রমণী হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সারা ঘর ধূপের সুগন্ধে ভরপুর ছিল।

আবুল কাল দুপুরের পর আর কিছু খায়নি। তাই তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে থালার সামনে বসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সাত জন যুবতী পাখা নাড়তে লাগল। আবুল খাবার সময় অত হাওয়া খেতে অভ্যস্ত ছিল না। সে শুধু একজন নিগ্রো যুবতীকে পাখা নাড়তে বলে বাকি সবাইকে তার সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে বসতে বলল। তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে খেতে লাগল।

খাবার পর হিজড়েরা এসে তার হাত ধুয়ে দিল। তাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল। সেই ঘর আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয়। সেই ঘরে সাত রকমের ফল সাজানো ছিল। সাত জন সুন্দরী ছিল অপেক্ষায়। আবুল

সমস্ত রকমের ফল চেখে দেখে অন্য ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সেই ঘরে সুন্দর সুন্দর রকমারি বোতলে এবং সোনার পাত্রে নানান ধরনের পানীয় ছিল। সেই পানীয় আবুলের হাতে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুন্দরী রমণীরা অপেক্ষা করছিল। আবুল

ওই যুবতীদের তার চারদিকে ঘিরে বসতে বলে ওদের হাত থেকে পানীয় নিয়ে পান করছিল। ওদের মধ্যে একজন যুবতী বেশি নেশার ওষুধ মেশানো পানীয় আবুল হোসেনকে পান করতে দিল। সেটা পান করে আবুল বেহুঁস হয়ে গেল।

এতক্ষণ পর্দার অন্তরালে থেকে আবুল হোসেনের কাণ্ডকারখানা খালিফা দেখছিলেন এখন তিনি বেরিয়ে এলেন। হারুন-অল-রশীদ গোলামকে ডেকে আবুলের গা থেকে রাজার পোশাক খুলে আবুলের নিজের পোশাক পরাতে বললেন। তারপর যে গোলাম আগের দিন আবুল হোসেনকে তুলে রাজপ্রাসাদে এনেছিল তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'একে তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে ফিরে এসো।' গোলাম রাজার নির্দেশ পালন করতে চলে গেল। এবার গোলাম দরজা বন্ধ করার কথা ভোলেনি। দরজা বন্ধ করেই সে রাজার কাছে ফিরল।

পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আবুল হোসেন বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছিল। দুপুরে তার নেশা কাটল। চোখ বুজেই আগের দিন ভোরে যাদের যাদের ডেকেছিল তাদের সবাইকে নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কেউ না আসাতে ভীষণভাবে চটে গিয়ে উঠে বসল বিছানার উপর।

তখন তার খেয়াল হল সে তো প্রাসাদে নেই, ঘরে নিজের বিছানাতেই পড়ে আছে।

তারপর ভাবল সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে। সে ডাক দিল, জফর! 'জফর! মনশুর! তোমরা কোথায়?'

তখন তার মা ছুটে এল। প্রশ্ন করল, কী রে আবুল, বাবা, 'কী হয়েছে! স্বপ্ন দেখছিস নাকি! চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'আরে, এই বুড়ি, তুমি কে? আর এই আবুলটাই বা কে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'ওরে, আবুল তুই তো আবুল হোসেন, আমি আমি তো তোর মা! আমাকে চিনতে পারছিস না কেন?' বলল আবুলের মা।

'আরে এই বুড়ি, তুমি জানো, তুমি কার সাথে কথা বলছ? আমি খলিফা হারুন-অল-রশীদ! এই মর্তভূমিতে আল্লার প্রতিনিধি। যাও, ভাগো এখান থেকে।' আবুল বকল মাকে।

তার মা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কী রে! তোর হল কী! আজেবাজে কথা বলছিস কেন? এভাবে চেঁচালে আশপাশের লোক জমে যাবে। আমার সর্বনাশ হল। দোহাই বাবা চুপ কর।...তুই হারুন-অল-রশীদ হতে যাবি কেন ? কী সর্বনেশে কথা। এসব কথা বাদশাহের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।' বুড়ি বলল।

'আমি হারুন-অল-রশীদ। আমি পৃথিবীর অধিপতি।' আবুল বলল।

আবুলের মা বুক চাপড়ে বলল, 'বাবা, তোর মাথায় ভূত চেপেছে। তোর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। তুই তো জন্ম থেকে আমার কাছেই থাকিস। আমি তোকে এত বড়ো করেছি।

একটু জল খা বাবা। চোখে মুখে জলের ছিটে দে। ঘুমের ঘোর কেটে যাবে।'

বুড়ির হাত থেকে জল নিয়ে পান করে বলল, 'হয়তো সত্যি আমি আবুল হোসেন। এই তো আমার ঘর! তুমি তো আমার মা! আমাকে কেউ জাদু করেছে।'

আবুলের মা রান্না করতে যাওয়ার আগে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল সে কি স্বপ্ন দেখেছে? তৎক্ষণাৎ আবুল বিছানা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার মা-র হাত ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলল, 'পাজি মহিলা তুমি আমার কাছে বলছ না কেন, কারা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে! কারা আমাকে এই অন্ধকারে নোংরা ঘরে ফেলে গেছে! বল, বল তাড়াতাড়ি, না হলে তোমাকে জানে মেরে ফেলব। যতদিন না আমি সিংহাসন ফিরে পাচ্ছি ততদিন আমার রাগ কমবে না। সাবধান! রাজার রাগের অর্থ যে কী তা তুমি বোঝ না! এই ষড়যন্ত্র যে করেছে তার রেহাই নেই। আমি কোনোদিন তাকে ক্ষমা করব না।' আবুল তার মাকে ছেড়ে দিল। পরে তার মা গোলাপ জল দিয়ে শরবত করে এনে খেতে দেয় তাকে।

আবুলের মা ছেলের মন অন্য দিকে ফেরানোর জন্য বলল, 'জানিস বাবা আবুল, কাল ভারি মজার একটা ঘটনা ঘটেছে এখানে। তুই শুনে খুব খুশি হবি। কাল আমাদের এই মল্লোর মোড়লকে, ওর দু-জন অনুচরকে, রাজার প্রহরীরা ধরেছে। প্রত্যেককে চারশো করে চাবুক কশেছে। উটের পিঠে উলটো করে বসিয়ে সমস্ত মহল্লায় ঘুরিয়েছে। ফাঁসি দিয়েছে!’

কথাটা শুনে আবুল রেগে বলল, 'পাজি বুড়ি! তোমার কথাইতো প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমি কোনো ভুল করছি না। ওই তিন জনকে শাস্তি দিতে আমিই তো প্রহরীদের পাঠিয়ে ছিলাম। আহমদকেও পাঠিয়ে ছিলাম। তুমি আর মুখ নেড়ে বল না যে আমি স্বপ্ন দেখেছি। বল না যে আমার মাথায় ভূত চেপেছে। তুমি এক্ষুনি আমার সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে আমার কাছে ক্ষমা চাও।'

আবুলের মা বুঝল যে ছেলে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদে কেঁদে বলল, 'আল্লাহ, কৃপা করে তোর পাগলামি সারালে সারাবেন। দোহাই তোর। তুই আর নিজেকে 'খলিফা খলিফা' বলে চিৎকার করিস না। আশপাশের লোক শুনতে পেয়ে রাজার কানে তুলে দিলে রাজা তোকে ফাঁসি দেবে।' লাঠি হাতে তুলে নিয়ে তার মাকে বলল, “আমাকে আবুল বলে আর ডেকো না। আমিই বাদশাহ হারুন-অল-রশীদ।

ছেলে আবুলকে মা শান্ত স্বরে বলল, 'বাবা, তোর মাথা এতটা গোলমাল হয়ে গেল কেন বাবা! নিজেকে যে তুই খলিফা বলছিস, এ যে তোর পাপ বাবা! কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে তো। সবে কালকে খলিফা স্বয়ং আমাকে এক হাজার দিনার দিয়ে আরও পাঠাব বলে খবর পাঠিয়েছেন।'

আবুলের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, মা-র এই কথা শুনে তা একেবারে লোপ পেল। আবুল নিজেই তো তার মা-র নামে এক হাজার দিনার পাঠিয়েছিল।

আবুল হোসেন মা-র দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, 'এ-কথা বলে তুমি কি বলতে চাও যে ওই হাজার দিনার আমি তোমাকে পাঠাইনি? যে লোকটা দিনার তোমার হাতে দিয়ে গেল সে কি আমারই নির্দেশে দিয়ে যায়নি? এত করার পরেও তুমি আমাকে এখনও আবুল হোসেন বলে ডাকছ?' বলতে বলতে সে তার মা-র গায়ে লাঠি চালাল।

এইভাবে মার পড়াতে আবুলের মা আর সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করতে লাগল। তার আর্তনাদ শুনে আশেপাশের লোক ছুটে এসে আবুলের লাঠির আঘাত। থেকে তার মাকে বাঁচাল। তার হাত থেকে লাঠি টান মেরে কেড়ে নিল। তারপর তার হাত-পা বেঁধে তাকে বলল, 'আরে আবুল! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? নিজের মা-র গায়ে তুই লাঠি তুলছিস? কোরানে যা পড়েছিস তা কি সব ভুলে গেছিস?'

আবুল হোসেন চিৎকার করে বলল, 'আবুল হোসেন আবার কে? তোমরা কি আমাকেই ওই নামে ডাকছ?'

প্রতিবেশীরা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে বলল, 'তুমি কি আবুল হোসেন নও? ইনি কি তোমার জন্মদায়িনী মা নয়?'

'ওরে গাধার দল। তোমরা ভাগ এখান থেকে। মনে রেখ আমি তোমাদের বাদশাহ! আমি হলাম খলিফা হারুন-অল-রশীদ!' আবুল হোসেন চিৎকার করে বলল।

আবুল হোসেনের বদ্ধ পাগল হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবেশীদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। এহেন পাগল ছেড়ে রাখা অনুচিত ভেবে ওরা আবুলের হাত-পা বেঁধে পাগলাগারদের লোককে খবর দিল। এক ঘণ্টার ভিতর পাগলাগারদের কর্মকর্তা দু-জন সেপাই নিয়ে হাজির হল। ওই সেপাইদের হাতে হাতকড়া ও শেকল ছিল।

ওদের দেখেই আবুল হোসেন দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ওরা আবুল হোসেনের পিঠে কয়েক ঘা চাবুক মারল। বার বার আবুল নিজেকে হারুন-অল-রশীদ বলে ঘোষণা করছিল। কিন্তু করলে কী হবে যারা চাবুক মারার তারা সমানে চাবুক মেরে চলল। আবুলের কথা কেউ কানে তুলল না । সোজা নিয়ে গেল পাগলাগারদে। গারদে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই পঞ্চাশ বার চাবুক কশল।

টানা দশ দিন চাবুক খেয়ে আবুল হোসেন যেন ক্রমশ ভুল বকা থামাল। তার ভাবনায় পরিবর্তন লক্ষিত হল।

এর মাঝে আবুল ভাবতে লাগল। আমার অবস্থা তো ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমাকে যে লোক পাগল ভাবছে তারজন্য তো আমিই দায়ী। আমি রাজপ্রাসাদে ছিলাম

বলে আমি হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু দেখে তো একবারও মনে হয়নি যে সেটা স্বপ্ন। আমি পাগল হয়ে গেলাম, আর পারছি না। আমি আর পারছি না। আল্লাহ্ না জানি কত বিচিত্র কাণ্ড করছেন।

আবুল হোসেন যখন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে এমন সময় তার মা তাকে দেখতে পাগলাগারদে এল। ছেলেকে দেখে মা-র বুক যেন খান খান হয়ে গেল। সে কান্না চেপে বলল, 'বাবা, আবুল কেমন আছ?'

'মা আল্লা তোমাকে ভালো রাখুক।' আবুল শান্ত স্বরে বলল।

বুড়ি খুশি হয়ে বলল, 'বাবা, আল্লার দয়ায় তোর মতি গতি ফিরেছে।'

'মা আমি তোমার কাছে আর আল্লার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি বুঝতে পারছি না আমি কেন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো শয়তান আমার ভিতর ঢুকে আমার মুখ দিয়ে হয়তো ওই সব আবোল তাবোল কথা বকিয়েছে। যাক যা হবার হয়েছে। এবার আমি ঠিক হয়ে গেছি।' আবুল হোসেন বলল।

'তোর কথা শুনে বাবা আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কী বলব! মনে হচ্ছে আমি যেন তোকে নতুন করে পেয়েছি।' আবুলের মা বলল।

আবুলের মা-র আবেদন শুনে পাগলাগারদের অধিকারী আবুলকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে তার পাগলামি সেরে গেছে। তখন কর্তৃপক্ষ তাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আবুল ক্লান্ত অবসন্ন দেহে টলতে টলতে মা-র সাথে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরলেও অত বেশি চাবুক খাওয়ার ফলে সে আর কিছু করতে পারছিল না। বিছানায় শুয়ে থাকতে হল আবুল হোসেনকে।

চার

আবুল হোসেনের চাবুকের ঘা শুকিয়ে গেল। আবুল হোসেনের আর ঘরে থাকতে ভালো লাগছে না। সে আবার বেরুতে শুরু করল অতিথির সন্ধানে। দাঁড়াল সেই পুলের

প্রান্তে। আগের মতোই সে আবার নতুন অতিথির সন্ধানে রইল।

প্রথম দিনেই খলিফার সাথে দেখা। খলিফা অন্য পোশাকে ব্যবসায়ীর বেশে ছিলেন। তার পিছনে ছিল এক মোটাসোটা গোলাম।

খলিফাকে দেখেই আবুল মুখ ঘুরিয়ে নিল। একবার যাকে অতীতে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে আর কোনোদিন অতিথি হিসেবে বরণ করতে চায় না আবুল।

বাদশাহ আর থাকতে পারলেন না। সোজা আবুলের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘বন্ধু আবুল হোসেন কেমন আছ বন্ধু, তোমাকে যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে বন্ধু ?’

আবুল মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'যাও যাও, আমি তোমাকে চিনি না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে সহজেই চিনতে পেরেছি। এক মাস আগে তোমার বাড়িতে বেশ মজাসে কাটিয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারছ না, এ কি বিশ্বাস করা যায়?’ বাগদাদের বাদশাহ বললেন।

‘আল্লার নামে শপথ করে বলছি যে আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। যাও, নিজের পথ ধর, কাট।' আবুল বলল।

‘বন্ধু, তুমি তোমার বন্ধুকে ভুলে গেলে?’ বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

আবুল এবার কোনো কথা না বলে ইশারায় বাদশাহকে যেতে বলল।

বাদশাহ তখন হাসতে হাসতে আবুলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার এই ব্যবহার আমার ভালো লাগছে না বন্ধু। তুমি আর একবার আমাকে অতিথি। করে তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে জানাও কেন তুমি আমার উপর। রাগ করেছ। বল নিয়ে যাবে?’ উঁ? না নিয়ে গেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না । তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার উপর রাগ করেছ।'

আবুল হোসেন ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'আমাকে এত কষ্ট দিয়ে আবার কোন মুখে আমার অতিথি হতে চাইছ?’

এবার বাদশাহ আবুলকে গলায় জড়িয়ে বললেন, ‘বন্ধু, আমার জন্য তোমার কোনো কষ্ট হয়ে থাকলে বিশ্বাস কর, আমি জেনে-শুনে তোমাকে কষ্ট দিইনি। তোমার কী ধরনের কষ্ট হয়েছে জানতে পারলে আমি তার সুরাহা করতে পারি।'

কিছুক্ষণ পরে আবুলের মেজাজ একটু ঠান্ডা হল। সে বলল, ‘সেদিন ভোরে তুমি দরজা বন্ধ না করে চলে গেলে। আর তার ফলে আমার যে দুর্ভোগ হল তা আর তোমাকে কী বলব!’ এভাবে শুরু করে আবুল সমস্ত ব্যাপার জানাল। বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের মাঝে মাঝে হাসি থামাতে কষ্ট হচ্ছিল। বাদশাহের মুখের হাসির রেখা দেখে আবুল

হোসেন বলল, 'আমার কষ্টের কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে? এই তুমি আমার বন্ধু! আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমার পিঠে চাবুকের দাগ দেখ।' আবুল জামা খুলে পিঠের চাবুকের দাগ দেখাল।

অত চাবুকের দাগ দেখে হারুন-অল-রশীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আবুলকে গলায় জড়িয়ে বাদশাহ বললেন, 'ভাই আমাকে শুধু আজ একটি দিনের জন্য অতিথি করে নিয়ে যাও। এর ফলে আল্লাহ্ তোমার হাজার গুণ ভালো করবে!'

একজনকে দু-বার অতিথি হিসেবে বরণ করা আবুলের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। তবু তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলল, 'আমি তোমাকে নিরুপায় হয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তোমার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ কাল ভোরে ফেরার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলো না।'

বাদশাহ হাসি চেপে তাই করার সম্মতি জানালেন। দু-জনে আবুলের বাড়ি পৌঁছাল। এক গোলাম তাদের খাবার এবং মদ দিল। মদ খেয়ে বাদশাহ আবুলকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বন্ধু, কোনোদিন কোনো রমণী তোমাকে আকর্ষণ করেনি? বিয়ে করার ইচ্ছা তোমার জাগেনি?'

এ-কথায় আবুল বলল, বন্ধুবান্ধবদের সাথেই আমার ভালো কাটে। মদ এবং আজ্ঞা পেলে আর আমার কিছুই ভালো লাগে না। তার মানে এই নয় যে মেয়েছেলে একেবারেই আমার ভালো লাগে না। আমার মাথায় ভূতে ভর করেছিল যেদিন সেই ঘোরে কতকগুলো যুবতীকে দেখেছিলাম বটে। আহা আহা কী বলব! ওরা সবসময় হাসছে, গাইছে, নাচছে আর যখন যা দরকার বলার আগেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কী হাসি ওদের মুখে! কী প্রাণচঞ্চল তারা! ওরকম একটা মেয়েছেলে পেলে যত লাগুক দিয়ে একেবারে কিনে ফেলতাম। তবে, কথা কী জানো বন্ধু, ওই সব মেয়েছেলে কি যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। শুনেছি রাজা-বাদশাহ-উজির-ওমরাহদের অন্তঃপুরে নাকি ওই ধরনের মেয়েছেলেরা থাকে। তা বাবা স্বপ্নে হলেও দেখা হয়ে গেল, এই যা। তা ওই ধরনের মেয়েছেলে আমার কপালে জুটবেও না তাই বিয়ে করার স্বাদও আমার নেই। একটা কথা কী জানো বন্ধু, ওই মেয়েদের মুখ ঝামটা আর মুখ হাঁড়ি করা আমার একদম অপছন্দ। বিরক্তিকর মেয়েদের বিয়ে করার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা মেরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।'

এ-কথা বলে আবুল বাদশাহের হাত থেকে মদের পাত্র নিয়ে পান করে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। বাদশাহ এবারের মদে বেহুশ হবার ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

বাদশাহের ইশারা পেয়েই গোলাম এসে আবুল হোসেনকে কাঁধে ফেলে নিয়ে গেল। তার পিছনে বাদশাহ বাইরে এলেন। এবার কিন্তু উনি খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করেছিলেন। বাদশাহের ইচ্ছা ছিল না আবুলকে বাড়ি ফেরানোর।

বাদশাহ, গোলাম এবং বেহুশ আবুলকে নিয়ে গোপন পথে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। আগের বারের মতো বাদশাহ আবুলকে নিজের পোশাক পরিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর মনশুরকে ডেকে আদেশ দিলেন নামাজের আগে যেন ডেকে দেওয়া হয়। তারপর তিনি অন্য এক ঘরে ঘুমোতে লাগলেন।

পরের দিন মনশুর ঠিক সময়ে বাদশাহকে জাগালেন। বাদশাহ আবুলের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে দেখলেন আবুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আগের বারে যে যুবতীরা আবুলের সামনে এসেছিল, বাদশাহ তাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। গান-বাজনার লোককেও ডেকে পাঠিয়ে তাদের নিজের নিজের জায়গায় দাঁড় করালেন। কাকে কী করতে হবে তা সবাইকে বুঝিয়ে বললেন। আবুলের ঘুম ভাঙানোর জন্য তার নাকের কাছে একটি তরল পদার্থ শুকিয়ে দিতে বললেন। আর নিজে পর্দার অন্তরালে লুকোলেন।

ওই পদার্থ শোঁকার সাথে সাথে আবুলের ঘুম ভেঙে গেল। নেশা কেটে গেল। ঠিক সেইসময় এক অদ্ভুত সংগীত শোনা গেল। কিছুক্ষণ আবুল চোখ বুজেই গান শুনল। তারপর চোখ খুলে চারদিকে তাকাল। এ তো সেই ঘর যা একবার সে দেখেছে। সেইরকম সাজানো-গোছানো আর তার চেয়ে বড়ো কথা সেই আগের যুবতীরাই এবারও আছে। আবুল বিছানা থেকে উঠে বসে চোখ কচলাল।

সংগীত থেমে গেল। সারা ঘরে কোনো শব্দ নেই। আবুল হোসেনের তাকানোর সাথে সাথে প্রত্যেক যুবতীর চোখ অর্ধ নিমীলিত হয়ে গেল।

আবুল হোসেন বেশ মেজাজে বলল, 'ওরে, আবুল আবার তোর পিঠের চামড়া তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকে এই স্বপ্ন দেখছ, কাল তোমার পিঠে পড়বে চাবুক আর তারপর হাতে কড়া পড়বে। অন্ধকার ঘরে মাথা কাটাতে হবে অনেক দিন। ওরে মোসলের সওদাগর, তুমি আবার দরজা বন্ধ না করে কেটে পড়লে বন্ধু। তোমার এই অপরাধের ফলে কি হবে জানো?

নরকে যেতে হবে তোমাকে, এই বলে দিলাম। হ্যাঁ। মোসলের সমস্ত সওদাগর জাহান্নমে যাক। মোসল শহর ধ্বংস হোক।' এ-কথা চিৎকার করে বলে চোখ বুজল আবুল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে চোখ কচলে আবার বিড় বিড় করে বলল, 'ওরে ব্যাটা আবুল, এক কাজ কর চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়। যতক্ষণ না ভূত ছাড়ে ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাক। আজ এই যুবতীদের দিকে তাকালে কাল তোর কী হবে একবার ভালো করে ভেবে দেখ !' তারপর আবার আবুল চোখ বুজল। চোখে ঘুম নেই। তবু সে নাক ডাকার চেষ্টা করল যাতে তার নিজের কাছে মনে হয় যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পর্দার আড়াল থেকে এসব দৃশ্য দেখে বাদশাহ হাসি আর চাপতে পারছিলেন না । আবুলই বা ঘুমোবে কী করে। আবুলের যে যুবতীকে ভালো লেগেছিল সেই গন্না যে তার পাশেই বসে বলছিল, 'হুজুর দয়া করুন। সকালের নামাজ পড়ার সময় হয়ে গেছে।'

আবুল চাদরের ভেতর থেকে গর্জে উঠে বলল, 'শয়তান, যাও এখান থেকে।' 'হুজুর কোনো খারাপ স্বপ্ন হয়তো দেখছেন। আমি শয়তান নই, গন্না, আমার নাম গন্না।' সেই যুবতী বলল।

আবুল মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দেখল, গন্না বিছানায় বসে আছে। আর বাকি যুবতীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গন্না একেবারে মাথার কাছে। আবুল ওই যুবতীদের নাম জানত।

'তোমরা সবাই কারা? কী তোমাদের নাম? আমি কে?' আবুল প্রশ্ন করল।

সবাই সমস্বরে বলল, 'আপনি আমাদের মালিক হারুন-অল-রশীদ।'

'তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! আমি কি আবুল হোসেন নই।' আবুলের প্রশ্ন।

'ক্ষমা করবেন। আপনি কোনোক্রমেই আবুল হোসেন নন। আপনি আমাদের মালিক।' সবাই একসাথে বলল।

আবুল গন্নার দিকে ফিরে বলল, 'যাই হোক। যা হচ্ছে তা ভালোই। এই মেয়েটা, তুমি আমার কান কামড়ে দাও।'

গন্না আবুলের কান জোরে কামড়াল।

আবুল চিৎকার করে বলল, 'আমি সত্যি হারুন-অল-রশীদ।'

তারপর সংগীত শুরু হল। সমস্ত যুবতী হাতে হাত দিয়ে বিছানার চার পাশে নাচতে লাগল। আবুল নিজের আনন্দ প্রকাশ না করে পারল না।

একদিকে বিছানার চাদর অন্যদিকে বালিশ ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে নেমে ওদের সাথে নাচতে লাগল।

বাদশাহ আর হাসি চেপে থাকতে না পেরে হো হো করে হাসতে হাসতে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আবুল হোসেন, তুমি আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে মেরে ফেললে!'

হঠাৎ নাচ বন্ধ হয়ে গেল। যুবতীরা যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। আবুল হোসেনও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাদশাহকে দেখে আবুল চিনতে পারল মোসল শহরের সওদাগরকে। তৎক্ষণাৎ সব ঘটনা আবুলের মনে পড়ে গেল।

আবুল হোসেন বুঝতে পারল যে এই সমস্ত প্রহসন স্বয়ং বাদশাহের নির্দেশেই হচ্ছে। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে আবুল সাহসে ভর করে বাদশাহের দিকে এক লাফে গিয়ে তাকে বলল, 'আরে এই মোসল শহরের সওদাগর, তুমি দরজা বন্ধ করে গেলে না। জান এই অপরাধের শাস্তি কি হতে পারে?'

বাদশাহ আবার হো হো করে হেসে উঠে আবুলকে গলায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বন্ধু তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তারজন্য আমি তোমার মনের সবচেয়ে বড়ো ইচ্ছা পূরণ করে, তোমাকে আমার বন্ধু করে নিতে চাই। বুঝতে পেরেছ?'

তারপর আবুলকে নিজের সবচেয়ে দামি পোশাক পরিয়ে বাদশাহ বললেন, 'আবুল তেমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, তুমি পাবে। আমি দেব।' আবুল বাদশাহকে সেলাম করে বলল, 'হুজুর, সারাজীবন আপনার আশ্রয়ে থাকতে পারলেই সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি পেয়েছি মনে করব।

পাঁচ

বাদশাহ আবুলের কথায় প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'আবুল, এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু আমার খুব পছন্দ। এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে আমার অনুচরের পদে নিযুক্ত করছি। এই প্রাসাদে তোমার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। রানি জুবেদার অন্দর মহলে ঢোকার অনুমতি কেউ পায়নি। কিন্তু তোমাকে সেই অনুমতি আমি দিচ্ছি।'

বাদশাহের প্রাসাদেই আবুল হোসেনের থাকার ব্যবস্থা হল। তখনই তার হাতে দশ হাজার দিনার খরচ করার জন্য দেওয়া হল। বাদশাহ কথা দিলেন আবুলের সুবিধা অসুবিধার দিকে তিনি নজর রাখবেন। তারপর বাদশাহ দরবারে চলে গেলেন।

আবুল হোসেন তক্ষুনি ছুটে চলে গেল নিজের বাড়ি। মাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল যে বাদশাহ ওইসব মজা করার জন্য করেছিলেন। আবুল তার মাকে কথা দিল, প্রত্যেক দিন সে এসে মাকে দেখে যাবে। ক্রমে সারা দেশে আবুল হোসেনের বিচিত্র কাহিনি ছড়িয়ে পড়ল। বাদশাহের অনুচরের পদে নিযুক্ত হয়েও লোকের প্রতি আবুলের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। কোনো দেমাগ নেই তার, সবার সাথেই মেশে কথা বলে। বাদশাহকেও আবুল হাসিয়ে মারে। শেষে এমন হয়ে গেল যে আবুলকে ছেড়ে বাদশাহ থাকতে পারতেন না। তাঁর ভালো লাগত না।

অন্দর মহলে আবুলের অবাধ যাতায়াত ছিল। গন্নার দিকে তার তাকানো, গন্নার লজ্জা পাওয়া, গন্নাকে দেখে আবুলের খুশি খুশি ভাব-- এসব রানি জুবেদা লক্ষ করেছিলেন। তিনি একদিন বাদশাহকে বললেন, 'হুজুর, আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, গন্না, এবং আবুলের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে। এবার ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করাই ভালো।'

'আমিও তাই ভাবছি। কাজের চাপে আমি সময় করে উঠতে পারছি না। আমি আবুলকে কথা দিয়েছিলাম ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। আচ্ছা গন্নার সাথে ওর কি ভালো মানাবে? তোমার কী মনে হয়?' বাদশাহ বললেন।

একদিন বাদশাহ এবং জুবেদা গন্না ও আবুলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা দুজনে বিয়ে করবে?'

গন্নার মুখে সলজ্জ আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। সে হঠাৎ জুবেদার পায়ে পড়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আবুল, নীচু গলায় বলল, 'আপনার দয়ার সমুদ্রে আমি ভাসছি। যা বলবেন তাতেই রাজি। কিন্তু তার আগে একটি প্রশ্ন করতে চাই রানিকে।'

'কী প্রশ্ন করতে চাও, কর?' জুবেদা বলল।

'আপনি দয়া করে এই কোমল স্বভাবা মিষ্টি নামধারিণীকে জিজ্ঞাসা করুন আমার রুচির সাথে তার রুচি কি মেলে? আমি ভালোবাসি খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আর কবিতা। এখন উনিও যদি এসব ভালোবাসেন তাহলে মহানন্দে বিয়ে করতে পারি। আর তা না হলে বিয়ে না করেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চাই।' আবুল বলল।

রানি জুবেদা গন্নাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গন্না, তুমি তো আবুল হোসেনের কথা শুনেছ? বল তোমার কী মত?'

গন্না সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কাজিকে ডাকলেন। সাক্ষী দেওয়ার লোককেও ডেকে পাঠালেন। বিয়ের শর্তাবলি লেখানো হল। তিরিশ দিন ধরে রাজপ্রাসাদে আনন্দের উৎসব চলেছিল।

নব দম্পতি মহানন্দে দিন যাপন করছিল।

আবুল এবং গন্না সারাদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া আর নাচ-গানে মেতে থাকত। আবুলের হাতে যা টাকা-পয়সা ছিল তা জলের মতো খরচ হতে লাগল। হঠাৎ দেখল তার হাতে আর কানাকড়িও নেই। বাদশাহ রাজকাজে ডুবে থাকতেন। আবুলের মাসহারার কথা একদম ভুলে গিয়েছিলেন। আবুল এবার ধার দেনা করতে লাগল।

আবুল এবং গন্না ঋণের ভারে নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাদশাহের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে যায়নি। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া তাদের গ্রাস করল।

আবুল একদিন বলল, 'গন্না সব টাকাপয়সা তো আজেবাজে কাজে খরচ করে ফেলেছি। এবার একটা অন্য উপায়ের কথা ভাবছি।'

গন্না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'বল কোন উপায়ের কথা ভাবছ? পারলে আমিও সাহায্য করব। আমরা এখন কারও কাছে চাইতেও পারি না, নিজেদের চালচলনও বদলাতে পারি না।'

'না, ভাবছি একসাথে মরে গেলে কেমন হয়?' আবুল জিজ্ঞেস করল।

গন্না ভয়ে চমকে উঠে বলল, 'ওমা, না আমি মরব না। তুমি মরতে চাও মর, আমি তোমাকে সাহায্যও করব না।'

আবুল গন্নার কথা শুনে বিরক্ত হল না। শান্ত স্বরে বলল, 'আরে পাগলি, আমি যখন একা ছিলাম, তখনই জানতাম বেঁচে থাকাই জীবনের একমাত্র পথ। এ তো আমার জানা কথা। আর এখন, তোমাকে বিয়ে করার পরে, ভাবছি, আহা আমি একা একা কী সুখেই না ছিলাম! তোমার বুদ্ধি বড়ো মোটা। মরার কথা বলতেই ভয়ে কাপছ। ভুল বকচ্ছ। আমি ভেবে-চিন্তে একটা উপায়। বলতে যাচ্ছিলাম। আমি যেভাবে মরার কথা বলছিলাম সেটা শুনলে, তুমি খুব খুশি হতে। হেসে খুন হতে। মরা মানে সত্যি সত্যি মরে যাওয়া নয়। মরার অভিনয় ভালোভাবে করতে পারলে আমাদের মাথায় সোনার বৃষ্টি হবে।'

গন্না হেসে বলল, 'তা কী করে সম্ভব?'

'শোনো, আমার মারা যাবার পর আমাকে একটা ঘরে শুইয়ে দাও। যে-দিকে মক্কার কাবে আছে সেদিকে মাথা দিয়ে শোওয়াবে। আমার মাথার পাগড়ি আমার শরীরের উপর রেখে দেবে। তার পর বুক ফাটিয়ে কাঁদবে। কাপড় ছেড়ার, মাথার চুল ধরে কষে টানার অভিনয় করবে। এইসব করার পর তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তোমাকে ঘিরে অনেক লোক জমে যাবে, তখন তুমি কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো রানি জুবেদার কাছে ছুটে যাবে। ওখানে কাঁদতে কাঁদতে মুছা যাবে। জ্ঞান হবার পর আমার মৃত্যু সংবাদ দেবে। তারপর আবার মেঝেতে পড়ে যাবে। ওইভাবে পড়ে থাকবে। অনেক লোক জমে যাবে।

চারদিক থেকে লোক এসে সাহায্য করবে। আমার মৃতদেহ ঘিরে টাকাপয়সা পড়তে থাকবে। সোনার বৃষ্টি হবে।' আবুল হোসেন বলল।

'তুমি মরার অভিনয় করবে? তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি। তবে যে তুমি বললে এক সাথে মরতে হবে? আমি মরব কীভাবে?' গন্না জিজ্ঞেস করল।

'আরে ওসব আল্লার কাজ। তুমি কবে মরবে তা আমি কী করে বলব? নাও, তৈরি হও। এবার আমি মরছি। যা বললাম সব ঠিকমতো করবে। মরছি। মরে গেলাম।' আবুল শুয়ে পড়ল।

গন্না আবুল হোসেনের কাপড় খুলে নিয়ে মড়া ঢাকার কাপড় দিয়ে আবুলকে মুড়ে দিল। নিজের গায়ের কাপড় ছিড়ে মাথার চুল এলোমেলো করে পাগলের মতো ছুটে গেল রানি জুবেদার কাছে। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

গন্নার অবস্থা দেখেই রানি জুবেদা অনুমান করে নিলেন গন্নার নিশ্চয় কোনো বড়ো ধরণের বিপদ ঘটেছে। ততক্ষণে গন্না অজ্ঞান হয়ে গেল। রানি গন্নার মাথা নিজের কোলে রেখে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর অল্প অল্প জ্ঞান আসার পর থেমে থেমে গন্না জানাল যে তার স্বামীর কাল রাত্রে বদহজম হয়েছিল এবং সে মারা গেছে। এসব কথা বলে শেষে গন্না বলল, 'এখন মরণ ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথ নেই। আমি মরতে চাই। আল্লা, আমাকে মেরে ফেল। গন্না আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেখানে যেসব মেয়েরা জড় হয়েছিল তারা সবাই কাঁদতে লাগল। গন্না আর তার স্বামী আবুল হোসেন যে কত ভালো ছিল, কত আনন্দে ছিল, অন্যদের কত আনন্দ দিত প্রভৃতি কথা বলে সবাই কাঁদতে লাগল। তারপর গন্নাকে রীতি অনুসারে গোলাপ জলে স্নান করাল।

জুবেদা অনেকক্ষণ কাদলেন। তারপর নিজের খাজাঞ্চিকে ডেকে বললেন, 'আমার খাজানা থেকে দশ হাজার দিনার গন্নার ঘরে দিয়ে এসো। তার স্বামীর কাজকর্ম যেন ভালোভাবে করা হয়।'

খাজাঞ্চি দশ হাজার দিনারের থলি একজনের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে আবুল হোসেনের ঘরে পৌঁছে দিল।

তারপর জুবেদা গন্নার গলা জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, 'আল্লাহ তোমার দুঃখ দূর করুক! তুমি তোমার স্বামীর আয়ু নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাক!'

গন্না জুবেদার হাত দুটো নিয়ে নিজের চোখের জল মুছে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ঘরে ঢুকেই গন্না খুশির মেজাজে বলল, 'এই যে ও ভাড় মশাই, এবার উঠুন। যা রোজগার করার করা গেছে। এবার বেঁচে উঠুন।'

আবুল হোসেন ঢাকা কাপড় সরিয়ে উঠে পড়ল। গন্নার সাহায্যে আবুল ওই দিনারের থলি ঘরের মধ্যে টেনে আনল। ওই থলির চারিদিকে এক পায়ে কয়েক বার চক্কর কেটে নিল আবুল।

তারপর গন্নাকে অভিনন্দন জানিয়ে আবুল বলল, 'এখনও পুরো খেলা শেষ হয়নি। এবার তোমার পালা। এবার তোমাকে মরতে হবে। তবে তুমি যতটা নিপুণতার সাথে অভিনয় করে রানি জুবেদার কাছ থেকে এই দশ হাজার দিনার আনতে পারলে আমি বাদশাহের কাছে ততটা পাকা অভিনয় করতে পারব কি না সন্দেহ। তবু আমি বাদশাহকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে অভিনয় শুধু তিনি-ই পারেন না, অন্যেরাও পারে।'

'তারপর আর কী আবুল নিজেকে যে কাপড়ে গুটিয়ে রেখেছিল সেই কাপড়ে গন্নাকে জড়িয়ে দিল। আবুল কাঁদতে পারছে না। কী করবে। পেঁয়াজ চোখে ঘষে নিল। চোখ জলে ভরে গেল। নিজের গায়ের জামা ছিড়ে নিল। চুল এলোমেলো করে নিল। ছুটে গেল আবুল বাদশাহের কাছে।

যে আবুল হোসেনকে সবসময় হাসিখুশি দেখেন তার কান্নাকান্না ভাব দেখে বাদশাহ তো অবাক। কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন তিনি। বাদশাহ আবুলের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু হয়েছে কিনা। আবুল বুক চাপড়ে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'আহ, আমার গন্না!

আমাকে একি করলে!’ এ-কথা বলে জামা দিয়ে চোখ ঢেকে গলা কাঁপিয়ে কাপিয়ে কী যেন বলে কাঁদতে লাগল।

বাদশাহ বিচলিত হয়ে গন্নার মৃত্যুর কথা শোনার আশঙ্কা করলেন। নিজের চোখের জল মুছে বাদশাহ বললেন, 'ভাই, গন্না কি তাহলে..আর নেই।'

আবুল মাথা নেড়ে বাদশাহের কথায় সায় দিল। তারপর বাদশাহ বললেন, আল্লা তোমাকে গন্নার আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম সে তোমাকে আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে!’ বাদশাহের কাছে অন্য যারা ছিল তারাও কাঁদতে লাগল।

তারপর, বাদশাহ নিজের খাজাঞ্চিকে ডেকে বললেন, এই আবুলের সাথে দশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দাও। এ বেচারার বউ মরে গেছে। কাজকর্ম ভালোভাবে খরচ করে করতে দাও। খাজাঞ্চি দশ হাজার দিনার আনতে চলে গেল। আবুল বাদশাহের দুই হাতে নিজের সজল চোখ মুছে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরে এসে দেখে গন্না কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আবুল গন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, খুব তো ভেবেছিলে চোখের জল দেখিয়ে রোজগার করার কায়দা একমাত্র তুমি-ই জানো। একবার এই থলিটার দিকে তাকাও।' বলতে বলতে আবুল গন্নার কাপড় সরিয়ে আবার বলল, ওঠ। এখনও আমাদের খেলা শেষ হয়নি। এবার ভাবতে হবে অন্য কথা। রানি জুবেদা আর বাদশাহের রাগ তো হবে আমাদের উপর। তখন বাঁচব কী করে?’ তখন কী করতে হবে গন্নাকে আবুল বুঝিয়ে দিল।

বাদশাহ সেদিন দরবারের সবাইকে ফিরে যেতে বলে নিজে জুবেদার কাছে চলে গেলেন। জুবেদাও মনমরা ছিলেন। জুবেদা এমন সব কাণ্ড করছিলেন যেন বাদশাহ তার প্রিয়পাত্র আবুল হোসেনকে একেবারে হারিয়েছেন।

বাদশাহ সেই দুঃখের মধ্যেও হেসে মন শুরকে বললেন, 'রানি ভুল খবর পেয়েছেন। তার ভুল ভেঙে দাও।'

মনশুর রানি জুবেদাকে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারানি, আবুল হোসেনের কিছু হয়নি। দুঃখ পেলে যা হয় তাই হয়েছে। স্ত্রী মারা গেলে দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। বাদশাহ দশ হাজার দিনার গন্নার কাজের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জুবেদা বললেন, 'আমার খাজাঞ্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন আবুল হোসেনের শেষ কাজের জন্য খাজনা থেকে আমি কত দিনার দিয়েছি।'

বাদশাহ এবং বেগমের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। বাদশাহ বলছিলেন গন্না মারা গেছে আর বেগম বলছিলেন আবুল হোসেন মারা গেছে। শেষে বাদশাহ মনশুরকে আদেশ দিলেন, তুমি আবুল হোসেনের ঘরে গিয়ে দেখ তো কে মারা গেছে?'

গন্না মারা গেছে বলে বাদশাহ বেগমের সাথে বাজি রাখলেন।

আবুল হোসেন গন্নাকে বলল, 'গন্না, মনশুর! তুমি তাড়াতাড়ি মরে যাও।'

গন্না হাত-পা টান করে শুয়ে পড়ে রইল। চোখ-মুখ কাপড়ে ঢেকে পাশে বসে আবুল হোসেন কাদতে লাগল।

বাদশাহের কাছে গিয়ে মনশুর বলল, ‘বেগমেরই ভুল হয়েছে। আবুল হোসেন বেঁচে আছে। গন্নাই মারা গেছে।'

বাদশাহ খুশি হয়ে বললেন, ‘বেগম তুমি বাজিতে হেরে গেছ।'

বেগম জুবেদা অস্বীকার করে বললেন, ‘মনশুর মিথ্যা কথা বলতে পারে। লোক পাঠিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে গন্না বেঁচে আছে। আমার কথা সত্য প্রমাণিত হলে মনশুরের গলা কেটে ফেলতে হবে।'

আবুল অপেক্ষা করছিল এবার কে আসবে দেখার জন্য। জুবেদার দাসীকে দূর থেকে আসতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল, ‘গন্না, এবার আমি মরছি।'

দাসী যা দেখল বেগমকে তা বলল। তৎক্ষণাৎ বেগম জুবেদা জয়ী হওয়ার আনন্দে নেচে উঠে মনশুরের গলা কেটে দিতে বাদশাহকে বললেন।

‘মনশুরের কথা মিথ্যা হলে তো আমার কথাও মিথ্যা হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো হবে আমরা দুজনে একসাথে গিয়ে যদি দেখে আসি। তৈরি হও। যাওয়া যাক।' বাদশাহ বললেন।

দূর থেকে বাদশাহ ও বেগমসহ অনেককে দেখে আবুল বলল, ‘গন্না, এবার দু-জনকেই যে মরতে হবে।'

বেগম ও বাদশাহ আবুল হোসেনের ঘরে এসে দেখে দু-জনেই মরে আছে। বেগম জুবেদা বললেন, 'কিন্তু কে যে আগে মরেছে তা জানব কী করে? বাদশাহ বললেন, 'যে জানাবে তাকে আমি দশ হাজার দিনার উপহার দেব।'

'জাঁহাপনা আমাকে দিয়ে দিন। আমি আগে মরে ছিলাম।' ঢাকা কাপড় সরিয়ে আবুল বলল।

বেগম জুবেদা ও বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের সাথে আরও অনেকে এল। আবুল হোসেনের মনে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটবে তা আগে সাড়া দিয়েছিল।

মড়াকে কথা বলতে দেখে বেগম জুবেদা রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। ইতিমধ্যে বাদশাহ আসল ব্যাপার কী হতে পারে তা অনুমান করে বলে ওঠে, 'আবুল হোসেন, ঢের হয়েছে। এবার ওঠ। আর হাসতে পারছি না। এবার আমাকে মারা পড়তে হবে।'

বাদশাহের কথা শুনে উঠে আবুল বাদশাহের এবং গন্না জুবেদার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।।

আবুল হোসেন বাদশাহকে বলল, 'হুজুর, যতদিন অবিবাহিত ছিলাম ততদিন টাকার ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এই গন্না থলি থলি সোনা, খাজনা এবং খাজঞ্চিকেও গিলে ফেলবে।'

আবুলের কথা শুনে বাদশাহ ও বেগম আবুল ও গন্নাকে ক্ষমা করে প্রত্যেককে আরও দশ হাজার করে দিনার দিলেন।

আর কোনোদিন আবুলের যাতে অসুবিধা না হয় তারজন্য জফরের সমান। বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর থেকে মহানন্দে তারা বাকি জীবন কাটিয়ে দিল।

২২. গণপতি ভট্ট

একগ্রামে গণপতি ভট্ট নামে এক ভাট ছিল। ভাটের কাজ ছিল ধনীদের তোষামোদ করে, গুণগান করে উপহার সংগ্রহ করা। তাতেই সে পেট চালাত। এই পেশায় সে ছিল নিপুণ। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে সে সবার মন জয় করতে পারত।

সেই গ্রামে এক ছিল জমিদার। জমিদার বাড়িতে যেকোনো কাজ হলে সে হাজির হত এবং তাদের বংশের গুণগান করে কবিতা রচনা করে পাঠ করত। কিন্তু সেই জমিদার ছিল হাড় কিপটে। তাই সে সামান্য কিছু গণপতির হাতে গুঁজে দিয়ে ভবিষ্যতের কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাকিটা পুষিয়ে দেওয়ার কথা বলত।

জমিদারের মুখে এক কথা বার বার শুনে গণপতি মনে মনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল বটে কিন্তু সে সাত-পাঁচ ভেবে ওই জমিদারকে ছেড়ে অন্য কোনো জমিদারের কাছে গেল না।

তার মনের কোণে আশা ছিল একদিন না একদিন ওই জমিদারের কাছ থেকে সে ভালো কিছু উপহার পাবে। এই আশাতেই সে ওই গ্রামেই রয়ে গেল।

ভাটের মনে জমিদারের কাছ থেকে এক দুধালো মোষ আদায় করার ইচ্ছে ছিল। ভাটের বাড়ির লোক দুধ এবং দই খাওয়ার আশায় দিন গুনছিল।

ঠিক সেইসময়ে জমিদারের বড়ো ছেলের বিয়ে ঠিক হল। বিয়ে দারুণ খরচা করে ধুমধামসে করা হল। দূর দূর থেকে বহু গণ্যমান্য এবং ধনী ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল সেই অনুষ্ঠানে। গণপতিও যথারীতি হাজির হল সেই অনুষ্ঠানে। বর-বধূকে আশীর্বাদ করে সে কয়েকটি চমৎকার কবিতা রচনা করে পাঠ করে শোনাল। সেই কবিতাবলি জমিদারের গুণকীর্তন আর যশগাথায় ভরা ছিল। উপস্থিত সবাই সেই কবিতাবলি শুনে ভাটকে খুব প্রশংসা করল।

জমিদার ভাবল, এইবার ভাটকে একটা ভালো কিছু উপহার দিতেই হবে। সে গণপতি ভট্টকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা ভালো কিছু দেব ভাবছি। কী দেব, টাকা না জিনিস?'

'আমাকে দয়া করে একটা দুধালো মোষ দিলে খুব ভালো হয়।' গণপতি ভট্ট জবাবে বলল।

'ঠিক আছে, তাই দেব।' এই কথা বলে জমিদার চাকরকে ডেকে তার কানে কী যেন বলল। চাকর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে এক মোষ এনে দুরে দাঁড় করিয়ে রাখল।

সেই মোষ দেখে গণপতি ভট্ট হতাশ হল। এক বুড়ি মোষ। কোনোদিন তার বাচ্চা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। অতএব, তার কাছ থেকে দুধ পাওয়ারও আশা নেই। উলটে তাকে দু-বেলা খাওয়াতেই তাকে ফতুর হতে হবে।

কিন্তু গণপতি ভট্ট অত লোকের মধ্যে সে-কথা জমিদারকে মুখ ফুটে বলে কী করে। তাই, সে ভাবতে লাগল কেমন করে বলবে। কিছুতেই সেই মোষ নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। সাত-পাঁচ ভেবে সোজা মোষের কাছে গিয়ে ভট্ট তার কানে কানে কিছু বলার এবং মোষের মুখের কাছে কান রেখে কিছু শোনার অভিনয় করল। ভাটের ওই ধরনের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই বিস্মিত হল।

'গণপতি ভট্ট, কী করছ তুমি?' জমিদার জিজ্ঞেস করল।

গণপতি সবিনয়ে হাত জোড় করে জমিদারকে বলল, 'আজ্ঞে, আমি মোষটাকে একটা প্রশ্ন করেছি। মোষ আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।'

'তুমি মোষকে কী প্রশ্ন করেছ? আর মোষ তোমাকে কী জবাব দিয়েছে?'

জমিদার ভট্টকে প্রশ্ন করল।
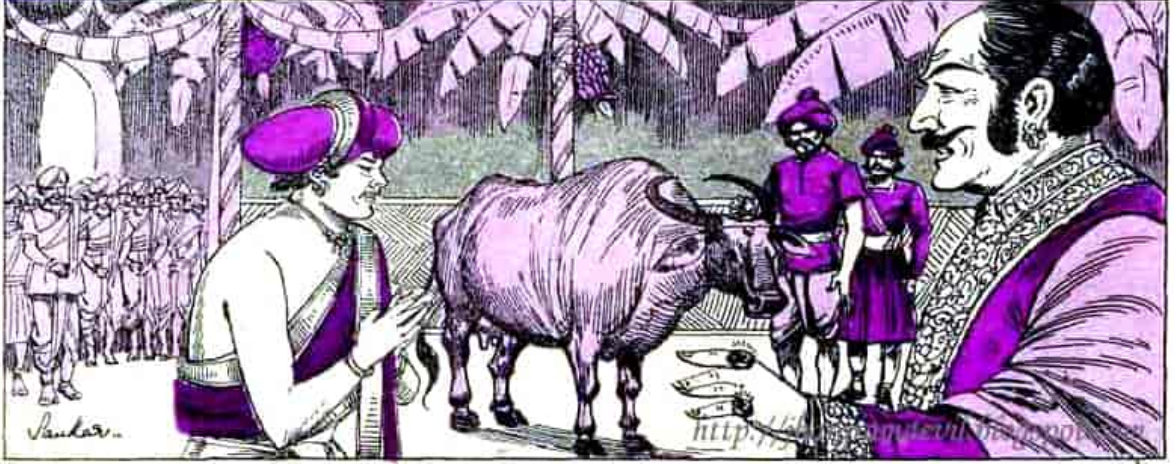
ভট্ট জবাবে বলল, "আজ্ঞে, আমি মোষটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি বাচ্চা দেবে? তোমার দুধ পাব কোন দিন? মোষ আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'সে যুগে আমি মহিষাসুরের পত্নী ছিলাম। আদি শক্তি আমার পতিকে বধ করেছিলেন। কিন্তু আমার মরণ হল না। তারপর, ত্রেতা যুগ এল। মানুষ। সব বদলে গেল। পশুপাখিও বদলে গেল। কিন্তু আমি বদলাইনি। আমি চোখের সামনে দেখেছি রাবণের জন্ম ও মৃত্যু। আমি এই পোড়া চোখে অনেক কিছু দেখেছি। দুনিয়ার উপর বিরক্তি জেগেছিল। এখন কলিযুগের পালা। এখন আমি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। আমার এই অবস্থায় তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমার বাচ্চা হবে কি না? আমাকে এই প্রশ্ন করতে তোমার লজ্জা করল না?' এই জবাবটাই মোষ আমাকে দিল, বাবু।

ভট্টের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। সবাই বুঝতে পারল জমিদার গণপতিকে কী ধরনের মোষ দিয়েছে। জমিদারও ভাবল তক্ষুনি একটা ব্যবস্থা না করলে তার মানসম্মান কিছুই আর থাকবে না। সে তৎক্ষণাৎ ওই চাকরকে ধমক দিয়ে ভালো দুধালো মোষ আনিয়ে গণপতি ভট্টকে উপহার দিল।

২৩. যার কাজ তারে সাজে

এক গ্রামে গুরুদাস নামে এক কিষান ছিল। সে খেতখামারের কাজের পর অবসর সময় ব্যাবসাও করত। গুরুদাসের রামনাথ এবং শংকরদাস নামে দুই ছেলে ছিল। রামনাথ বাবাকে খেতের কাজে সাহায্য করত। ছোটো ছেলে শংকরদাস দোকানের কাজকর্ম দেখত। ছেলেরা বড়ো হলে গুরুদাস ওদের বিয়ে দিল। রামনাথের বউ এবং শংকরদাসের বউ-এর মধ্যে ঝগড়া বেধে যেত।

একদিন রামনাথের স্ত্রী শংকরদাসের স্ত্রীকে বলল, 'আমার কর্তা সাত সকালে উঠে খেতে গিয়ে রোদে বৃষ্টিতে ফসল ফলায়। তাতেই তো বাড়ির সবাই খেতে পায়। আর তোমার কর্তা আরামে দোকানে বসে থাকে। বসে থাকার কাজ যেকোনো লোক করতে পারে।'

নিজের স্বামীর ব্যাপারে এরকম উপেক্ষার মনোভাব দেখে ছোটো বউ সহ্য করতে না পেরে রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'দোকানের কাজে বুদ্ধি খরচ করতে হয়। বুঝলে! তাই বলদের মতো খেতের কাজ করেন।'

সেই দিন রাত্রে দুই বউ নিজের নিজের স্বামীকে যা ঘটল তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তিলকে তাল করে বলল। শুনে দুই ভাইয়ের পৌরুষ জেগে উঠল।

পরের দিন রামনাথ শংকরদাসকে বলল, 'হ্যাঁরে, শুনলাম, কাল বউমা আমার কাজ সম্পর্কে ঠাট্টা করেছে। বউমাকে বকে দিস তো।'

‘আমি শুনলাম, তোমার বউমা তেমন কিছুই বলেনি, বউদিই নাকি যা মুখে এসেছে তাই বলেছে।' ছোটো ভাই শংকরদাস বলল।

‘তোমার বউদি যা সত্য তাই বলেছে।' রামনাথ নিজের স্ত্রীকে সমর্থন করল।

শংকরদাসও নিজের স্ত্রীকে সমর্থন করল। কথার পিঠে কথা উঠল।

ছেলেদের এভাবে ঝগড়া করতে দেখে গুরুদাস ওদের কাছে ডেকে বলল, ‘বাপধনেরা, ঝগড়া করছিস কেন? ‘

'বাবা, আপনি তো ছোটো ভাইকে আদরে আরামে দোকানে বসার কাজ দিয়েছেন, আর আমাকে খেতে এত কাজ করতে হয় যে খাটতে খাটতে জিব বেরিয়ে যায়। আমি আর খেতের কাজ করতে পারব না।' রামনাথ বলল।
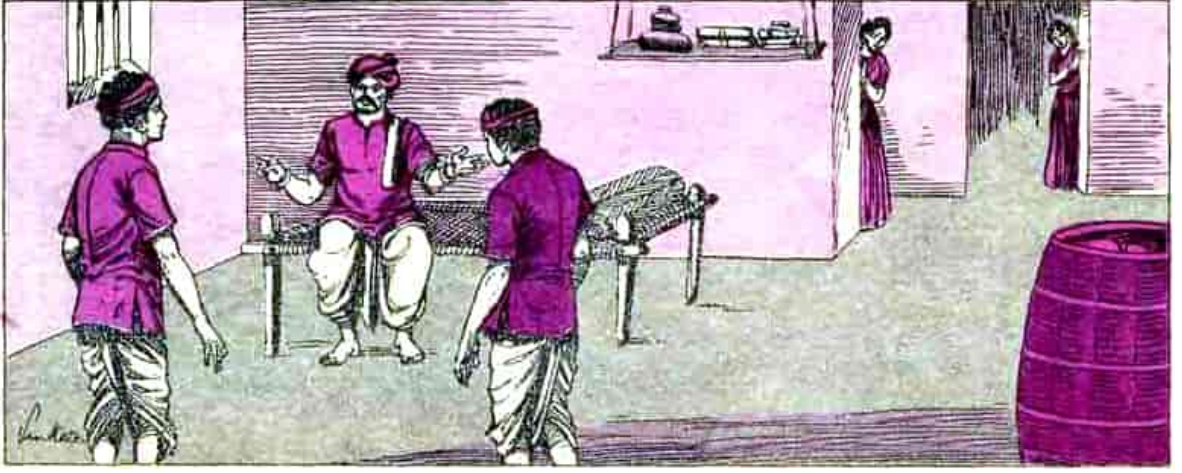
'শংকরদাস, এবার তোমার কথা বল।' গুরুদাস ছোটো ছেলেকে বলল।

'দাদাকে বছরে মাত্র চার মাস খেতের কাজ করতে হয় আর আমাকে সারা বছর দোকানের কাজ দেখতে হয়। আমার আর এ-কাজ করতে ইচ্ছে করছে না।' শংকরদাস বলল।

গুরুদাস কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'রামনাথ আজ থেকে তুমি খেতের কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকানের কাজ দেখ, আর শংকর তুমি খেতের কাজ কর।'

রামনাথ দোকানে বসল। কিন্তু কিছু হিসেব জানে না বলে সে কাজে মেজাজ পাচ্ছিল না। শংকরদাস খেতে তো গেল কিন্তু কিছুক্ষণ কাজ করতেই ক্লান্ত হয়ে গেল। সারাদিন কোনোরকমে সামলে উঠে সন্ধ্যায় তাদের দুজনের মনে হল তারা যেন সারাদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই শংকরদাস বাবাকে বলল, 'বাবা কাল থেকে আমি দোকানের কাজই দেখাশোনা করব।' ঠিক একইভাবে রামনাথও খেতের কাজই করতে চাইল।

সেই রাত্রে দুই বউ নিজের নিজের স্বামীকে বলল, 'ছি, ছি! আবার সেই একঘেয়ে কাজ করতে চাইলে।'

কিন্তু এবার আর স্ত্রীর কথায় কেউ কান দিল না। উপরন্তু তাদের বকল। পরের দিন থেকে যার কাজ সে করতে লাগল।

২৪. ন্যায়যুদ্ধ

একগ্রামে জগদীশ নামে এক ধনী লোক ছিল। সে ছিল সুদের কারবারী। সোনার গহনা বন্ধক না রেখে সে কাউকে ধার দিত না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ না করলে সে ওই সোনার গহনা ফেরত দিত না। ফলে ওই গহনা তার স্ত্রীর গায়ে উঠত।

সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থের হঠাৎ অনেক টাকার দরকার হয়। সে জগদীশের কাছে। হিরের হার বন্ধক রেখে দু-হাজার টাকা ধার নেয়। কিন্তু ধার শোধ করার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হঠাৎ লোকটা মারা গেল। তার জোয়ান ছেলে সুদ সহ আসল সতেরো-আঠারো-শো টাকা শোধ করল। কঠিন পরিশ্রম করে, আরও রোজগার করে, যুবক জগদীশকে তার প্রাপ্য টাকা দিয়ে হিরের হার ফেরত নিতে চাইল।

‘সময় পেরিয়ে গেছে। আমি ওই হার কোনোক্রমেই ফেরত দিতে পারব না।' জগদীশ বলল।

দু-হাজার টাকার দামি হার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে যুবকের মনে ভীষণ রাগ হল। সে গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে নালিশ করল। কিন্তু সব কথা শুনে মোড়ল বলল, 'আমি কী করতে পারি? তোমার বাবা যেভাবে লেখাপড়া করে গেছেন সেইভাবেই কাজ হয়েছে। জগদীশের ঘরে সিঁধ না কেটে বোধ হয় তোমার ওই হার ফেরত পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই।'

মোড়ল হেসে হেসে বললেও কথাটা যুবকের কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে সোজা মনে গেঁথে গেল। সুযোগের অপেক্ষায় যুবক ওত পেতে জগদীশের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল।

একদিন সকালে জগদীশের সুদের তাগাদা দিতে বেরুনোর মুখে তার স্ত্রী জোরে জোরে বলল, 'হ্যাঁগা, হিরের হারের একটা হিরা ঢিলে হয়ে গেছে। যেকোনো সময় পড়ে যেতে পারে। ওটাকে ভালো করে বসাতে স্যাকরাকে দিয়ে এসো না।'

‘চরণদাস স্যাকরাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে জগদীশ বেরিয়ে গেল।

এই কথা ওই যুবক আড়ি পেতে শুনল। যুবকটি বাড়ি গিয়ে তার এক বিশ্বাসী বন্ধুকে ডেকে সমস্ত ব্যাপার গোপনে বলে দু -ঘণ্টা পরে তাকে সুদখোর জগদীশের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।
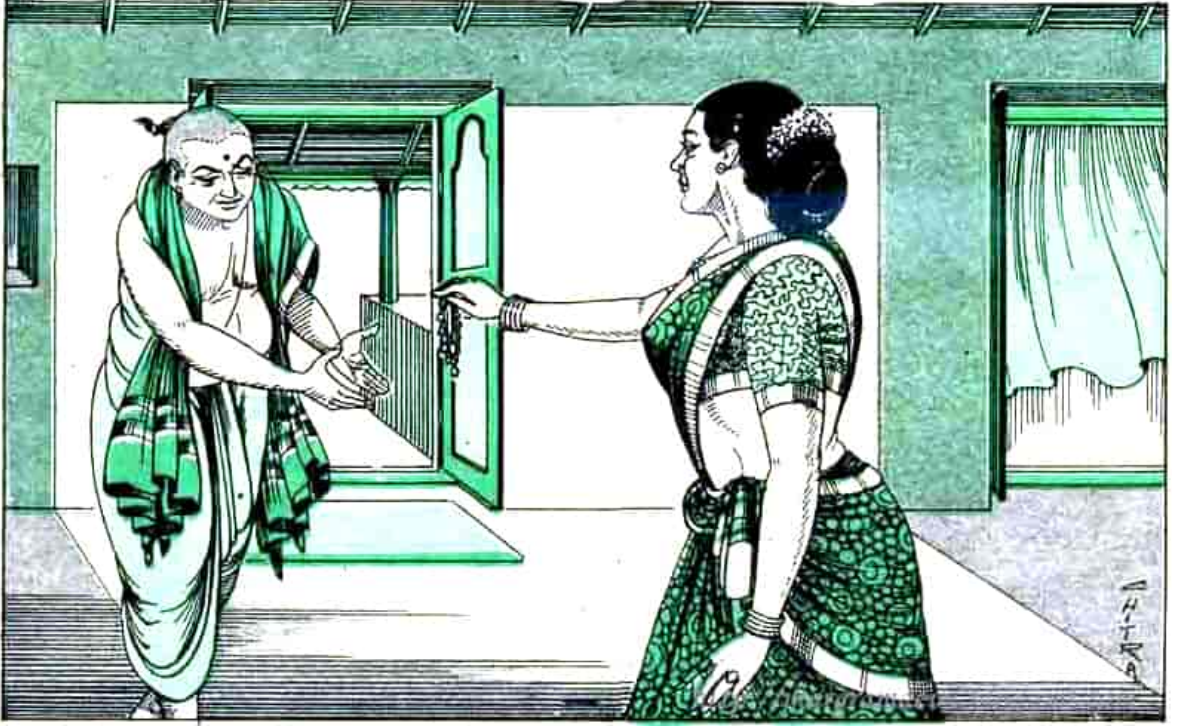
যুবকের বন্ধু সোজা জগদীশের বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়ল। জগদীশের স্ত্রী দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে, তুমি? কী ব্যাপার?'

'আমি তো আপনাদের চরণদাস স্যাকরা, বাবু পাঠিয়েছেন। হিরের হারের একটা হিরে নাকি নড়ছে, বসাতে হবে?' আগন্তুক বলল।

'হ্যাঁ। এত দেরি করলে কেন? বাবু তোমাকে এখন পাঠালেন ?' জগদীশের স্ত্রী বলল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবু তাড়াতাড়ি সারিয়ে দিতে বললেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিয়ে আনছি।' বলে লোকটা হিরের হার নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই হার গৃহস্থের ছেলের হাতে পৌঁছে গেল।

সন্ধ্যার সময় জগদীশের বাড়ি ফেরার পর তার স্ত্রী বলল, 'আচ্ছা লোককে হার সারাতে বললে। আধ ঘণ্টায় সারিয়ে দেব বলে এখনও তার পাত্তা নেই।'

'হিরের হার! ও-হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। এখন মনে পড়েছে। আরে, তাগাদার ঝামেলায় পড়ে আমি চরণদাসকে বলতেই ভুলে গেছি। তা তুমি কার কথা বলছ?' জগদীশ অবাক হয়ে বলল।

তারপর যখন স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনল তখন তার মনে হল পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

জগদীশ পরিষ্কার বুঝতে পারলে, এ নিশ্চয় কোনো ধোকাবাজের কাজ।

জগদীশ তাড়াতাড়ি মোড়লের কাছে গিয়ে ওই হার চুরি যাওয়ার খবর দিয়ে বলল, 'আপনি দয়া করে এক্ষুনি ঢাক পিটিয়ে দিন। যে আমার এই হার ফেরত দেবে অথবা ফেরত পাইয়ে দেবে তাকে আমি চার-শো টাকা পুরস্কার দেব।'
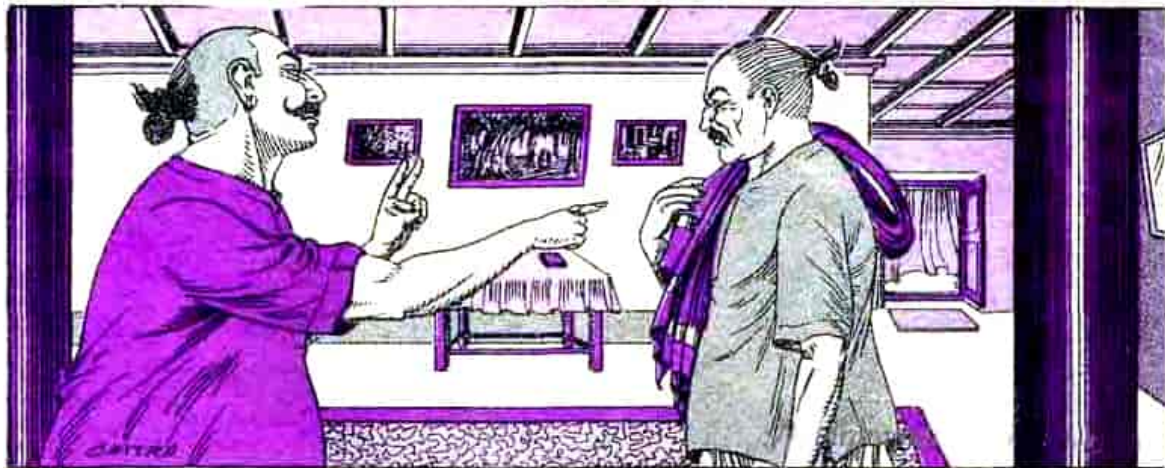
'জগদীশ বাবু, ধারের টাকার মধ্যে সুদ সমেত চার পাঁচশো টাকা ঠিক সময়ের মধ্যে দিতে পারেনি বলে আপনি কিছুতেই সেই হার ফেরত দিলেন না। এখন ঢাক পিটিয়ে চার-পাঁচশো টাকার কথা বললে লোকে কী বলবে? হার চুরি গেছে এতে আপনার আর কী ক্ষতি হয়েছে। যার হার গেল তার অনেক আগেই গেল।' মোড়ল বলল।

মোড়লের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে জগদীশ বাড়ি ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থের ছেলে জগদীশের কাছে গিয়ে বলল, 'জগদীশবাবু, এই নিন আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা। হারের চোর আমার হাতে ধরা পড়েছে। আমার হার আমি ফেরত পেয়েছি। আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি যে আমার হার আমি ফেরত পেলাম। নিন টাকা, আপনিও লিখে দিন টাকা বুঝে পেয়েছেন।'

নিরুপায় হয়ে জগদীশ সেই যুবককে পুরো টাকা বুঝে পাওয়ার রসিদ লিখে দিল এবং যুবকও রসিদ লিখে দিল হার ফেরত পাওয়ার।

২৫. বুদ্ধির দৌড়

প্রাচীন কালে গ্রিক দেশে এক দম্পতি বাস করত। তাদের অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। একদিন বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে বলল, 'টাকাপয়সার ভীষণ অভাব পড়ে গেছে। এদিকে আমার পায়ে ব্যথা। হাঁটতে পারছি না। তুমি গোরুটাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে এসো।' বুড়ি গোরুটাকে নিয়ে হাটের পথে চলল। অন্যদিকে তিনটে চোর ওই গোরুটাকে কম দামে কেনার তাল করল।

ওই তিন জনের একজন চোর বুড়ির কাছে এসে বলল, 'দিদিমা, তুমি এই ছাগলটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? বেচবে নাকি? কত তে বেচবে?’

'পাজি, তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস ? গোরুটাকে ছাগল দেখছিস?’ বুড়ি ধমক দিয়ে এগিয়ে গেল।

চোর বলল, ‘দিদিমা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ছাগলকে একেবারে গোরু বানিয়ে ফেলেছ। হাটে যাচ্ছ কেন? আমি তিরিশ মুদ্রা দিচ্ছি, আমার কাছে বিক্রি করে দাও।'

বুড়ি চোরের পিঠে একটা লাঠির বাড়ি মেরে নিজের পথে এগিয়ে যায়।

কিছু দূর যাওয়ার পর দ্বিতীয় চোর বুড়িকে বলল, 'ঠাকুমা, চললে কোথায়?’

‘হাটে যাচ্ছি বাবা, তোর ঠাকুরদা এটাকে বিক্রি করে আসতে বলেছে।'

বুড়ি জবাবে বলল।

‘বেশ তো পঁচিশ মুদ্রায় আমি কিনে নিচ্ছি। আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' দ্বিতীয় চোর বলল।

‘তোর মাথা খারাপ হয়নি তো। এত ভালো গোরুটাকে ছাগলের দামে কিনতে চাইছিস।' বুড়ি ধমক দিল।

দ্বিতীয় চোর অবাক হওয়ার অভিনয় করে বলল, 'ঠাকুমা তোমার চোখে ঠিক পর্দা পড়েছে। তাই ঝাপসা দেখছ। তা না হলে ছাগলকে গোরু বলতে না।'

‘বেশ। আমি চোখে ঝাপসা দেখছি। যাও, আমি বেচব না।' বুড়ি রেগে গিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু তার মনে খটকা লাগল। সে তো গোরু নিয়ে বেরিয়ে ছিল কিন্তু এখন তো একে একে সবাই ছাগল বলছে! কী ব্যাপার! এসব কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ি এগোচ্ছে

এমন সময় তৃতীয় চোর হাজির হয়ে বলল, 'আরে মাইমা, ছাগলটাকে বিক্রি করতে যাচ্ছ নাকি? তা আমার কাছে বিক্রি কর না। কুড়িটা মুদ্রা দেব।'

'তোর কথা শুনে তো বাবা আমার অবাক লাগছে। একজন বলছে তিরিশ মুদ্রা, আর একজন পঁচিশ মুদ্রা, যাক তুই তিরিশ মুদ্রা দে, বিক্রি করে দেব।' বুড়ি বলল।

'মাইমা, অন্য লোক হলে দিতাম না। শুধু তুমি বলে দিচ্ছি। নাও তিরিশ মুদ্রা।' তৃতীয় চোর বলল।

বুড়ি শেষে গোরুটাকে ছাগলের দামে বিক্রি করে বাড়ি ফিরে স্বামীকে সব কথা বলল। বুড়ো অনুমানে বুঝল যে অন্য পাড়ার ছেলেরা বুড়িকে ঠকিয়েছে। সে বুড়িকে বলল, 'যাক যা হওয়ার তা হয়েছে। ও নিয়ে আর ভেব না। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে দাও।'

বুড়ো একদিন জঙ্গলে গিয়ে এক রকমের দুটো খরগোশ ধরে আনল। দুটো খরগোশ আলাদা ঝুড়িতে রেখে বুড়িকে বলল, 'শোনো, আমি একটু বেরোচ্ছি। আজ আমাদের বাড়িতে আত্মীয়দের আসার কথা আছে। তুমি মধুমাখা রুটি, পায়েস আর হাঁসের কষা মাংস বেঁধে রেখো। বাড়ি ফিরে আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, কী বেঁধেছ, তুমি চটপট বলবে, খরগোশ যা রাঁধতে বলেছ তাই বেঁধেছি, ব্যাস এর বেশি অন্য কোনো কথা বলবে না।' এ-কথা বলে বুড়ো বাড়ি থেকে বেরুল।

বুড়ো যখন অন্য গ্রামে গেল তখন ওই তিন জন চোর মদ খেয়ে টলতে টলতে তার দিকেই আসছিল। তারা বুড়োকে দেখে বলল, 'আরে এই বুড়ো। তোমার বউটা যেন কেমন, কোনটা গোরু আর কোনটা ছাগল তাও চেনে না।'

'দুর দুর ওইটাকে নিয়ে আমিও আর পারছি না। শুধু একটা গুণ আছে। ভালো রাঁধতে পারে' বুড়ো বলল।

'তাহলে তো ভালোই।' চোর বলল।

বুড়ো যেন ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল এমন অভিনয় করল। বলল, 'ভাবছি, আজকে কী রান্না করতে বলব। আমার তো ইচ্ছা করছে পায়েস খেতে। আর তার সাথে খেতে চাই হাঁসের কষা মাংস, মধুমাখা রুটি।' এ-কথা বলে বুড়ো ঝুড়ি থেকে খারগোশকে বের করে ওটাকে বলল, 'এই শোন, তোর মাকে গিয়ে বল, পায়েস, হাঁসের কষা মাংস আর মধুমাখা রুটি রাঁধতে।' বলে খরগোশকে ওই বুড়ো ছেড়ে দিল। সেটা দু-লাফে পালাল।

'আরে, এ তো এক বিচিত্র ব্যাপার। তুমি যা বললে এই খরগোশটা কি সত্যি সত্যি বাড়িতে গিয়ে বলবে?' চোরগুলো জিজ্ঞেস করল।

'কেন বলবে না। এতটুকু থেকে এই খরগোশটাকে পুষেছি, কেন শুনবে না। তোমাদের বিশ্বাস না হলে চল আমার সাথে, তোমরাও খেয়ে আসবে।'
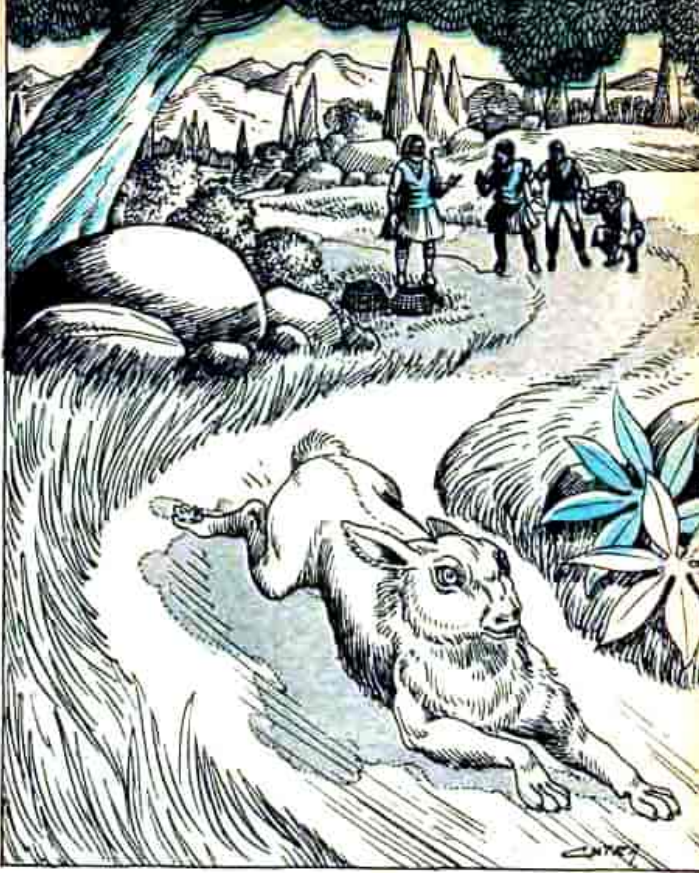
ওই তিন জন চোর বুড়োর সাথে তার বাড়িতে এল। বুড়ো বউকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী রান্না করলে?'

'খরগোশ যা রাঁধতে বলেছে তাই রান্না করেছি।' বলল ওই বুড়ি। তারপর বুড়ি ওই চারজনকে একসাথে খেতে দিল। বুড়ো যা বলেছিল বুড়ি ঠিক তাই রান্না করায় চোরগুলো নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলাবলি করল। তারপর ওই খরগোশকে কিনতে চাইল?

'খরগোশ বিক্রি করব? না না তা পারব না।' বুড়ো বলল। চোরগুলো দশ হাজার মুদ্রায় কিনতে চাইল।

'বেচারা ওরা যখন অত করে কিনতে চাইছে, দাও না বিক্রি করে। অভাব অভাব বলছিলেন না?' বুড়ি বলল।

'আরে আমাদের সুন্দর গোরুটাই যখন ছাগলে বদলে গেল তখন এই খরগোশটাও যদি বদলে যায় ?' বুড়ো বলল।

চোরগুলো নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে একসাথে বলল, 'না না এটা বদলাবে না। আমরা চোখে চোখে রাখব। সে দায়িত্ব আমাদের।'

দশ হাজার মুদ্রায় বুড়ো তার দ্বিতীয় খরগোশটাকে চোরদের কাছে বিক্রি করে দিল।

চোরগুলো বলাবলি করল, 'আচ্ছা, এক কাজ করি। বাড়িতে যাওয়ার আগে আমাদের সকলের বাড়িতে বউদের কাছে কী কী রাঁধতে হবে খবর পাঠিয়ে দিই।'

এ-কথা বলে প্রত্যেক চোর নিজের নিজের বাড়িতে বউ-এর কাছে খবর পাঠিয়ে দিল।

প্রত্যেক চোর নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে বুঝল যে খরগোশ কোনো খবরই পৌঁছে দেয়নি। তখন ওরা বুঝল যে বুড়ো তাদের ঠকিয়েছে। ওরা মনে মনে বুড়োকে গালাগালি দিল।

বুড়োর কাছে চোরগুলো গিয়ে তাকে যা-তা বলল। বুড়ো ওদের গালাগাল শুনে বলল, 'খরগোশকে খবর দিয়ে পাঠানোর আগে তার পিঠে হাত বুলিয়েছ?'

চোরগুলো জানাল যে ওরকম কিছু করেনি।

'তাহলে আর কী। খরগোশ নিশ্চয় একমুঠো বাতাস হয়ে হাওয়ায় মিশে গেছে।' বুড়ো বলল।

'খরগোশ আবার হাওয়ায় মিশে যাবে কেন? পাগলের মতো কেন কথা বলছ?'

'অতবড়ো গোরু যদি ছাগল হয়ে যায়, এতটুকু খরগোশ একমুঠো হাওয়া হতে পারে না?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো তাদের প্রতি বদলা নিয়েছে বুঝে ওরা মাথা নীচু করে চলে গেল।

২৬. অজানা পণ্ডিত

চীন দেশে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে হত। আজ থেকে কয়েক শতক আগে এক গাঁয়ের পণ্ডিত তার নাম পাওয়ে স্বান, পরীক্ষা দিতে রাজধানীর দিকে রওনা হল। পথে আর এক যুবক-পণ্ডিতের সাথে তার দেখা।

সেই যুবকের একটা অসুখ ছিল। তাই পাওয়ে স্বান তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু যুবক হঠাৎ একদিন দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

পাওয়ে সেই যুবকের নামও জানত না। সেই যুবকের কাছে ছিল দশটি রুপার মুদ্রা এবং এক তাড়া কাগজ। পাওয়ে ওই কাগজ দিয়ে শব ঢাকল। একটা রুপোর মুদ্রা দিয়ে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করল এবং বাকি নটা রুপার মুদ্রা যুবকের মাথার নীচে রেখে শবটিকে বাক্সে পুরে মাটিতে পুঁতে দিল।

সেই পণ্ডিতের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে পাওয়ে বলল, 'তুমি তো মারা গেলে, তবু বলছি, পার তো তোমার বাড়ির লোককে খবর দিও। আমি জরুরি কাজে যাচ্ছি। এ ছাড়া আমি তোমার আর কী সাহায্য করতে পারি।'

পাওয়ে রাজধানী পৌঁছাল। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে সে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হল।

পাওয়ে যখন রাজধানীতে ছিল তখন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা ঘোড়া পাওয়ের কাছে এল। সেই ঘোড়া কিছুতেই পাওয়েকে ছাড়ছিল না। নিরুপায় হয়ে পাওয়ে ওই ঘোড়াটাকে নিজের ঘোড়ার মতো ব্যবহার ও দেখাশোনা করতে লাগল।

কিছুদিন পরে পাওয়ে বাড়ি ফিরতে রওনা হল। অনেক দূর যাওয়ার পর এক জায়গায় রাত হয়ে গেল। কাছেই এক বড়ো লোকের বাড়ি ছিল। পাওয়ে ভাবল ওই বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালে আবার রওনা দেবে। ঘোড়া থেকে নেমে একটা কাগজে লিখে ওই বাড়ির চাকরের হাতে দিয়ে পাওয়ে বলল, ‘তোমার বাবুকে বল, আমি তার সাথে একটু দেখা করতে চাই।'

চাকর ভেতরে গিয়ে মালিকের হাতে ওই কাগজটি দিয়ে বলল, 'হুজুর, এই লোকটা আমাদের ঘোড়াটাকে নিয়ে গেছে।'

মালিক কাগজের টুকরোতে 'পাওয়ে স্বান' লেখা দেখে চাকরকে বলল, 'ইনি তো নাম করা পণ্ডিত। কোনো বিশেষ খবর আছে নিশ্চয়। তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

পাওয়ে ভেতরে এলে মালিক তাকে বলল, 'আমি এই ঘোড়াটাকে গত বছর হারিয়েছিলাম। আপনি এটাকে কোথায় পেলেন?'

পাওয়ে গোড়া থেকে তার কথা শুরু করে বলল, 'আমি রাজধানী যাওয়ার পথে এক যুবক-পণ্ডিতের দেখা পেয়েছিলাম। বেচারার বুকের দোষ ছিল, যখন-তখন তার বুক ধড়ফড় করত। বেচারা ওই রোগেই মারা গেল।' এইভাবে সব কথা পাওয়ে বলে যেতে লাগল। বাড়ির মালিক হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই যুবক আমারই ছেলে হবে।'

পরের দিন সকালে বাড়ির মালিক পাওয়েকে নিয়ে ওই যুবককে যেখানে পোঁতা হয়েছিল সেখানে গেল। তারপর বাক্সের শবদেহ দেখে বাড়ির মালিক ছেলেকে চিনতে পারল।

তার ছেলের প্রতি পাওয়ে যে দরদ দেখিয়েছে তাতে ওই মালিক খুশি হল। সোজা সে রাজার কাছে গিয়ে পাওয়েকে যাতে ভালো চাকরি দেওয়া হয় তারজন্য চেষ্টা করল। পাওয়েকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হল। পাওয়ের বিচারক হিসেবে খুব নামযশ হল।

২৭. অমৃত

দ্বাপর যুগে উত্তর কুরু ভূমিতে ভৃঙ্গীরস নামে এক সাধারণ গৃহস্থ ছিল। তার মনে অমৃত পান করে অমর হওয়ার একটা ইচ্ছা প্রবলভাবে জেগেছিল।

এই ইচ্ছা পুরণের জন্য ভৃঙ্গীরস গন্ধমাদন পর্বতে গেল। সেখানে দেবতারা ঘুরে বেড়াত। সিদ্ধদের সাথে সেইখানেই তার পরিচয় হল।

ভৃঙ্গীরস তাদের জিজ্ঞেস করল, 'অমৃত পাওয়ার উপায় কী?'

'অমৃত পাওয়ার একমাত্র উপায় তপস্যা। তপস্যা করেও অনেক সময় অমৃত পাওয়া যায় না। তুমি চাও তো আমাদের কাছে যেসব সিদ্ধ বিদ্যা রয়েছে তা শেখাতে পারি।' সিদ্ধরা বলল।

ভৃঙ্গীরস তাদের কাছ থেকে সিদ্ধ বিদ্যা শিখে নিল। তারপর দেবতাদের সেই ভ্রমণ স্থান ছেড়ে ভৃঙ্গীরস বনে চলে গেল। সেখানে বসে তপস্যা করতে চাইল কিন্তু তা পারল না।

কারণ, জঙ্গলের বিভিন্ন আস্তানায় যেসব লোক ছিল তারা অচিরেই জানতে পারল যে ভৃঙ্গীরস বৈদ্য বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। তাই তারা দলে দলে ভৃঙ্গীরসের কাছে আসতে লাগল। ভৃঙ্গীরস কাউকে তেমন ওষুধ দিত না। তার মতে কিছু কিছু অসুখের মূলে আছে খারাপ অভ্যাস। জনে জনে ধরে ধরে অসুখটা যে কী তা বুঝত। এবং এক-এক জনকে এক-একটা খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলত। অনেকে ওর কথামতো বদ অভ্যাস ত্যাগ করে রোগমুক্ত হল। কিছু অসুখ প্রাণায়াম করিয়ে সারাল। কিছু লোকের অসুখ সারাল যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে।

এইভাবে ভৃঙ্গীরসের নাম ওই জঙ্গল থেকে ছড়াতে ছড়াতে নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কাতারে কাতারে লোক তার কাছে আসতে লাগল। ভৃঙ্গীরস তাদের বসার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করল। দেখতে দেখতে ভৃঙ্গীরসের বাসস্থানকে ঘিরে বন কেটে বসতি গড়ে উঠল।

অত লোক একত্রে থাকার ফলে তাদের শাসন করার দায়িত্বও নিতে হল ভৃঙ্গীরসকে। কিছু কিছু নিয়মকানুনও তৈরি করল। ক্রমশ নানা ধরনের দায়িত্ব ভৃঙ্গীরসের উপর পড়তে লাগল। শেষে একদিন ভাবল, এইভাবে লোকের সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে তার অমৃত প্রাপ্তির সাধনা পূর্ণ হবে না। তাই, সে। এইসব কাজ দেখাশোনার জন্য কিছু শক্ত সমর্থ যুবককে সিদ্ধ বিদ্যা শিখিয়ে ভৃঙ্গীরস একদিন গভীর রাত্রে সে নিজের হাতে গড়া সে অঞ্চল ত্যাগ করে চলে গেল। সাথে নিল চার জন শিষ্যকে।

ভৃঙ্গীরসের চলে যাওয়ার পর নানান লোকের মুখে নানান কথা শোনা গেল। কিছু লোক ভৃঙ্গীরসকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলল। অসুস্থ লোককে সেবা করবার জন্য মুনির বেশ ধরে ঈশ্বর এসেছেন। নিজের কাজ শেষ করেই উনি চলে গেছেন। তারপর তারা ভৃঙ্গীরসের নামে একটা মন্দির নির্মাণ করে তাকে পূজা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভৃঙ্গীরস নিজের ওই চার জন শিষ্যকে নিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে লাগল। তারা পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে ঘুরে ভৃঙ্গীরস যেসব শেকড় আর পাতা দেখিয়ে দিয়েছিল সেগুলো জোগাড় করতে লাগল। ভৃঙ্গীরস তপস্যা বলে যে শক্তি অর্জন করেছিল তার জোরেই নিজের প্রয়োজন মতো লতাপাতা শেকড় জোগাড় করে নিত।

এইভাবে অনেক বছর তপস্যা এবং সাধনার ফলে, অনেক পরিশ্রমের পরে ভৃঙ্গীরস অমৃত পেল। কিন্তু তার মনে হল চার জন শিষ্য হয়তো এখন অমৃত পানের অযোগ্য। তাই সে ওই চার জন শিষ্যকে একটা পরীক্ষা নিতে চাইল। ভৃঙ্গীরস যে অমৃত পেল তা একটা মাটির পাত্রে রেখে সামনে নিয়ে বসল। চার জন শিষ্যকে ডেকে বলল, 'আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই জিনিস তৈরি করেছি। আমি জানি না এটা অমৃত না অন্য কিছু। তবে জানা যাবে একমাত্র এটা পান করার পর। ভাগ্য যদি আমার প্রসন্ন হয় তবে এটা অমৃত হবে আর তা না হলে হবে না।'

ভৃঙ্গীরস সেই মাটির পাত্রের জিনিস পান করে নীচে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে চার জন শিষ্য আশ্চর্য হয়ে গেল। দু-একজন শিষ্য বলল, 'আমাদের গুরু অমৃতের পরিবর্তে বিষ তৈরি করেছেন।'

কিন্তু কৃণু নামক একজন শিষ্য বলল, 'আমাদের গুরু মস্তবড়ো তাপস। বিনা কারণে উনি এই জিনিস পান করতে পারেন না।' সেই শিষ্যও ওই জিনিস একটু পান করে ধপ করে নীচে পড়ে গেল।

'এই জিনিস পান করে এত সকাল সকাল মরার চেয়ে আর চারজনের মতো সময় হলে মরা অনেক ভালো।' এই কথা বলে বাকি তিন জন শিষ্য সেখান থেকে সরে পড়ল।

তাদের চলে যাওয়ার পর ভৃঙ্গীরস কৃণুকে বলল, 'বাছা, আমরা দুজন মৃত্যুকে জয় করেছি। আমি এই পৃথিবীতে অনেক কাল বেঁচে আছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার শক্তি আমার অর্জিত হয়েছে। আমি স্বর্গে চলে যাব। তোমার বয়স অনেক কম। এই জীবনের প্রতি যতদিন না তোমার বিরক্তি জাগে ততদিন তুমি এখানে থাক। এই জীবনের প্রতি তোমার যখন বিরক্তি জাগবে তখন তুমিও আমার মতো সশরীরে স্বর্গে চলে এসো।' এই কথা বলে ভৃঙ্গীরস আকাশে উঠে চলে গেল।

কৃণু কয়েক হাজার বছর এই পৃথিবীতে ছিল। তারপর মানব সমাজ থেকে একদিন সশরীরে স্বর্গে চলে গেল।

২৮. ধোকাবাজ

এক শহরে দীনু নামে এক গরিব কাঠুরে ছিল। প্রত্যেক দিন কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে শহরে সেই কাঠ বিক্রি করত। এইভাবে তার পেট চলত।

একদিন বনে যাওয়ার পথে জঙ্গলে একটি কঙ্কণ পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সেটা দেখে দীনু ভাবল, বনদেবী আমাকে এই কঙ্কন উপহার দিয়েছেন। এই কঙ্কণ শহরে বিক্রি করে কিছুদিন ভালোভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারব। এই ভেবে, দীনু শহরে গেল ওই কঙ্কণ নিয়ে।

সে শহরের এক স্যাকরার কাছে গিয়ে তাকে বলল, 'বাবু, আজ সকালে এই কঙ্কণ কুড়িয়ে পেয়েছি। এটাকে নিয়ে, এর যা দাম হবে তা আমাকে দিন।'

জহুরি ভালোভাবে ওই কঙ্কণ দেখে কী যেন ভেবে বলল, ‘এর যা দাম হবে তা এখন আমার কাছে নেই। কাল এটাকে নিয়ে তুমি আবার এসো।

আমি এর যা দাম তা জোগাড় করে রাখব।' বলে কঙ্কণ তাকে ফেরত দিল।

দীনু ওই কঙ্কণ যত্ন করে ঘরে রেখে বনে চলে গেল কাঠ কাটতে।

এদিকে জহুরি রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল, 'দীনু নামে এক কাঠুরে আমার বাড়ি থেকে একটা কঙ্কণ চুরি করেছে। আমি ভালোভাবেই জানি, আমার কঙ্কণ ওর ঘরেই আছে। ওর ঘরে তলাশ করে দয়া করে আমাকে আমার কঙ্কণ পাইয়ে দিন।' রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের লোকজনকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন, তোমরা কাঠুরে দীনুকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

রাজার লোক দীনুর ঘর থেকে ফিরে এসে বলল, 'মহারাজ, দীনু ঘরে নেই। কাঠ কাটতে গেছে।'

‘রাজা জহুরিকে বললেন, জহুরি তুমি কাল সকালে এসো। কাঠুরে যে চুরি করেছে তা প্রমাণ করে তোমার কঙ্কণ তোমাকে দেব।'

নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক ঠিকভাবে কাজ হচ্ছে দেখে জহুরি মনে মনে ভীষণ খুশি হল। ভাবল ওই কঙ্কণ নিশ্চয় সে পাবে।

পরের দিন জহুরি রাজদরবারে এল। রাজা নিজের লোক পাঠিয়ে কঙ্কণ সহ দীনুকে ধরে আনতে বললেন। দীনু এলে রাজা বললেন, 'কি রে তুই জহুরির বাড়ি থেকে কঙ্কণ চুরি করেছিস?’

‘মহারাজ আমি এ কঙ্কণ চুরি করিনি। এটা আমি জঙ্গলে পেয়েছি। ভেবেছিলাম এটাকে বিক্রি করে দিন কয়েক ভালোভাবে খেয়ে-পরে বাঁচব। তাই আমি এই কঙ্কণ নিয়ে এই জহুরির কাছে বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। জহুরি আমাকে বলল, আমার কাছে এর যত দাম তত অর্থ নেই। কালকে এসো। পুরো দাম দেব। এ ছাড়া মহারাজ আমি আর কিছু জানি না।' কাঠুরে দীনু রাজাকে বলল।

‘মহারাজ, এই কাঠুরেটা যা বলছে সব ডাহা মিথ্যা।' জহুরি বলল।

মন্ত্রী দীনুর হাত থেকে কঙ্কণ নিয়ে রাজার হাতে দিল। রাজা সেই কঙ্কণ । দেখে চমকে উঠলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

আসল ব্যাপার হল, কিছুদিন আগে রাজা শিকার করতে বনে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজা ডান হাতের কঙ্কণ গভীর বনে হারিয়েছিলেন। অনেক খোঁজ করানো হল কিন্তু ওই কঙ্কণ আর পাওয়া গেল না। রাজা দেখতে পেলেন সেই হারানো কঙ্কণ। রাজা বুঝতে পারলেন, আসলে জহুরিই ধোকাবাজ। তবু, রাজার ইচ্ছা করল জহুরিকে পরীক্ষা করতে। রাজা তাকে ওই কঙ্কণ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যে কঙ্কণ হারিয়েছিলে এটাই কি সেটা?’

‘আজ্ঞে হ্যা, মহারাজ, এটাই আমার হারানো কঙ্কণ!’ এই কঙ্কণ পাবার আশায় জহুরি তৎক্ষণাৎ রাজাকে জবাবে বলল।

তক্ষনি মন্ত্রী জহুরিকে বলল, 'তুমি এই কঙ্কণের জোড়াটাও নিয়ে এসো।'

এই কথা কানে যেতেই জহুরির মাথায় যেন বাজ পড়ল। সাহস করে আস্তে আস্তে বলল, 'মহারাজ, এর জোড়া অনেক দিন আগে হারিয়ে গিয়েছে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই দীনুটাই হয়তো ওই কঙ্কণটাও চুরি করেছে।'

এ-কথায় দীনু ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে গরিবের উপর চুরির অপরাধ চাপানো খুব সহজ।'

রাজা হেসে বললেন, 'ওরে পাগল, এবারে তুমি চোর নও, আমিই চোর।'

এই কথা বলে রাজা নিজের বাঁ-হাতের কঙ্কণ সবাইকে দেখালেন।

জহুরির যেন দম বন্ধ হয়ে এল। রাজসভার সবাই আশ্চর্য হল।

তারপর রাজা সভার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন। আমি জঙ্গলে শিকার খেলতে গিয়ে নিজের ডান হাতের কঙ্কণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই কঙ্কণ এই দীনু কুড়িয়ে পেয়েছে। কঙ্কণটাকে নিয়ে দীনু জহুরির কাছে গেল বিক্রি করতে। জহুরি কঙ্কণ দেখেই মনে মনে ঠিক করল ওই কঙ্কণ সে হাতিয়ে নেবে। এই। দুবুদ্ধি তার মাথায় জাগল। দাম নেই বলে দীনুকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তারপর, আমার কাছে নালিশ করতে এল এই

জহুরি। দীনুর উপর অপরাধ চাপিয়ে কঙ্কণ হাতানোর তালে ছিল জহুরি। এখন সবাই বুঝতে পারছ তো কে চোর?'

এরপর রাজা জহুরিকে কঠোর শাস্তি দিলেন এবং নিজের হারানো কঙ্কণ ফেরত পাওয়ার আনন্দে দীনুকে পুরস্কার দিলেন।

২৯. যেমন রাজা তেমন প্রজা

বিজয়পুরের রাজা প্রজাদের নানান রকমের অত্যাচার করত। প্রজাদের উপর সে অনেক রকমের কর বসিয়েছিল। কোনো শিল্পীকে কাছে ঘেঁষতে দিত না।

রাজসভায় একদিন রাজা বলল, 'আচ্ছা, তোমরা বল তো, আমার শাসন ভালো, না আমার বাবার শাসন অথবা আমার ঠাকুরদার শাসন ভালো?'

রাজসভার প্রত্যেকে বুঝল যে রাজার এই প্রশ্নের জবাবে যাই বলা হোক-না-কেন, রাজা সেই জবাবে কোনোক্রমেই খুশি হবে না, অধিকন্তু জবাব যে দেবে তার জীবন বিপন্ন হবে। একজনের শাসন ভালো বললে অন্যের শাসন কেন খারাপ তা রাজা জানতে চাইবে। এই কথা ভেবে সভার । প্রত্যেকে একে অন্যের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

মন্ত্রী সভার এই অবস্থা দেখে বিপদের আশঙ্কা করে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আপনার সভায় যারা আছেন তারা শুধু আপনার শাসনকাল ছাড়া অন্য কারো শাসনকাল দেখেনি। তাই, আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া এদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

এই কথা সত্য ভেবে রাজ মন্ত্রীকে বলল, 'তাহলে এমন লোক খুঁজে বের করা হোক যে আমাদের তিন জনের শাসনকাল দেখেছে।'

বেরিয়ে পড়ল রাজার লোকজন। পথে বুড়োদের দেখলেই প্রশ্ন করত, 'এই বুড়ো, তুমি রাজার ঠাকুরদার শাসন দেখেছ?' সভায় যা হল তা সারা দেশে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই, প্রত্যেক বুড়ো এই ধরনের প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে বলে উঠল, 'আমি দেখিনি। এই ধরনের কথা শুনে রাজার লোক ভাবল, একজনকেও না নিয়ে গেলে তারা আর প্রাণে বাঁচবে না।

গোটা দেশ ঘুরে শেষে ওরা এল এক পানওয়ালার কাছে। সেই পানের দোকানদারও বুড়ো হওয়ায় ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, রাজার ঠাকুরদাকে চেনেন?'

পানওয়ালা বেশ মেজাজে বলল, আমি রাজার ঠাকুরদাকে চিনব না কেন? আমাদের একদিনে এক শিক্ষকের কাছে হাতে খড়ি হয়েছে।'

তাহলে আপনি নিশ্চয় রাজার বাবার শাসনকালেও ছিলেন, চলুন আমাদের সাথে।' বলল রাজার লোক।

'কেন, যেতে হবে কেন?' পানওয়ালা জিজ্ঞেস করল।

রাজার লোক সব কথা বলল। পানওয়ালা মনে মনে ভয় পেয়ে ঠাকুরের নাম করতে করতে ওদের সাথে গেল।

রাজা এর আগে যে প্রশ্ন করেছিল সেই প্রশ্ন পানওয়ালাকেও করল।

'মহারাজ, আমি পান সাজতে পারি, রাজনীতির কী বুঝি! তবু, আপনার ঠাকুরদার আমল থেকে আপনার আমল পর্যন্ত আমার মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, যেভাবে হয়েছে, তা জানাচ্ছি। আমি যা বলব তা শুনে আপনি ঠিক করবেন কার আমলের শাসন ভালো।' পানওয়ালা বলল।

কী সেই পরিবর্তন, জানাও।' রাজা জিজ্ঞেস করল।

পানওয়ালা বলল, 'মহারাজ, আপনার ঠাকুরদার আমলে আমাদের বাড়ির সামনে এক বুড়ো এবং তার এক নাতনি ছিল। একদিন সেই বুড়ো আমাকে ডেকে বলল, 'বাবা, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। বড়ো ইচ্ছে ছিল, আমার এই নাতনির বিয়ে আমি নিজের হাতে দেব, কিন্তু আমার কপালে নেই। আমার এই নাতনির বিয়ের জন্য আমি দু-হাজার মুদ্রা জমিয়ে রেখেছি। ওর বিয়ে এই মুদ্রা খরচ করে দেওয়ার ভার তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।' বুড়ো আমার হাতে দু-হাজার মুদ্রা রেখে মারা গেল।

'বুড়োর কাছে কথা দিয়েছিলাম। অনেক দেশ ঘুরে ভালো পাত্র দেখে বুড়োর নাতনির সাথে বিয়ে দিলাম। দু-হাজার মুদ্রা বুড়োর নাতনিকে দিলাম।

'তারপর, অনেক বছর কেটে গেল। আপনার ঠাকুরদা স্বর্গে গেলেন। আপনার বাবার শাসনকাল শুরু হল। সেই সময় বুড়োর নাতনিকে দেখলাম একদিন আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে মনে বলে উঠেছিলাম, কী বোকার মতো কাজ করেছি। আমার কাছে যে বুড়ো দু-হাজার মুদ্রা দিয়েছিল তা তার নাতনি জানত না। তাই ভাবলাম সেই মুদ্রা না দিলেই বা কে জানত? আমার ভীষণ দুঃখ হল!
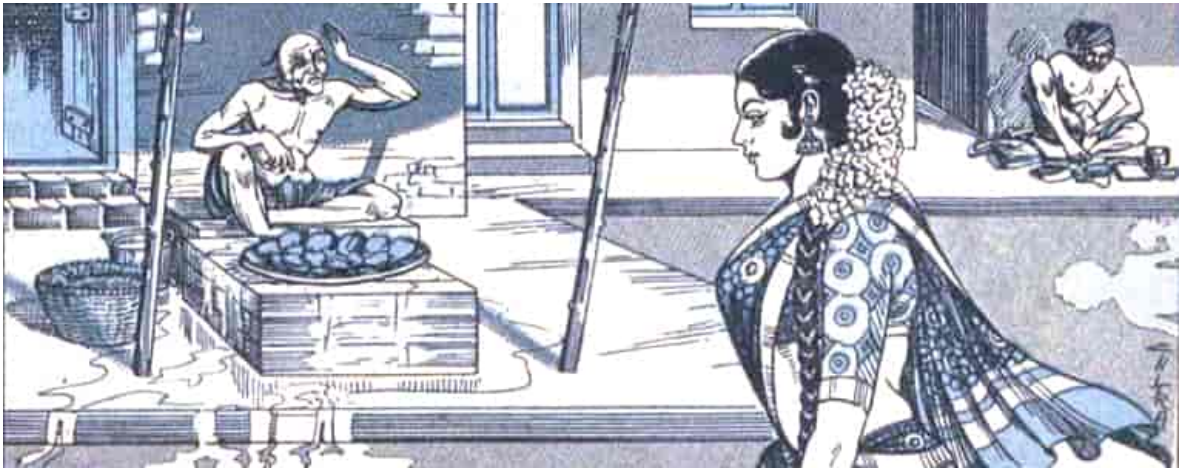
‘এই সেদিন আবার ওই বুড়োর নাতনিকে দেখতে পেলাম, এবারে বোকামির জন্য আরও দুঃখ হল। আমি কী বোকা ছিলাম। তা না হলে সোজা ওই বুড়োর নাতনিকে বিয়ে করে নিলে ওর সব কিছুই তো একেবারে আমার হয়ে যেত!’ এইভাবে পানওয়ালা তার মনের পরিবর্তনের কথা জানাল।

এই কথা শুনে রাজা খুব খুশি হয়ে সেই পানওয়ালাকে এক-শো মুদ্রা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। রাজা ভাবল, তার বাবার আমলে পানওয়ালার বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে আর তার নিজের আমলে বুদ্ধি পূর্ণরূপ পেয়েছে।

কিন্তু রাজার সভার সবাই সেই রাজার মুখতার পরিচয় পেয়ে মনে মনে হাসল। ওরা ভাবল, এই রাজার ঠাকুরদা ধর্মাত্মা ছিলেন, তাই তাঁর আমলে লোকের মনে কোনোরকম অধর্ম কাজ করার কথা জাগত না। এই রাজার বাবা তত খারাপ লোক না হলেও ধনের লালসা তাঁর ভীষণ ছিল, তাই প্রজারাও সেইভাবে লোভী ছিল। আর এই রাজার আমলে ধনলোভ যে শুধু বেড়েছে তাই নয় ধর্মকর্মও একেবারে লোপ পেয়েছে।

৩০. যার ভাগ্যে যা

এক গ্রামে এক কিষান ছিল। তার কাছে তিন একর অনুর্বর জমি ছিল। সেই কিষানের রাম এবং সোম নামে দুই ছেলে ছিল। রাম ছিল কুটিল আর সোম ছিল সরল। কিষান ভাবল বড়ো ছেলে রাম কুঁড়ে, তাই তাকে দু-একর জমি

আর সোমকে দিল এক একর জমি।

বাবা যেভাবে জমি ভাগ করে দিল ছেলেরা তাই মেনে নিল। রাম বেশি জমি পেয়ে মনে মনে খুশি। সোম ভাবল বাবা যে তাকে কম জমি দিয়েছে তার পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।

কিছুদিন পরে কিষান মারা গেল। দুই ভাই যে-যার জমির কাজ করতে লাগল। রাম দুই একর জমির কাজ একা করতে পারবে না। তাই এমনি সোমের কাছে সাহায্য চাইলে সোমকেও সাহায্য করতে হবে তার জমির কাজে। অনেক ভেবে রাম এক ফন্দি আঁটল।

একদিন রাম নিজের ছোটো ভাই সোমকে বলল, 'ভাই, বাবা আমাকে একবার একটা কথা গোপনে বলেছিলেন। উনি আমাকে যে দু-একর জমি দিয়েছেন তাতে নাকি অনেক ধন পোঁতা আছে। তাই, ভাবছি আমরা দুজনে এই দু-একর জমি ভালোভাবে খুঁড়ে ওই ধন মাটি থেকে তুলে দুজনে বণ্টন করে নিই।'

ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের এই কথা মেনে নিল। দুজনে মিলে ওই দু-একর জমি ভালোভাবে খুঁড়ল। কিন্তু কোনো ধন পেল না।

বড়ো ভাই জানত যে ওই খেতে কোনো ধন নেই, তাই খোঁড়া শেষ হতেই সে ছোটো ভাইকে বলল, ভাই, আমাদের কপালে নেই, তাই ধন পাইনি।'

'তুমি তো বললে, বাবা বলেছেন, ধন মাটিতে পোঁতা আছে।' ছোটো ভাই বলল।

'পোঁতা ছিল। হয়তো চোর নিয়ে গেছে।' বড়ো ভাই রাম বলল।

বড়ো ভাইয়ের বলার ঢং দেখে সোম অবাক হয়ে বলল, 'বাবা আমাকে যে জমি দিয়েছেন হয়তো সেই জমিতে ধন পোঁতা আছে! সেটাও খুঁড়ে দেখলে হত।'

দু-জনে কথা বলছে এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা দুজনে মিলেই খেতের কাজ করবে নাকি?'

'একটা ব্যাপার আছে। আমার বাবা দাদাকে বলেছিলেন যে তাকে দেওয়া জমিতে ধন পোঁতা আছে। সেই ধনের খোঁজে আমরা দুজনে সমস্ত খেতের মাটি খুঁড়েছিলাম। যা পেতাম দু-জনে ভাগ করে নিতাম। আমি এখন ভাবছি, কে জানে, বাবা হয়তো ভুলে আমার জমিতেই পুঁতে রেখেছেন। তাই দাদাকে বলছিলাম, এসো, আমার জমিটাও দু-জনে খুঁড়ে দেখে নিই।' সোম বলল।

'আরে সোম, শোন, তোর জমিতে যে ধন উঠবে তার ভাগ আমি চাই না , তুমি একা খোঁড়। যা পাবে তুমিই নাও।' রাম বলল।

রামের কথা শুনে মোড়ল বুঝতে পারল যে রাম ছোটো ভাইকে খাটিয়ে নিয়েছে।

অগত্যা সোম একাই নিজের খেতের মাটি খুঁড়তে লাগল। লাঙ্গল চালায় আর খোঁড়ে। ফলায় কী যেন ঠেকল। সোম কোদাল দিয়ে খুঁড়ে, মাটির গভীর থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করল। সেই বাক্স খুলে দেখল সোনার গয়না ভরতি।

অত গয়না দেখে রামের চোখ কপালে ঠেকল। মুখ শুকিয়ে গেল। রাম ভাবল, আহা, আমি যদি একটু হাত লাগাতাম তাহলে অর্ধেক গয়না পেতাম।

সোম ওই বাক্স থেকে ভালো ভালো ভারী ওজনের চারটে গয়না বের করে দাদাকে দিল।

সোমের এই উদার মনের পরিচয় পেয়ে গাঁয়ের লোক তার প্রশংসা করল।

৩১. কলিযুগ

কোনো এক সময়ে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণের সাথে এক বণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ কাশী যাবে ঠিক করল। তার কাছে ছিল এক দামি হিরা। সে ওই হিরা বণিক বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, 'বন্ধু, এই হিরাটাকে তুমি তোমার কাছে রাখ। কাশী থেকে ফিরে আমি এটা বিক্রি করে সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।' এ-কথা বলে বণিকের কাছে হিরা জমা রেখে সে চলে গেল কাশী।

ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে কাশী পোঁছাল। কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের দর্শন করে সেই ব্রাহ্মণ দু-বছর বাদে নিজের গ্রামে ফিরল।

পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণ বণিক বন্ধুর কাছে গিয়ে ওই হিরা ফেরত চাইল।

বণিকটি এমনভাব করল যেন হিরা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সে বোকার মতো হাবভাব দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'কীসের হিরে ভাই? তুমি আমাকে হিরে দিলে? কবে? কোথায়? কেন?'

ব্রাহ্মণের রাগ হল। সে ওই বণিক বন্ধুটিকে সোজা রাজার কাছে নিয়ে গেল।

বণিক রাজাকে বলল, 'মহারাজ, এই গরিব ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলছেন। ইনি নাকি আমাকে হিরে রাখতে দিয়েছেন।'

রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'তুমি হিরা দিয়েছ শপথ কর।'

তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ সাথে আনা নিজের ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমি শপথ করে বলছি, আমি এই বণিকের হাতে একটি হিরা রাখতে দিয়েছি।'

ব্রাহ্মণের মুখ থেকে কথাগুলো বেরুতেই ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেল।

তা দেখে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ছি, ছি, ব্রাহ্মণ, তুমি এত বড়ো মিথ্যা কথা বললে। বেচারা বণিককে চোর বানালে! মিথ্যা কথা না বললে কখনো ছেলে মারা যায় ? যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

ব্রাহ্মণের ভীষণ দুঃখ হল। সত্যি কথা বলা সত্ত্বেও ছেলে মারা গেল! মনের দুঃখে সে ছেলের শব নিয়ে শ্মশানে গেল।

এই সব কিছু লক্ষ করছিলেন যিনি সেই ধর্মরাজ এক বৃদ্ধের রূপ ধরে ব্রাহ্মণের কাছে এসে বললেন, 'বাবা, তোমার এত দুঃখ কেন? এই ছেলেটা মারা গেল কী করে?' ব্রাহ্মণ ওই বৃদ্ধকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

'ব্রাহ্মণ, তুমি আস্ত পাগল! তোমার কাশী যাত্রা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কলিযুগ শুরু হয়েছে। কলিযুগে ধর্ম এক পায়ে চলে। এইজন্য তুমি সত্যি কথা বলে ধোকা খেয়েছ। তুমি আবার রাজার কাছে যাও। তোমার এই ছেলের মাথায় হাত রেখেই মিথ্যা কথা বল। তখন দেখবে তুমি ঠিক ন্যায় বিচার পাবে।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সব বুঝিয়ে বলল। তারপর, সেই ব্রাহ্মণ নিজের ছেলের শব নিয়ে আবার রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। তাই আমার ছেলে মারা গেল। এখন আমার ছেলের মাথায় হাত রেখে সত্য কথা বলছি। আমার বণিক বন্ধুটিকে একটা নয় দুটো হিরা রাখতে দিয়েছিলাম।'

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হতেই ছেলে বেঁচে উঠল। রাজা ব্রাহ্মণের কথা এবার বিশ্বাস করলেন। রাজা ওই বণিককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'পাজি বণিক, ব্রাহ্মণ তোমার কাছে যে দুটো হিরা রাখতে দিয়েছিল সেগুলো ফেরত দাও।'

বণিক বলল, 'মহারাজ, এ লোকটা আমাকে একটাই হিরে দিয়েছিল।'

তারপর ব্রাহ্মণ রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নিজের হিরা ফেরত নিল। রাজা ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন এবং বণিককে তিরস্কার করে কারাগারে পুরলেন।

৩২. পরামর্শ

একবার প্রসাদ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত এক রাজার দরবারে গেল। নিজের পাণ্ডিত্য দেখিয়ে সে রাজার কাছ থেকে অনেক সোনা-রুপা উপহার পেয়ে আনন্দে সে গ্রামের দিকে চলল। পথে তার দাদার গ্রাম পড়ে। তাই প্রসাদ শাস্ত্রী ভাবল দাদার বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দেবে।

প্রসাদ শাস্ত্রীর দাদা শিব শাস্ত্রী পণ্ডিত হিসেবে তেমন নাম করেনি। অনেক কষ্টে নিজের পরিবারের লোকজনকে সে খাওয়াতে পারত। ছোটো ভাই প্রসাদের হাতে এত সোনা-রুপার উপহার দেখে তার ভীষণ ঈর্ষা জাগল। রাত্রে প্রসাদ শাস্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ল শিবশাস্ত্রী ওই সোনা-রুপা ভরা পুটলি নিয়ে সরিয়ে রাখল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রসাদ শাস্ত্রী দেখে তার পুটলি নেই। সে দাদাকে এ-ব্যাপারে জানাল।

'এ তো বড়ো অন্যায় কথা। তাহলে, চোর হয়তো এসেছিল রাত্রে। ছি ছি এ তো বড়ো বিচ্ছিরি ব্যাপার।' শিবশাস্ত্রী এক নিশ্বাসে বলে গেল।

প্রসাদ শাস্ত্রী কী করা উচিত ভেবে নিল। তার মনে সন্দেহ হল তার দাদাই চরি করেছে। কিন্তু নিজের দাদাকে চোর বলতে তার ইচ্ছে করছিল না। তাই সে ভেবে-চিন্তে ওই গ্রামের মাতব্বরের কাছে গেল। এমন একটা উপায় বের করতে বলল, যাতে দাদাকে চোর না বলে জিনিস ফেরত পাওয়া যায়।

ওই গ্রামের মাতব্বরটি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক ছিল। ভেবে, প্রসাদ শাস্ত্রীকে সে একটা পরামর্শ দিল। সেই পরামর্শ প্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে ভালো লাগল।

কিছুক্ষণ পরে মাতব্বরের দু-জন লোক প্রসাদ শাস্ত্রীর হাতে দড়ি বেঁধে শিব শাস্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল। ভাইয়ের ওই অবস্থা দেখে শিব শাস্ত্রী ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারল না তার ভাই এমন কোন অপরাধ করেছে। প্রসাদ শাস্ত্রী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন লজ্জায় দাদার সামনে মাথা তুলতে পারছে না।
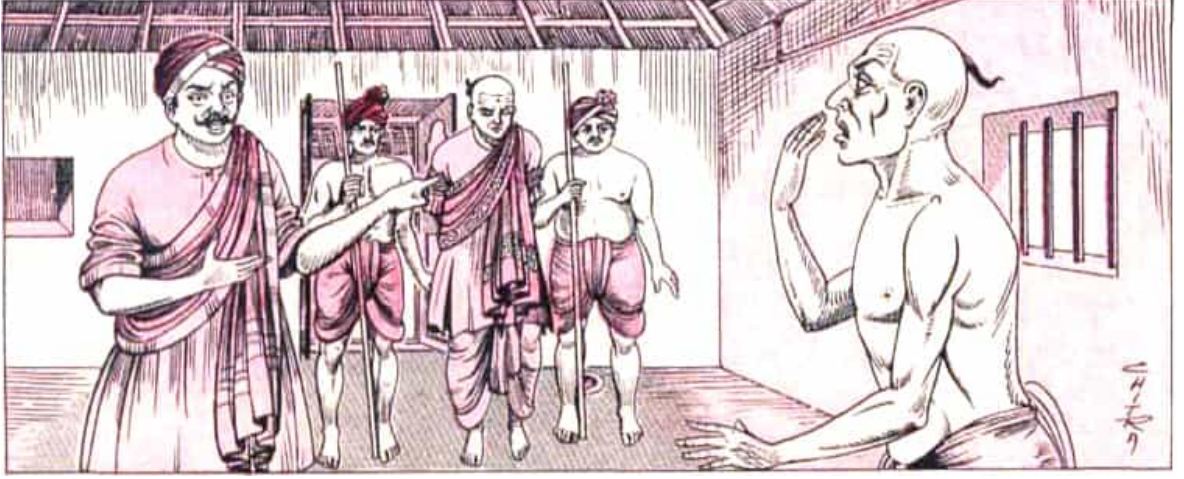
মাতব্বর শিবশাস্ত্রীকে বলল, 'শুনুন, শাস্ত্রী মশাই, আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনার ভাই এই ধরনের কাজ করবে। জানলাম যে আপনার ছোটো ভাই রাজধানী থেকে অনেক সোনা-রুপা চুরি করে এনেছে। আমি এই প্রমাণও পেয়েছি যে সে সোজা রাজধানী থেকে এই গ্রামে এসেছে। গতরাত্রে নাকি সে আপনার বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল। তাই আমার ধারণা আপনার বাড়িতেই কোনো জায়গায় সোনা-রুপা লুকিয়ে রেখেছে। আমরা তদন্ত করে দেখতে চাই। এ-কাজ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়।'

তারপর প্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে মাতব্বর চলে গেল। সেখানে রেখে গেল অন্য যারা এসেছিল তাদের। যাওয়ার সময় বলে গেল যে, সে আরও লোক পাঠাচ্ছে তদন্তের কাজ করার জন্য।

মাতব্বরের ফেরার আগে শিব শাস্ত্রী ওই সোনা-রুপার পুঁটলি লুকানো জায়গা থেকে বের করে প্রসাদ শাস্ত্রী যেখানে রাত্রে ঘুমিয়ে ছিল সেখানে রেখে দিল।

মাতব্বরের লোক, পরে তদন্ত করে ওই সোনা-রুপার পুঁটলি বের করে নিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ শাস্ত্রী সেই পুটলি নিয়ে দাদা শিব শাস্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, 'তোমাদের গ্রামের মাতব্বরের একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি নির্দোষ। রাজার কাছ থেকে আমি যে এসব উপহার হিসেবে পেয়েছি সে-কথা মাতব্বর জানত না। এখন চলি।' এ-কথা বলে সে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল।

৩৩. পতিব্রতা

আমিনিয়া দেশে এক বেকার লোকের বউ ছিল বড়ো সুন্দরী। সে লোকটা একদিন তার বউকে বলল, 'আমি অন্য দেশে গিয়ে চাকরি করব। টাকাপয়সা রোজগার করে ফিরব।' তার বউ ছেলে-মেয়েকে দেখাশোনার ভার নিজের ছোটো ভাইয়ের উপর চাপিয়ে সে চলে গেল। নানান দেশ ঘুরে চাকরি জোগাড় করতে লাগল।

তার বউ খুব ভালো মহিলা। সে নিজের ঠাকুরপোকে রান্না করে ভালোভাবে খাওয়াত। ঠাকুরপোর কুনজর পড়ল তার বউদির উপর। কিন্তু তার বউদি ছিল পতিব্রতা।

তিন বছর পরে সে বিদেশ থেকে খবর পাঠাল যে সে চাকরি করে অনেক টাকাপয়সা রোজগার করেছে। এবার সে বাড়ি ফিরছে। যেদিন তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল সেদিন ছোটো ভাই গাঁয়ের সীমানায় গেল দাদার সাথে দেখা করতে।

'কী রে ভালো আছিস? তোর বউদি আর কাচ্চা-বাচ্চারা ভালো আছে?' ছোটো ভাইকে জিজ্ঞেস করল সে।।

'বউদির কথা আর জিজ্ঞেস কর না। লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে। ক্রমশ টের পাবে।' ছোটো ভাই দাদার কাছে নালিশ করল বউদির বিরুদ্ধে।

দুই ভাই বাড়িতে পা রাখল। বউ এত বছর পর স্বামীর মুখ দেখে ভীষণ খুশি হল। স্বামীর পা ধুয়ে দিল। সেবা করল। কিন্তু তার স্বামী কোনো কথা বলল না। ওরা যখন খেতে বসল তখন তাদের বাড়ির উপর ইট পড়তে লাগল। কারা যেন ইট ছুঁড়ছে। ছেলেরা তার বাড়ির উপর ইট ছুঁড়ছে দেখে মনে মনে ছোটো ভাই খুশি হল। পরক্ষণে বাইরে এসে যারা ইট ছুঁড়ছিল তাদের ছোটো ভাই বকে তাড়িয়ে দিল।

স্বামীর মুখে কোনো কথা নেই দেখে বউ মনে মনে বড়ো দুঃখ পেল। সে ভাবল, স্বামী হয়তো তত টাকা রোজগার করতে পারেনি। কিছুদিন ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকল সেই স্বামী। তারপর একদিন বউকে বনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ওই বনেই বউ-এর মৃতদেহ ফেলে রেখে ফিরে গেল স্বামী।

তুর্কির এক ব্যাবসাদার নিজের সাথীদের নিয়ে ওই পথ দিয়ে যেতে যেতে সেখানে একটি ঝরনা দেখতে পেল। সেই রাস্তা দিয়ে ওই ব্যাবসাদার আরও বহু বার যাতায়াত করেছে কিন্তু এর আগে কোনোদিন ওখানে ঝরনা দেখতে পায়নি। সেদিন ওই ঝরনার পাশে একটি মহিলার মৃতদেহ দেখতে পেল। তুর্কি ব্যাবসাদার ভাবল, কোনো চরিত্রহীন-বউকে হয়তো তার স্বামী মেরে ফেলে গেছে।

ওই ব্যাবসাদারের লোকজন উনানা ধরিয়ে রান্না করা শুরু করল। তাদের কাছে শুধু শুটকিমাছ ছিল। ঝরনার জল এনে তাতে শুঁটকীমাছ ঢালতেই মাছগুলো বেঁচে উঠে জলে সাঁতার কাটতে লাগল।

তারা ভাবল, তাহলে তো এই ঝরনার জলের অনেক গুণ আছে। মরা মাছ বেঁচে উঠছে! ওরা সেই জল এনে ওই মহিলার মৃতদেহের উপর ছিটিয়ে দিল। সাথে সাথে মৃতদেহ বেঁচে উঠল।

ব্যাবসাদার যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। মহিলা কাঁদতে কাঁদতে নিজের কাহিনি শোনাল। ব্যাবসাদার বলল, 'আমি অবিবাহিত, আমাকে বিয়ে করে চল আমার বাড়ি।'

'আমি তো বিবাহিতা!' মহিলা বলল। ব্যাবসাদার অনেক রকমের কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলেও মহিলা তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। সে বলল যে লোকটা তাকে হত্যা করেছে সেই তার স্বামী। অন্য কোনো লোককে সে স্বামী হিসেবে বরণ করতে পারে না।

ব্যাবসাদারের ভীষণ রাগ হল। সে তার লোকজনকে দিয়ে চল্লিশ হাত গভীর গর্ত খুঁড়িয়ে তাতে ওই মহিলাকে ফেলে দিল। সেই গর্তের মুখে একটা মস্তবড়ো পাথর ফেলে রেখে পরের দিন সে সদলবলে সেখান থেকে নিজের দেশে চলে গেল।

পরের দিন তুর্কি দেশ থেকে অন্য এক ব্যাবসাদার ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার কানে ভেসে এল এক নারীর কান্নার আওয়াজ। নিজের লোককে সে এই কান্নার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে খুঁজে দেখতে বলল। তারা সেই গর্তের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে গর্তের গভীর থেকে ওই সুন্দরী রমণীকে বের করে ব্যাবসাদারের কাছে আনল।

ব্যাবসাদার ওই মহিলার সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি? এখানে এভাবে পড়ে আছ কেন?'

মহিলা তার সমস্ত কাহিনি বলল। শুনে ব্যাবসাদার বলল, 'আমাকে বিয়ে কর, তোমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।'

'ক্ষমা করুন। আমি বিবাহিত। অন্যের ধর্মপত্নী।' বলল মহিলা।

'তোমাকে যে হত্যা করেছে এখনও তুমি তাকে স্বামী বলছ?' ব্যাবসাদার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

আপনি তো দেশের সামাজিক অবস্থা জানেন যেকোনো মহিলার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, একটু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন না।' বলল সেই মহিলা।

ব্যাবসাদার তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে মহিলাকে ভালোভাবে খাওয়াল। মহিলা পেট পুরে খেয়ে 'এক্ষুনি আসছি' বলে অন্ধকারে কোথায় যেন পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ওই মহিলার অপেক্ষায় কাটানোর পর ব্যাবসাদার বুঝল যে মহিলা পালিয়েছে।

তারপর, সেই মহিলা কুর্দজাতের এক কোচোয়ানের হাতে পড়ল। সে তাকে দুধ রুটি খাইয়ে নিজের করে নেবার কথা ভাবল। তার কবল থেকে বাঁচবার জন্য ওই মহিলা এক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওই নদীর জোয়ারে ভেসে চলে গেল। শেষে মহিলা ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। সমুদ্রের এক জেলে তাকে বাঁচিয়ে, তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। জেলের মা ওই মহিলাকে গরম জলে স্নান করিয়ে পরার জন্য নিজের পুরোনো কাপড় দিল।

জেলে ওই মহিলার সমস্ত কাহিনি শুনে বলল, 'আমার কোনো বউ নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

'আমি তো বিবাহিতা! তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমার বাড়িতে বোনের মতো থাকব।' বলল ওই মহিলা।

'তোমার যা ইচ্ছা।' বলল ওই জেলে। তারপর থেকে ওই জেলে সমুদ্রে জাল ফেললেই মোতি পেত। শহরে গিয়ে ওই মোতি জহুরির কাছে বিক্রি করে অনেক সোনা পেতে লাগল। প্রত্যেক দিন সোনা রোজগার করত। তাল তাল সোনা সে জমাতে থাকে। সোনা দিয়ে সে যত পারল ধান কিনে জমিয়ে রাখল। সেই ধান রাখার জন্য বড়ো বড়ো ধানের গোলা তৈরি করাল।

কিছুকাল পরে সেই অঞ্চলে ভয়ংকর এক আকাল দেখা দিল। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ ছটফট করতে লাগল। জেলে গোলার ধান ক্ষুধার্তদের মধ্যে বণ্টন করতে লাগল। ওই মহিলাও পুরুষের পোশাক পরে ক্ষুধার্তদের মধ্যে খাদ্য বণ্টন করতে লাগল। সবার ভালো-মন্দ দেখাশোনা করতে লাগল।

একদিন ওই মহিলার স্বামী নিজেই হাজির হয়ে বলল, 'আমি আর আমার বাচ্চারা না খেতে পেয়ে মরছি।'

পুরুষ পোশাকে ছিল বলে সে নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারল না।

'ওই ঘরে কিছুক্ষণ বসুন। এদের আগে বিদায় করে আসছি।' স্বামীকে বলল ওই পুরুষবেশী ওই মহিলা।

লোকটা নিজের স্ত্রীকে একটুও চিনতে পারল না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস তার বউ মরে গেছে। সেইদিনই ওই তুর্কি ব্যাবসাদারদ্বয় এবং ওই কুর্দ কোচোয়ানও এল খাদ্য চাইতে।

কাজ সেরে এসে ওই মহিলা নিজের স্বামীসহ ওই চার জনকে জিজ্ঞেস করল তাদের পরিচয়।

প্রথমে ওই তুর্কি ব্যাবসাদারকে মহিলা বলল, 'আপনার জীবনে তো অনেক রকমের অভিজ্ঞতা আছে, বলুন তো কোন্ ঘটনা আপনাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে।'

'আমি সব চেয়ে অবাক হয়েছি চোখের সামনে এক মৃত মহিলাকে বেঁচে উঠতে দেখে।' এ-কথা বলে সে জানাল কেমন করে সে নিজে ওই মলিাকে গর্তে ফেলে ঢাকা দিয়েছে।

পরক্ষণেই অন্য ব্যাবসাদার জানাল, কেমন করে সে ওই গর্ত থেকে মহিলাকে তুলেছে আর তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে মহিলা কেমনভাবে পালিয়েছে।

তারপর কুর্দ জাতের ওই কোচোয়ান চেঁচিয়ে উঠল 'আমি যে মহিলার সন্ধান পেয়েছিলাম সে হয়তো ওই হবে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাইলাম। কিন্তু সে রাজি হল না। বলল, 'আমি বিবাহিতা।' তখন আমি জোর খাটালাম। সেই মহিলা তখন এক নদীতে ঝাঁপ দিল।

তারপর, মহিলা হঠাৎ নিজের স্বামীর দিকে ঘুরে, তাকে বলল, 'কই, আপনি তো আপনার পরিচয় কিছু জানালেন না!'

তখন সেই লোকটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী আর বলব। আমার স্ত্রীকে আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি।'

হত্যা করলেন কেন? এমনকী ঘটে গেল যে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতে হল?' জিজ্ঞেস করল তার বউ।

আমি টাকা রোজগার করতে বিদেশে গিয়েছিলাম। তিন বছর পরে বাড়ি ফিরতেই আমার ছোটো ভাই জানিয়েছিল যে আমার বউ-এর চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। তাতে আমার ভীষণ রাগ হল। আমি আমার বউকে হত্যা করে ফেললাম। আমার বউ যে কোনো অপরাধ করেনি তা অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম। তারপর থেকে দুঃখে শোকে আমি মনে মনে মরে যাচ্ছি।' স্বামী বলল।

'আপনার স্ত্রীকে দেখে আপনি চিনতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল তার বউ।

'কী বলছেন? নিশ্চয় চিনতে পারব।' বলল ওই লোকটা।

ওই মহিলা হঠাৎ এক অজুহাতে অন্য ঘরে গিয়ে পুরুষের পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে হাজির হল ওই চার জনের সামনে। তাকে দেখে ব্যাবসাদার, কোচোয়ান সহ সবাই চিনতে পারল।

তার স্বামী বউ-এর পায়ে আছড়ে পড়ে বলল, 'আমি তোমার উপর ভীষণ অত্যাচার করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।'

'আমি শুধু এই দিনের অপেক্ষাতেই বেঁচেছিলাম!' সেই মহিলা বলল। বাকি তিন জনও ওই মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে খাদ্য নিয়ে চলে গেল ।

আমি আর বাড়ি ফিরব না। আপনি বাড়ি ছেড়ে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই থাকুন।' স্বামীকে তার বউ বলল। তারপর, তারা জেলের বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগল।

৩৪. তরকারির স্বাদ

এক গ্রামে ছিল এক জমিদার। সেই গ্রামে গোকুল দাস নামে এক অনাথ বালক ছিল। তার স্বভাব ছিল খুব ভালো। বালকটি বুদ্ধিমান। তাই, জমিদার সেই বালকটিকে খুব স্নেহ করত। জমিদার সেই বালকটিকে একটু জমি দিয়ে বলল, 'তুমি এই জমি চাষ-আবাদ কর আর তোমার যখন যা দরকার হবে আমার কাছে চেয়ে নিয়ো।'

গোকুল জমিদারের কাছে শুধু আটা নিয়ে যেত আর রুটি খেত। জমিদারের কানে গেল ব্যাপারটা। জমিদার ভাবল গোকুল হয়তো তরকারি নিজের খেতে উৎপাদন করে।

একদিন জমিদার বেড়াতে বেড়াতে গোকুলের কুঁড়ে ঘরের দিকে চলে গেল। সেইসময় গোকুল রুটি খাচ্ছিল। সে-দৃশ্য জমিদার দেখল।

'গোকুল তুমি শুধু রুটি খাচ্ছ কেন?' তরকারি ছাড়া রুটি খাওয়া যায়? জমিদার জিজ্ঞেস করল।

গোকুল হাসি মুখে বলল, 'আজ্ঞে, আমার শুধু রুটি হলেই চলে। তরকারি খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই।'

'তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে এসো। তোমাকে সমস্ত রকমের তরকারি খাওয়াব। সব তরকারি চেখে দেখতে পারবে।' জমিদার বলল।

'হুজুর, খেতের কাজ করে আমি সময় পাই না। সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয় যাব একদিন।' গোকুল বলল।

তারপর একদিন জমিদারের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হল। জমিদার সেদিন সবাইকে তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। জমিদার গোকুলকেও ডাকতে গেল। স্বয়ং জমিদার ডাকতে আসায় গোকুল বাধ্য হল তার সাথে যেতে।

গোকুল যখন জমিদারের সাথে গেল তখন সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাতা অদূরে পড়ে আছে।
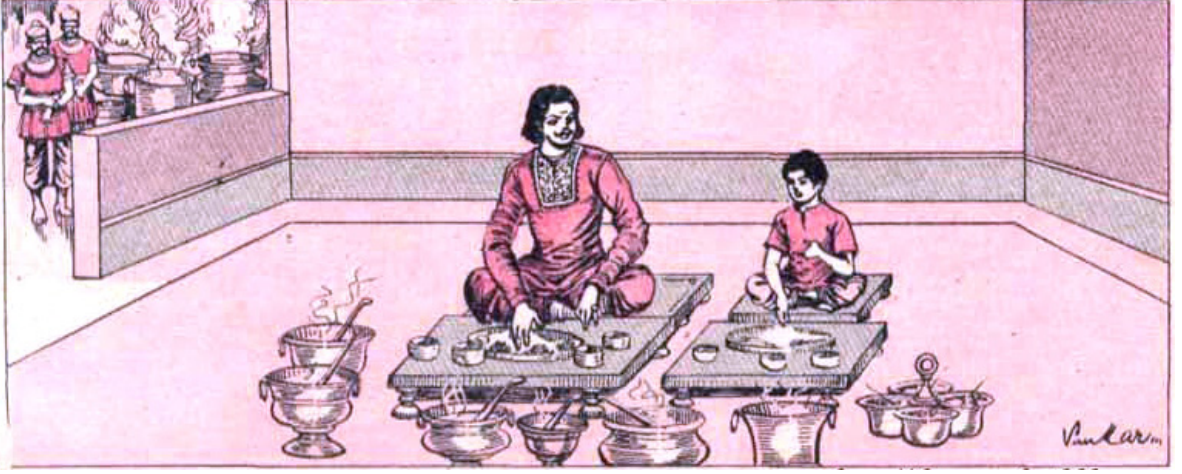
'আজ তুমি প্রত্যেকটা তরকারি চেখে দেখবে। আমরা দুজনে একসাথে খেতে বসব।' জমিদার বলল।

'আজ্ঞে, তরকারি আর খাওয়ার কী দরকার। এমনি দেখেই স্বাদ পেয়ে যাব।' গোকুল বলল।

জমিদার কৌতুক বোধ করে বলল 'তাই নাকি? তাহলে চল আজ যতগুলো তরকারি রান্না হয়েছে প্রত্যেকটা তুমি এক পলক দেখে বলবে কোনটা ভালো।'

'আমি তো তরকারিগুলোর নাম জানি না, আপনি দেখাবেন, আমি সব দেখে তাদের মধ্যে কোনটার স্বাদ সবচেয়ে ভালো, আপনাকে জানাব।' গোকুল বলল।

ওরা দুজনে রান্না ঘরে গেল। গোকুল একটা তরকারির দিকে তর্জনি দেখিয়ে বলল, 'এইটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে।'

জমিদার হেসে বলল, 'এটা? পাগল কোথাকর। মাছ মাংস থাকতে তোমার কাছে সবচেয়ে স্বাদের হল কিনা ঘন্ট। অবশ্য তুমি তো খাওনি, তুমি জানবে কী করে কোনটার কীরকম স্বাদ।'

পরে দু-জনে খেতে বসল। সব তরকারি খাওয়ার পর জমিদার বুঝল গোকুলের কথাই ঠিক। তাই, জমিদার গোকুলকে প্রশ্ন করল, 'গোকুল, তুমি তরকারি দেখে কেমন করে বুঝলে যে এই ঘন্টটার স্বাদই সবচেয়ে ভালো।'

গোকুল হাসতে হাসতে বলল, 'আজ্ঞে, আমি ওই যে পাতাগুলো ছড়িয়ে ফেলা আছে সেগুলো ভালো করে দেখেছিলাম। দেখলাম আপনার এই তরকারিটা কেউ ফেলেনি। চেটেপুটে খেয়েছে। তাতেই বুঝলাম যে এই ঘন্ট সবচেয়ে ভালো স্বাদের হয়েছে।'

জমিদার গোকুলের প্রখর বুদ্ধির জন্য তাকে দপ্তরে চাকরি দিল।

৩৫. পেটে কথা থাকে না

এক গ্রামের সমস্ত কিষান ছিল বৈষ্ণব এবং সব মজুর ছিল শৈব। ওই মজুররা ভাবত কিষানরা তাদের খাতির করছে না। শৈব মজুররা ভাবল বৈষ্ণব কিষানদের অহংকার চূর্ণ করতে হবে। ওরা সবাই শিবের আরাধনা করল। শিব দর্শন দিয়ে বললেন, 'কী চাও বল?'

'হে পরমেশ্বর, এই গ্রামের কিষানরা নিজেদের সম্পত্তির ব্যাপারে ভীষণ গর্বিত। ঠিক সময়ে বৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রত্যেক বছর এদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অহংকার চূর্ণ করতে আপনাকে কিছু একটা করতে হবে।' শিবভক্তরা প্রার্থনা করল।

'ঠিক আছে। আমি চোখ বুজে বসছি। যতক্ষণ না চোখ খুলছি, বৃষ্টি হবে না।' শিব ভক্তদের বললেন।

আর যায় কোথায়! শিবভক্তরা গ্রামে প্রচার করতে লাগল, 'শিব চোখ বুজে ফেলেছেন। এ-বছর বৃষ্টি হবে না। তোমার দম্ভ চূর্ণ হবে।'

এ-কথা শুনে কিষানরা ঘাবড়ে গেল। ওরা সবাই নিজেদের আরাধ্য দেবতার আরাধনা করল। বিষ্ণও দর্শন দিয়ে বললেন, 'তোমরা কী চাও, বল ?'

কিষানরা ভগবান বিষ্ণুকে বলল, 'ভগবান, শিবভক্তরা শিবের চোখ বুজিয়ে দিয়েছে। উনি যতক্ষণ না চোখ খুলছেন বৃষ্টি হবে না।'

'তোমরা নতুন পাত্র এনে জল ভরতি করে তাতে ব্যাঙ ছেড়ে দাও। ঠান্ডা জল পেতেই ব্যাঙগুলো ডাকতে শুরু করে দেবে। তারপর দেখি কেমন বৃষ্টি না হয়। বিষ্ণু বললেন। কিষানরা বিষ্ণুর কথামতো কাজ করল।

শিব ব্যাঙের ডাক শুনেই ভাবলেন, আমি তো বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছি। ব্যাঙ ডাকছে কেন? কী হল! ভাবতে ভাবতে শিব চোখ খুললেন। আর তখনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিষাণরা খেতে লাঙল ফেলল। বীজ বপন করল। চারা পুঁতল। এসব দেখে শিবভক্তরা আবার শিবের আরাধনা শুরু করে দিল। শিব দর্শন দিলেন।

‘হে পরমেশ্বর! বৃষ্টি হল যে। কিষানরা যে বীজ বপন করেছে। খেতে খেতে ফসল ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে এ-বছর ফসল অনেক বেশি হবে।' শিবভক্তরা বলল।

‘বেশি হলে হোক না। দেখ না আমি এমন কাণ্ড করব যে ওরা মোট দুশো কুনকের বেশি ধান ঘরে তুলতে পারবে না।' শিব ওদের বুঝিয়ে বললেন।

ব্যাস আর যায় কোথায়! শিবভক্তরা কিষানদের উপহাস করে বলল, ‘তোমরা ফসল ফলানোর আনন্দে যতই বগল বাজাও না কেন মোট দু-শো কুনকের বেশি একদানাও ঘরে তুলতে পারবে না।'

এ-কথা শুনে কিষানরা আবার ভগবান বিষ্ণুকে প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু দর্শন দিলে কিষানরা তাকে বলল, 'ভগবান, আমরা যতই খাটি, যত ফসলই খেতে হোক, ঘরে নাকি দু-শো কুনকের বেশি ফসল তুলতে পারব না। এখন আমাদের কী হবে?’ ‘তোমরা প্রত্যেক বিঘা জমিতেই দশটা করে ধানের গোলা করে ফেল।' বলেই বিষ অন্তর্ধান হলেন।

এত গোলা দেখে শিবভক্তরা আরাধনা করল শিবের। শিব দর্শন দিলে তাঁকে বলল, ‘পরমেশ্বর, এ-বছর কিষানরা অনেক বেশি ধনী হচ্ছে যে!’

‘হে ভক্তগণ, এখন আমি আর কী করতে পারি। তোমাদের পেটে তো কথা থাকে না। তোমরা তো আগেভাগে ঢাক পিটিয়ে বেড়াও। তাই, আমার সাহায্য তোমাদের কোনো কাজে আসছে না।' এ-কথা বলে শিব অন্তর্ধান হলেন।

৩৬. যেমন কর্ম

এক সময় পাঞ্চাল দেশে বিজয় সিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই রাজা খুব দয়ালু ছিলেন। এই জন্য লোকে তার রাজ্যকে রামরাজ্য বলত। কিন্তু সেই রাজার কোনো সন্তান ছিল না। তাই রাজা বিজয় সিংহ স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থস্থান ভ্রমণের কথা ভাবলেন। নিজের ভাবনার কথা ছোটো ভাই জয় সিংহকে জানালেন। তার হাতেই রাজ্যভার দিয়ে চলে গেলেন তীর্থ যাত্রায়।

জয় সিংহ প্রথম থেকেই ভোগলালসায় ডুবে ছিল। ভাই তাকে রাজ্যের ভার দেবার পর রাজা হওয়ার আনন্দের স্বাদ আরও বেশি করে সে পেল। যোগ্য মন্ত্রী ছিল। শত্রুর হাত থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য ভালো সেনাপতি ছিল। রাজ্যকে আর দেখার কী আছে।

আনন্দের মাঝে মাঝে যখন জয় সিংহের মনে হত যে এইসব আবার দাদার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে তখন তার ভীষণ খারাপ লাগত। এতদিন তার মনে একটা আশা ছিল। দাদার তো ছেলে নেই। তাই দাদা মারা যাবার পর গোটা রাজ্যের রাজা সে-ই হবে। দাদার ফিরতে অনেক দেরি হওয়ায় সে তার খোঁজ নিল। দাদা কোথায় আছে? কেমন আছে?

জয় সিংহ খবর পেল যে বিজয় সিংহ তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছেন। রাজধানীর অনেকেই এই খবর গোপনে গোপনে পেয়ে মনে মনে ভীষণ খুশি হল। কিন্তু জয় সিংহ মনে মনে কাঁদছে। কিন্তু বাইরে এমনভাব দেখাচ্ছে যেন সে-ও দাদার ফিরে আসার খবর পেয়ে আনন্দিত।

একদিন রাত্রে জয় সিংহ নিজের এক বিশ্বাসী পাত্রকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করল। ঠিক করল ওর দাদা আর বউদিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করানো হবে। জয় সিংহের কথাবার্তা আড়ি পেতে তার স্ত্রী রূপমতী শুনল।

পরের দিন রাজধানীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বিজয় সিংহ এবং তার স্ত্রী আততায়ীর আঘাতে মারা গেছেন। সমগ্র রাজ্যে খবরটা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। যারাই শুনল তারাই দুঃখিত হল। জয় সিংহের মনে দুঃখ হতে লাগল। কারণ দাদার প্রতি যথেষ্ট টান থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজ্য পাওয়ার আশাতেই সে তাদের হত্যা করাল।
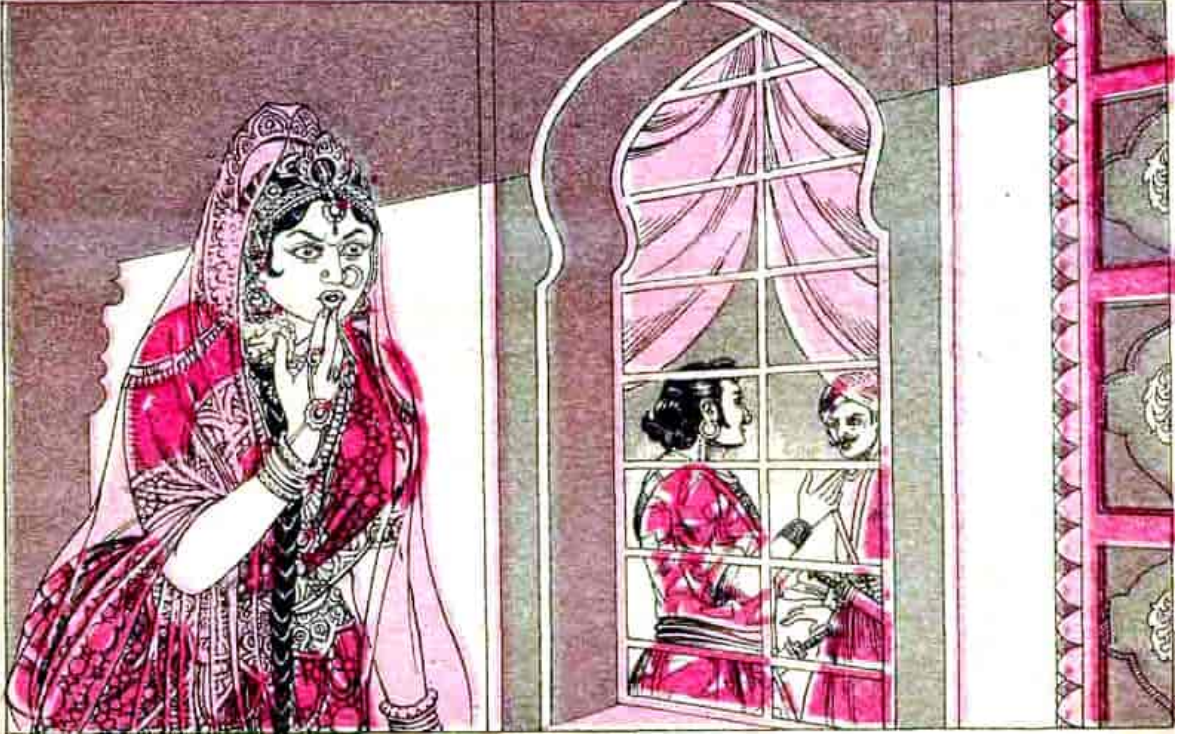
কিন্তু সব যখন পাওয়া গেল তখনই জয় সিংহের মন থেকে যেন সব হারিয়ে। গেল। তার যেন কিছু ভালো লাগে না। দেশের মানুষের অনেক অভাব। অনেক দায়িত্ব। অনেক কাজ। এই কাজ করতে করতে আনন্দ করার আর সময় পায় না। তখন চেষ্টা করল দাদার মতো জনহিতকর কাজ করে দেশবাসীর প্রশংসা পেতে। ক্রমে ক্রমে প্রজাদের মুখে মুখে তার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল।

জয় সিংহের সিংহাসনে বসার পর তার স্ত্রী রূপমতী গর্ভবতী হল। সিংহাসনে বসার পরেই জয় সিংহকে আশেপাশের অনেক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হল। কারণ বিজয় সিংহের মারা যবার পর ওই রাজারা ভেবেছিল যে পাঞ্চাল দেশ দুর্বল হয়ে গেছে।

জয় সিংহের যুদ্ধ যাত্রা করার কিছুদিনের মধ্যেই রূপমতীর যমজ পুত্র হল। সদ্যজাত শিশুদের দেখে রূপমতীর একাধারে আনন্দ এবং বেদনা দুটোই হল।। তার মনে হল যতই স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক থাক-না-কেন বড়ো হয়ে তো দুই ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে অশান্তি হবে। হয়তো একে অন্যকে হত্যাও কবে বসবে। কারণ সে তো জানত তার স্বামী জয় সিংহ কেমন ষড়যন্ত্র করে নিজের দাদা বউদিকে হত্যা করিয়েছে। অথচ দুই ভাইয়ের মধ্যে কত টান ছিল। তার থেকেই বুঝতে পারল সিংহাসন পাওয়ার লোভ মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে।

সেইজন্য রূপমতী নিজের দাই মাধবীকে বলল, 'মাধবী আমার একটা উপকার করতে হবে। আমার দুটো ছেলের দরকার নেই। এদের মধ্যে একজনকে বনে কোথাও ফেলে

এসো। আর ফেলে আসা বাচ্চার সাথে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলিও একই জায়গায় ফেলে এসো। কেউ এই স্বর্ণমুদ্রার থলি ও শিশুকে একসাথে পেয়ে তাকে পুষবে।'

প্রথমে মাধবী এ-কাজ করতে রাজি হয়নি। তখন রানি রূপমতী সিংহাসন লাভের জন্য তার স্বামী কী করেছে তা জানাল। সব শুনে মাধবী ওই দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং রূপমতীর শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে গেল। যা করল তা নিয়ে রূপমতীর অনুশোচনা হল না কিন্তু দুঃখ হল।

এত যে কাণ্ড আঁতুড় ঘরে হয়ে গেল তা মাধবী ছাড়া অন্তঃপুরের আর কেউ জানত না। সবাই জানল রূপমতীর একটাই ছেলে হয়েছে। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে জয় সিংহ রাজপ্রাসাদে ফিরে পুত্র সন্তান হওয়ার

সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হল। তার নাম রাখা হল জয়চন্দ্র।

ওদিকে দাই মাধবী রূপমতীর শিশু সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে লালনপালন করতে লাগল। মাধবী তার নাম রাখল মধু।

রাজপ্রাসাদে জয়চন্দ্র বাড়তে লাগল। কিন্তু রূপমতী মাঝে মাঝে তার অন্য পুত্রসন্তানের কথা ভীষণভাবে ভাবত।

সময় অতিবাহিত হতে থাকে। জয়চন্দ্র সমস্ত রকমের অস্ত্র চালনায় নিপুণ হয়ে উঠল। এখন সে যুবক। রাজা জয় সিংহ এক বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত রকমের অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল। রাজ ঘোষণা করেছিল : যুবরাজকে যে যুবক অস্ত্র চালনায় হারিয়ে দেবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। এই প্রদর্শনী দেখার জন্য দূর দূর থেকে লোক আসতে লাগল। অনেকে আবার জয়চন্দ্রের সাথে অস্ত্র চালনা করে নাম করতে এল। কিন্তু সবাই হেরে গেল।

অবশেষে যুবরাজ জয়চন্দ্র ভিড় দেখে দর্পের সাথে বলল, 'আমার সাথে অস্ত্র চালনা করতে আর কি কেউ নেই?'

তখন ভিড়ের ভেতর থেকে মধু এগিয়ে এল। দু-জনে তরবারি যুদ্ধে লিপ্ত হল। দর্শকরা ওই দু-জনের চেহারার ভীষণ মিল দেখে অবাক হল। জয় সিংহ এবং রূপমতীও বিস্মিত হল।

রাজা জয়সিংহ এই অদ্ভুত মিলের কারণ জানার জন্য তরবারি যুদ্ধ থামিয়ে দিল। পরক্ষণে মধুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার ছেলে? তোমার নাম কী?' এ-প্রশ্ন শুনে মধু হেসে বলল, 'মহারাজ! প্রজা মাত্রেই আপনার সন্তানতুল্য। তাই, আমাকেও আপনি আপনার সন্তানই মনে করুন না কেন?'

এ-কথা শুনে রূপমতী অজ্ঞান হয়ে যায়। রাজা রানিকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তার জ্ঞান ফেরালেন।

রূপমতীর জ্ঞান হওয়ার পরই সে মধুকে এবং মাধবীকে কাছে দেখে দু-হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ করে ওঠে 'আমার খোকা!' মাধবী মধুকে রানির দিকে ঠেলে দিল।

রাজা ভাবল তার স্ত্রী-র মতিভ্রম হয়েছে। বলল, 'এসব তুমি কী করছ?'
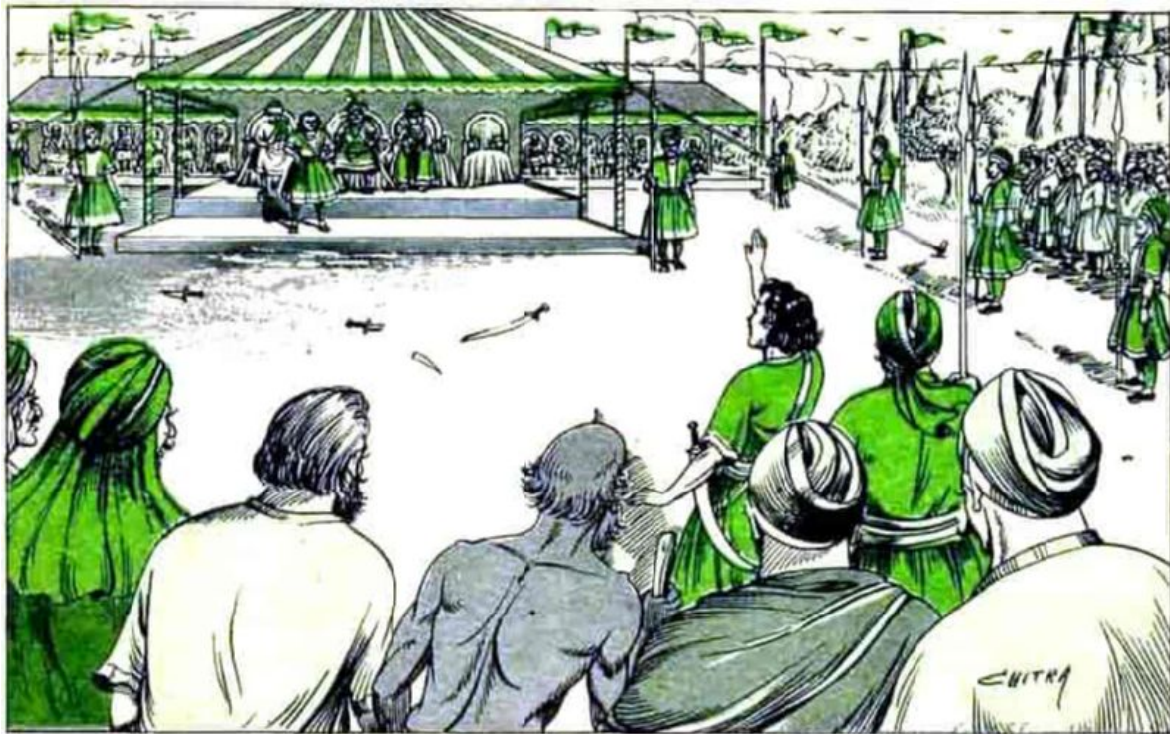
'মহারাজ আমার যমজ পুত্র হয়েছিল। জয়চন্দ্র আর এই ছেলেটা। আমার ভীষণ ভয় করেছিল একটা কথা ভেবে। আমি ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে এরা বড়ো হলে সিংহাসন নিয়ে খুনোখুনি করবে। তাই একটা শিশুকে আমি জঙ্গলে ছেড়ে আসতে মাধবীকে দিয়েছিলাম। আমার হারানো মানিক এতদিনে আমার কোলে ফিরে এসেছে।' রূপমতী বুঝিয়ে বলল।

তারপর মাধবী রাজাকে জানাল কেমন করে সে তার শিশু সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে না দিয়ে পুষেছে।

জয় সিংহের মনে পড়ল কেমন করে সে নিজের ভাইকে হত্যা করেছে। তাই সে রূপমতীকে বলল, 'রানি, সিংহাসনের জন্য আর এই পরিবারে কোনোদিন খুন হবে না। আমি এই রাজ্যকে নিজের দুই ছেলের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেব।' এই কথা রাজা এমনভাবে বলল যেন শপথ করছে।

রাজার এই ঘোষণা শুনে রূপমতীর মন আনন্দে ভরে গেল। সে নিজের দুই ছেলেকে একসাথে দেখে ভীষণ আনন্দিত হল। জয়সিংহ নিজের জীবদ্দশায় নিজের রাজ্যকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে রাজ্যাভিষেক করাল।

৩৭. মেওয়া

অনেক দিন আগের কথা। মাহোবা নামক গ্রামে বহু ধনবান ছিল। সেই গ্রামে। রাম সাহা নামে এক বণিক ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। বাপ ছেলেতে মিলে একটা সাধারণ ব্যাবসা করত।

রাম সাহা এক সময়ে খুব ধনী ছিল। কিন্তু ব্যাবসা করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব খোয়াল। শুধু এক বিরাট বাড়ি ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিছুই রইল না। তবু লোকটা হতাশ হল না। সে আবার ব্যাবসা শুরু করল একটি আশায়: ভবিষ্যতে একদিন-না-একদিন তার ভাগ্য প্রসন্ন হবেই।

সে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবল আশা তার মনে দানা বেঁধে ছিল।

মাহোবা ধনীদের গ্রাম ছিল। তাই যখন-তখন সেই গ্রামে লুণ্ঠনকারীরা হামলা করত। লুণ্ঠনকারীদের আগমনের খবরে পেয়েই গ্রামের ধনীরা নিজেদের ধনসম্পত্তি মাটিতে পুঁতে দিত। অথবা ধনদৌলত নিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেত।

একবার লুণ্ঠনকারীরা গ্রামে এল। ওদের আসার সাথে সাথে গোটা গ্রামের ধনীরা পালাল। কিন্তু রাম সাহা ছেলেদের বলল, 'বাপধনেরা, আমি তোমাদের সাথে যেতে পারি না। দুদিন এখানেই কোথাও মাথা গুজে থাকব। বাড়ির পেছনের খড়ের গাদার কোণে তোমরা আমার জন্য খাবার-দাবার কিছু রেখে চলে যাও।

ছেলেরা বাবার কথামতো কিছু ভালো খাবার রেখে চলে গেল।

লুণ্ঠনকারীরা গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ি বাড়ি ঢুকে কোথায় সোনাদানা আছে খোঁজ করতে লাগল। ওদের নেতা ঘোড়া থেকে নেমে দুটো থলেতে যে সোনা পেল তা পুরে নিল। ফিরে যেতে যাবে এমন সময় সেই নেতার নজর পড়ল রাম সাহার বিরাট বাড়িটার উপর।

লুণ্ঠনকারীদের নেতা ওই থলে দুটো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাকে সযত্নে ওই খড়ের গাদার কাছে এক বড়ো পাথেরে বেঁধে খুব সাবধানে এক-পা এক-পা করে ওই বিরাট বাড়ির একটি ঘরে ঢুকল।

ওই নেতার কাজকর্ম রাম সাহা খুব সাবধানে লক্ষ করছিল। তার মন। ছটফট করতে লাগল। ঘোড়ার খিদে পেয়েছিল তাই সে চরতে লাগল।

সুযোগ বুঝে রাম সাহা খড়ের গাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠ থেকে থলে দুটো নাবিয়ে ঘোড়ার দড়ি ছিড়ে দিল। তাপর সেই থলে দুটো নিয়ে ওই খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে রইল। দড়ি ছিড়ে যাওয়াতে ঘোড়া চরতে চরতে অনেক দূর চলে গেল।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও অত বড়ো বাড়িতে লুণ্ঠন নেতা কিছুই পেল না। বাইরে এসে দেখে তার ঘোড়া অনেক দূরে চরছে। তার চেয়ে অবাক কাণ্ড ঘোড়ার পিঠে কোনো থলি নেই!

লুণ্ঠন-নেতা ওই থলে দুটো খোঁজাখুঁজি করতে লাগল আশপাশের জায়গায়। তখন ওই নেতার কয়েক জন অনুচর তার কাছে এল। তাদের দেখে নেতা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কেউ কি ধনসম্পদে ভরা থলিগুলো দেখেছ?'

চোরগুলো একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের মনে নেতার উপর সন্দেহ জাগল। তাদের মনে হল তাদের চোখে ধুলো দিতে ওই নেতা অভিনয় করছে।

আসলে নেতাই চুরি করে মাল সরিয়ে ফেলেছে, তাদের ঠকানোর তাল করছে। তারপর লুণ্ঠনকারীরা সবাই জড় হয়ে নেতাকে প্রশ্ন করল, 'এখানে তো আমরা ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণী নেই। অত সোনা ভরা ভারী ভারী থলে যাবে কোথায় ?'

তারপর সকলে মিলে ওই থলিগুলো খুঁজল কিন্তু কোনো লাভ হল না। তখন লুণ্ঠন-নেতা ওই থলি দুটো খোঁজার দায়িত্ব নিজেই নিল।

পরের দিন লুণ্ঠনকারীরা মাহোবা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

তাদের চলে যাবার পর ওই গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে এল। রাম সাহা অত্যন্ত সাবধানে ওই থলি দুটো লুকিয়ে রাখল ঘরে। নিজের ছেলেদেরও ওই থলিগুলোর কথা জানাল না। রাম সাহা জেনে ছিল যে লুণ্ঠন-নেতা নিজে দায়িত্ব নিয়েছে ওই থলি দুটো খোঁজার।

রাম সাহা যা ভেবেছিল তাই হল। ওই লুণ্ঠন-নেতা ঘোড়ার ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে ওই গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার উদ্দেশ্য ছিল রাতারাতি কেউ বড়োলোক হয়েছে কি না জানা। গোপনে খোঁজ করা। রাম সাহা ওই লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল। তার মনে হল লুণ্ঠনকারীরা রাত্রে হঠাৎ তার বাড়িতে হানা দিতে পারে। তাই সে ওই খড়ের গাদার উপর সারারাত নজর রেখেছিল। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে লুণ্ঠন-নেতা বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দরজার কাছে ঘাপটি মেরে বসেছিল রাম সাহার বাড়ির লোকের কথা শুনতে।

রাম সাহা আড়ালে থেকে এসব লক্ষ করছিল। সে নিজের ছেলেদের জোর গলায় ডেকে বলল, 'ওরে তোরা শোন, পরশু খড়ের গাদা থেকে খড় পাড়তে গিয়ে দেখি সেখানে দুটো সোনার গহনা ভরা থলে রয়েছে।'

রাম সাহার ছেলেরা বলল, 'তাই নাকি? কই সে-কথা তুমি তো আমাদের বলনি।'

'বাবারে ওই দু-থলে ভরতি সোনার গহনা কার-না-কার না জেনে আমি তোদের কী আর বলব বল? তাই অনেক ভেবে-চিন্তে লুকিয়ে রেখেছি।'

'কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? ছেলেরা প্রশ্ন করল।'

'আমাদের কুয়েতে লুকিয়ে রেখেছি।' রাম সাহা জবাবে বলল।

লুণ্ঠন-নেতা রাম সাহার কথা আড়ি পেতে শুনে ভীষণ খুশি হল। সবার ঘুমানোর পর একটা দড়ি দিয়ে কুয়োর ভেতরে নাবল।

তৎক্ষণাৎ রাম সাহা তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে দুই ছেলেকে ঘটনাটা জানিয়ে দিল। তিন জনে মিলে কুয়ার কাছে গিয়ে দড়ি কেটে দিল। তারপর বড়ো বড়ো পাথর কুয়াতে ছুঁড়ে লুণ্ঠন-নেতাকে মেরে ফেলল। লাশ বাড়ির পিছনে ভোর হওয়ার আগেই পুঁতে দিল।

তারপর রাম সাহা সারাজীবন ধনী লোকের মতো জীবনযাপন করতে লাগল।

৩৮. উফ

এক গ্রামে এক গরিব বিধবা ছিল। তার ছিল অজয় নামে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। সে সুন্দর হলেও কাজের ছিল না। কাজের নামে তার জ্বর আসত।

একদিন তার মা তাকে বলল, 'বাবা, একটু উঠে দুটো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়, দু-মুঠো ভাত ফোটাব।'

'ফোটানোর কী দরকার মা, কাঁচা চাল খাওয়া যাবে না?' অজয় বলল। কারণ সে ছিল ভীষণ কুঁড়ের হদ্দ।

ছেলের মা ভাবল ছেলেকে দিয়ে কাঠ আনান যাবে না। তাই নিজেই কাঠ কুড়িয়ে আনতে গেল। ফেরার পথে একটা কুয়া পড়ে। কুয়ার কাছে কাঠের বোঝা রাখতে রাখতে ক্লান্তিতে বলল, 'উফ!' পরক্ষণেই কুয়ার ভেতর থেকে এক রাক্ষস বেরিয়ে এসে বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, 'বুড়ি মা, আমাকে আমার নাম ধরে ডাকলেন কেন?'

বিধবা বুড়ি ওই রাক্ষসকে দেখে ঘাবড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না, বাবা, আমি তোমাকে ডাকিনি।

'ডাকেননি মানে "উফ" নামে আর কেউ এখানে আছে নাকি? একমাত্র আমারই নাম উফ।' রাক্ষস বলল।

'আমি এ-কথা জানতাম না বাবা। কেন বলছি তাও শোনো। আমার এক জোয়ান সুন্দর ছেলে আছে। কিন্তু ও কোনো কাজ করতে চায় না। তাই সব কাজ আমাকে করতে হয়। এই কাঠের বোঝা রেখে তাই উফ বলেছিলাম।'

এইভাবে শুরু করে বিধবা ছেলের কথা রাক্ষসটাকে জানাল।

সমস্ত কাহিনি শুনে রাক্ষস বলল, 'তুমি তোমার ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পরিবর্তে তোমাকে এক আঁজলা সোনা দিয়ে দেব।'

'তা তো দেবে কিন্তু বাবা তুমি ওকে খাবে না তো? তোমাকে দেখে কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।' বিধবা বলল।

'আমি মানুষের মাংস খাই না।' এ-কথা বলে রাক্ষসটা সোজা কুয়ার ভেতরে চলে গেল। পরক্ষণেই এক আঁজলা ভরতি সোনা এনে বিধবাকে দিল, দিয়ে বলল, 'মনে রেখো। তুমি তোমার ছেলেকে না দিয়ে গেলে আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব।'

বিধবা বাড়ি ফিরে রান্না করতে করতে কাঁদতে লাগল। অজয় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ কেন?' বিধবা তখন ছেলেকে সমস্ত ঘটনা জানাল। অজয় বলল, মা তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমি ওই রাক্ষসের কাছে গিয়ে অনেক কিছু শিখে আসব।'

তারপর মা-ছেলে দু-জনে কুয়ার কাছে গিয়ে ডাকল, 'উফ। উফ।'

তৎক্ষণাৎ সে কুয়া থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বুড়ি মা, তোমার ছেলে?'

তারপর, বুড়িকে আরও এক আঁজলা ভরতি সোনা দিয়ে অজয়কে বলল, 'ভাই, তুমি আমার সাথে আমাদের বাড়িতে এসো। তোমাকে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। আমি সারাদিন ঘরে থাকি না। তুমি যত ইচ্ছা বিশ্রাম করতে পারবে।'

'ব্যাস তাহলেই খুশি।' অজয় বলল।

তারপর রাক্ষস ও অজয় কুয়াতে ঝাঁপ দিল। কুয়ার তলায় এক রাজপ্রাসাদ এবং উদ্যান ছিল।

সেখানে পৌঁছানোর পর রাক্ষস অজয়কে বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি ঘরদোর দেখাশোনা কর। খাও-দাও পিছনের দিকে ঘোরাঘুরি কর। কিন্তু উদ্যানে যেয়ো না। তুমি উদ্যানে গেলে আমি তোমাকে মারব।'

একটা ঘরে খাবার পরিবেশন করা ছিল। অজয় পেট ভরে খেয়ে মনে মনে ভাবল এই চাকরিটাতো মন্দ নয়। প্রাসাদের পিছনে কিছুক্ষণ পায়চারি করে শেষে উদ্যানের দরজা খুলে পা রাখল।

উদ্যানে সব রকমের ফুলের গাছ ও নানান ধরনের পাখি ছিল। পাখিরা গান গাইছিল আর ফুলের সুগন্ধে ভরা ছিল সেই উদ্যান। অজয় মনে মনে ঠিক করল প্রত্যেক দিন সে উদ্যানে আসবে।

অজয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। একদিকে নজর পড়ল একটি কুটির। সেই কুটিরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল এক পরমা সুন্দরী। অজয়কে ইশারায় সে কাছে ডাকল।

'সাবধান! ফুল ছুঁয়েছ কী উফ জেনে যাবে। উফ যেদিন খেতে পায় না সেদিন সে মানুষের মাংস খায় না বটে কিন্তু অন্য যেকোনো মাংস তো খায়। কোথাও খেতে না পেলে

বাড়ি ফিরে তোমাকে এক ধরনের জল খাওয়াবে। তারপর তোমার আড় ভাঙালেই একেবারে জানোয়ার হয়ে যাবে। উফ তোমাকে যে জানোয়ার হতে বলবে তুমি সেই জানোয়ার হয়ে যাবে। অতএব এরকম অবস্থায় তুমি জল খেতে পার, হাত-পা নাড়তে পার, কিন্তু আড় ভেঙেছ কী মরেছ। শেষপর্যন্ত আমাকে দিয়ে লাল জল আনাবে। আমার আনা লাল জল তোমাকে পান করতে বলবে। তুমি পান করার পর তোমাকে কোনো এক জানোয়ার হতে বলবে। তবে জানো, ওই জল পান করার পর তুমি হবে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তখন তুমিও তোমার ইচ্ছেমতো যেকোনো পশু হতে পারবে। যাও, আর নয়। এখন গিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে লেগে যাও।' কন্যা অজয়কে বলল।

অজয় প্রাসাদে ফিরে এল। পরিষ্কার করার কাজ শেষ করে প্রাসাদের পিছনে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

অনেক দেরি করে উফ প্রাসাদে ফিরল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল তার। সেদিন কয়েকটি ফলমূল ছাড়া আর কিছু মনের মতো জিনিস সে খেতে পেল না। প্রাসাদে ফিরেই উফ অজয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করছিলে?'

'ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম।'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছুক্ষণ পড়াতে চাই। এক নতুন ধরনের বিদ্যা। নাও এই জল পান করে আড় ভেঙে খরগোশ হয়ে যাও।' উফ বলল।

অজয় জল খেয়ে হাত-পা নেড়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আরে ধ্যাৎ! কী করছ? আড় ভাঙো না!' বলল উফ।

'আমি কি আড় ভাঙছি না?' অজয় নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করল।

'আরে তুমি তো ভীষণ বোকা দেখছি।' এ-কথা বলে উ অন্য পাত্রের জল অজয়কে পান করতে দিয়ে বলল, 'নাও এই জল পান করে ছাগল হও।'

কিন্তু অজয় ওই জল পান করে এমন সব অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল যেন সে আর ভাঙতে পারে না। উফ এর খিদে আরও বেড়ে যেতে লাগল।

তারপর উফ উদ্যানে গিয়ে কন্যাকে বলল, 'দেখ তো কী অবস্থা! আজ আমি একদম মাংস খেতে পাইনি। এ বোকা ছেলেটাকে আড় ভাঙতে বলছি সে কিছুতেই তো পারছে না।'

'মনে হয় খুব বোকা। জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে নেই। ওকে লাল জল না খাওয়ালে একেবারেই বুদ্ধি খুলবে না।' কন্যা বলল।

'লাল জল খেয়ে তো সে আমার সমতুল্য জ্ঞানী হয়ে যাবে! সেটা তো আরও খারাপ হবে!' উফ বলল।

জ্ঞানী হয়েও আর কী করতে পারবে? আড় ভাঙলেই তুমি তাকে জানোয়ার হতে বলবে। ও তৎক্ষণাৎ জানোয়ার হয়ে যাবে। তুমি তাকে খেয়ে ফেলবে।' কন্যা বলল।

'ভালো পরামর্শ দিয়েছ। যাও, লাল জল নিয়ে এসো।' উফ্ বলল।

ওই কন্যা কুটির থেকে লাল জল এনে দিল উকে। উফ একটা পাত্রে সেই জল নিয়ে অজয়কে খেতে দিয়ে বলল, 'তুমি পাত্রের জল খেয়ে হরিণ হও।'

অজয় সেই লাল জল পান করে মনে মনে পায়রা হতে চাইল। মুহূর্তে পায়রা হয়ে কুয়া থেকে বেরিয়ে গেল উফ। তৎক্ষণাৎ বাজ পাখি হয়ে পায়রাকে ধাওয়া করল। তখন অজয় তাড়াতাড়ি মাছি হয়ে এক স্নানাগারের দরজার তালার ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর উফ এক ধনী লোকের রূপ ধারণ করে। স্নানাগারের মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করল, 'এই স্নানাগার বিক্রি করবে?'

‘ন্যায্য দাম পেলে কেন বেচব না?’ স্নানাগারের মালিক বলল।

ধনী লোকটি স্নানাগারের মালিক যত চাই তত দিয়ে তার কাছ থেকে স্নানাগার কিনে নিল। তালার চাবিও নিয়ে নিল। তখন ওই মাছি বাইরে উড়তে লাগল। তখন উ চামচিকে হয়ে মাছিকে ধাওয়া করল। উফের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য অজয় চাপা ফুল হয়ে এক রাজার প্রাসাদের অন্তঃপুরে ঢুকে এক রাজকন্যার কোলে পড়ে। রাজকুমারী ওই চাপা ফুলটি নিজের বেণীতে গুঁজে নিল।

পরক্ষণেই উফ রূপ বদল করে নিল। সে এবার হল তুর্কির রাজদূত। সে রাজার সাথে দেখা করে বলল, 'মহারাজ, আমি দেশ থেকে বেরুনোর মুহূর্তে আমার মা আমাকে আশীর্বাদ করে এক চাঁপা ফুল দিয়েছিলেন। সেই ফুল আমার কাছে এক অমূল্য জিনিস। এক ময়না আমার পকেট থেকে ওই ফুল তুলে নিয়ে সোজা আপনার অন্তঃপুরে ঢুকে গেছে। আপনি দয়া করে আমার ফুল অন্দরমহল থেকে আনিয়ে দিন।'

ততক্ষণে অজয় এক সুন্দর যুবকের রূপ ধারণ করে সেই রাজকন্যাকে বলল, ‘রাজকুমারী, আমি একটি দেশের রাজকুমার। আমার এক শত্রু এসে আমাকে চাইবে।

আমরা দুজনে তন্ত্রমন্ত্র বিদ্যায় সমান দক্ষ। দোহাই আপনার, আপনি আমাকে ওর হাতে তুলে দেবেন না। ও আমাকে বাগে পেলেই শেষ করে ফেলবে। এই কথা বলে অজয় আবার চাপা ফুলে পরিবর্তিত হল। পরক্ষণেই এক সখী রাজকুমারীর কাছে এসে বলল, 'রাজকুমারী আপনার কোলে যে চাঁপা ফুল পড়েছিল মহারাজ সেই ফুল চেয়েছেন।'

রাজকুমারী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাদের উদ্যানে হাজারটা চা পা ফুল আছে। তুলে মহারাজকে দিয়ে দাও।'

সখী উদ্যানে গিয়ে পাঁচ-দশটা চাপা ফুল নিয়ে রাজদূতের হাতে দিল। রাজদূতরূপী উফ ফুলগুলোকে শুকে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আমার সেই পবিত্র ফুল তো এর মধ্যে নেই।'

রাজা ভীষণ চটে গিয়ে সখীকে বললেন, 'তুমি এক্ষুনি রাজকুমারীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ওই ফুলটা নিয়ে এসো। না দিলে আমি যাব ফুলটা আনতে।'

সখী রাজকুমারীর কাছে গিয়ে তাই বলল। রাজকুমারী বাধ্য হয়ে ওই ফুল সখীর হাতে দিল। রাজা ওই ফুল তুর্কীর রাজদূতের হাতে দিতে যাবেন এমন সময় ওই ফুল একটি গমের দানা হয়ে নীচে পড়ে গেল। তক্ষণাৎ রাজদূত মুরগি হয়ে ওই দানা মুখে তুলতে যাবে এমন সময় ওই দানা শেয়াল হয়ে মুরগিকে খেয়ে ফেলল।

এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে রাজার তো একেবারে মাথা ঘুরতে লাগল। চিৎকার করে উঠলেন। সেই মুহূর্তে শেয়াল এক যুবকের রূপ ধারণ করে বলল, 'মহারাজের জয় হোক! আমি এক রাজকুমার! আমার মা এক গন্ধর্ব নারী। উনিই আমাকে সমস্ত মন্ত্র শিখিয়েছেন। আপনার সামনে এতক্ষণ যে লোকটা ছিল সে আমার চাকর। সে আমার সমস্ত বিদ্যা শিখে আমাকেই শেষ করতে যাচ্ছিল। মহারাজ, আপনি বলুন, যারা অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত?'

'ও! এই ব্যাপার! ভালোই হয়েছে, তোমার শত্রু মারা গেছে। একটা কথা। তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে তুমি আমার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে আমার এখানেই থাক।' রাজা বললেন।

'আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তবে আমাকে এক সপ্তাহের অনুমতি দিলে আমি আমার বকেয়া কাজ সেরে আসতে পারি।' অজয় বলল।

রাজার স্বীকৃতি দানের পর সে পায়রার রূপ ধারণ করে কুয়র কাছে গেল। সেখানে দেখতে পেল তার মা অপেক্ষা করছে। অজয় নিজের আসল রূপ ধারণ করে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা তুমি এখানে কী করছ?'

'বাবা! আমি তোমাকেই খুঁজছি বাবা! উফ যে সোনা দিয়েছিল আমি তাকে সেই সোনা ফেরত দিতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে যাব বাবা!'

'মা, উফ তো আর নেই। সে মারা গেছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি তাড়াতাড়ি ফিরব।' অজয়ের মা বাড়ি ফিরে গেল। তারপর সে বাজপাখির রূপ ধারণ করে কুয়াতে নাবল। উদ্যানের কন্যাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে না আমার কাছে থাকবে?'

সেই কন্যা নিজের মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চাইল। সেও লাল জল পান করে পাখি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাজপাখির রূপ ধরেই অজয় ওই রাজার কাছে গেল। সেখানে নিজের আসল রূপ ধারণ করে রাজকুমারীকে বিয়ে করল। তারপর নিজের মাকে রাজমহলে আনিয়ে সবাই মিলে সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

৩৯. নেকড়ে

ফ্রান্সে এখন যেখানে বিরাট উদ্যান রয়েছে সেখানে হাজার বছর আগে ছিল এক অরণ্য। সেই অরণ্য জ্বলে পুড়ে যাওয়ার বিষয়ে এক লোককথা আছে। ওই কাহিনি হল নিম্নরূপ:

সেই অরণ্যের এক প্রান্তে গরিব কিষান বাস করত। একদিন কিষান শহরে দুটো বড়ো রুটি কিনে ফিরছিল। পথে হঠাৎ সামনে এক নেকড়েকে দেখল। নেকড়েটা কিষানকে দেখে গর্জন করতে থাকে। নেকড়ের ভয়ংকর রূপ দেখে কিষান ভয় পায়।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কিষান ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। পালানো অসম্ভব আর নেকড়েকে মোকাবিলা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিষান কী যেন ভেবে নেকড়েকে বলল, 'নেকড়ে ভায়া, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে এই রুটির টুকরোটা খাও ভাই।' কিষান এক টুকরো নেকড়ের দিকে ছুড়ে দিল। নেকড়ে খুশি হয়ে তা খেল। সুযোগ বুঝে কিষান বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

অনেক দূর যাওয়ার পর কিষান পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নেকড়েও তার পেছনে পেছনে আসছে। সে বলল, 'নেকড়ে ভায়া, তুমি সত্যিই ভালো। আর এক টুকরো খাবে? খাও।' কিষান আর এক টুকরো ছিঁড়ে নেকড়ের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কিন্তু তাতেও নেকড়ে তার পিছু ছাড়ল না। সারাপথ সে একটা একটা করে টুকরো দিতে থাকে আর নেকড়ে তা খেতে থাকে।

পা চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষে কিষান বাড়ি পৌঁছাল। তখন তার হাতে ছিল একটি রুটির টুকরো। নেকড়েও কিষানের ঘরের কাছে পৌঁছাল।

কিষানের স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'রুটি কোথায়? রুটির সাথে খাব বলে পায়েস তৈরি করে রেখেছি।'

কিষান তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে হাঁপাচ্ছিল। কোনো কথা না বলে নেকড়ের দিকে তর্জনী দেখাল।

'ওমা এ যে নেকড়ে। তাই বুঝি তুমি হাঁপাচ্ছ! কী ভাগ্যি তুমি এখনও নেকড়ের পেটে যাওনি!' কিষানের বউ বলল।

আমি যে রুটি দুটো কিনেছিলাম তা একটু একটু করে নেকড়েকে সারা পথ ধরে খেতে দিয়েছি।

'এই হারামজাদা নেকড়ে রুটিগুলো সব খেল! তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দাও। ওদিকে তাকাতেই আমার ভয় করছে।' কিষানের বউ বলল।

কিষান দরজা বন্ধ করার আগে হাতে যে রুটির টুকরোটা ছিল সেটাও নেকড়ের দিকে ছুড়ে বলল, 'নাও এটাও তুমি খেয়ে নাও।' তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

নেকড়ে রুটির টুকরোটা খেয়ে অনেকক্ষণ ওই দরজার কাছে বসেছিল। ঘরের ভেতর ওই কিষান পত্নী ওই পায়েসটুকু খেয়ে নিল। খেতে বসে কিষান-বউ নেকড়েকে অনেক গালাগাল দিল। ওই কথাগুলো নেকড়ে শুনল। ওদের খাওয়া শেষ হতেই নেকড়ে চলে গেল।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে কিষান দম্পতি অনেক পরিশ্রম করে যে সামান্য কিছু অর্থ জামিয়ে ছিল তা দিয়ে একটি গোরু কিনবে ঠিক করল। কিষান সে টাকা নিয়ে গোরু কিনতে হাটে গেল। অল্প টাকা নিয়ে কিনতে হবে। বড়ো গোরু তো পাবে না। তাই যাচাই করতে করতে ঘোরাঘুরি করছিল। একটা লম্বা লোক কিষানের কাছে এসে বলল, 'তুমি গোরু কিনতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তবে আমার কাছে তো বেশি টাকা নেই তাই যাচাই করে কেনার জন্য নানান জায়গায় ঘুরছি।' কিষান বলল।

'আমার কুটিরে কতকগুলো গোরু আছে তার মধ্যে কোনোটা যদি তোমার পছন্দ হয় নিতে পার।' ওই লম্বা লোকটা এগিয়ে এসে বলল।

দু-জনে একসঙ্গে বাড়ির কাছে গেল। বাড়ির পেছনের গোয়ালে ঢুকে লম্বা লোকটা বলল, 'এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা তুমি নিতে পার।'

কিষান অবাক হয়ে গেল। এ যেন এক বিরাট সুযোগ তার সামনে এসে গেল। সে একটি গোরু বাছাই করে নিল। লম্বা লোকটা গোরুর গলায় দড়ি বেঁধে তার হাতে দিতে দিতে বলল, 'তুমি দেখছি আমার যতগুলো গোরু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গোরুটাই নিলে।'

তারপর ওই লম্বা লোকটা পকেট থেকে একটি কৌটো বের করে কিষানকে বলল, 'এই কৌটো তুমি তোমার বউকে আমার পক্ষ থেকে উপহার দেবে। একান্তে তোমার বউ যেন এই কৌটোটা খোলে। অন্য কারও সামনে খুলতে তোমার বউকে অবশ্যই বারণ করো।'
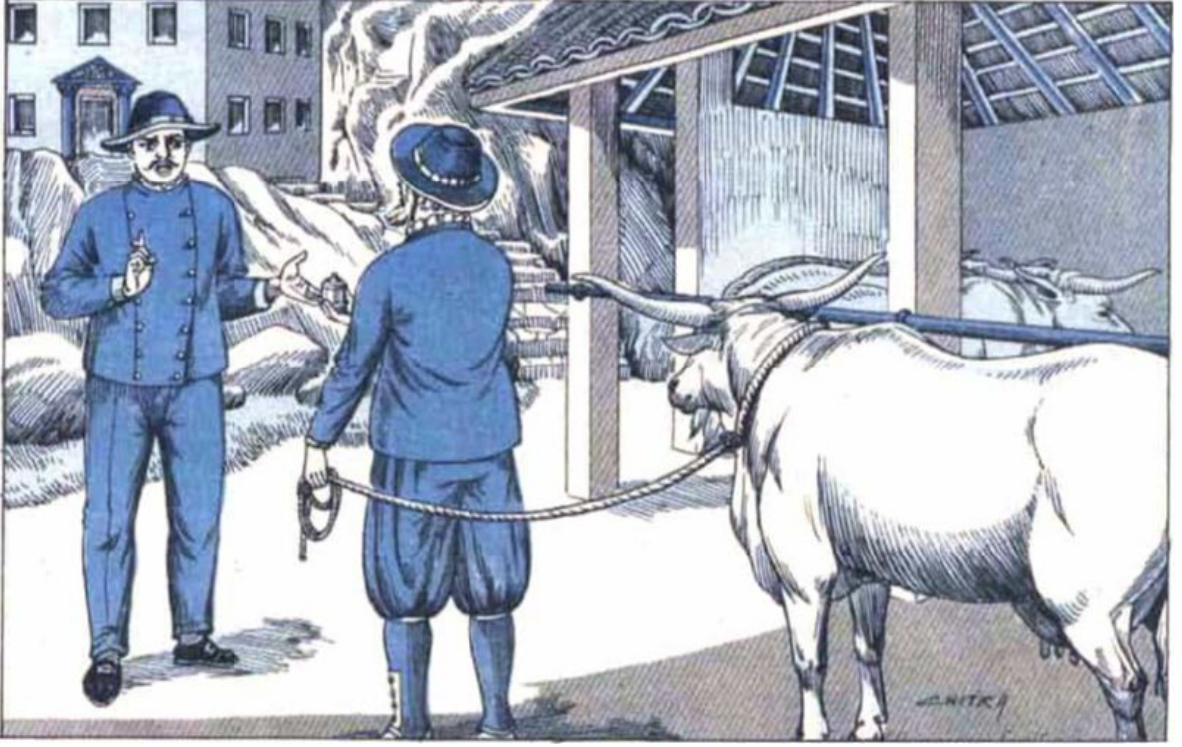
কিষান কৌটোটা নিতে নিতে বলল, 'আপনি কেন যে আমার প্রতি দয়ালু হয়েছেন, এত উপকার করছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লম্বা লোকটা হেসে বলল, 'তুমি একদিন আমার প্রতি দয়ালু হয়ে দুটো রুটি খেতে দিয়েছিলে, আমি-ই সেই নেকড়ে। আমি ভালোর কাছে ভালো, মন্দের কাছে মন্দ। যারা আমার অপকার করে, আমাকে খারাপ কথা বলে, তাদের আমি সময়মতো শিক্ষা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এবার তাহলে এসো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।'

এ-কথা শুনে কিষান অবাক হল এবং খুশি হল। তারপর সে কৌটো আর গোরু নিয়ে অন্য কোনো দিকে না গিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

ওই কৌটোটাতে যে কী আছে তা জানার কৌতূহল কিষানকে পেয়ে বসল। লম্বা লোকটা যেহেতু তার বউকে ওই কৌটো একান্তে খুলতে বলল, সেইহেতু সন্দেহ ও কৌতূহল প্রবলতর হল। কৌটোটা নাড়ল, কোনো শব্দ নেই। শুঁকল, কোনো গন্ধ নেই। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত নিজের কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারল না। গোরুটাকে চরতে ছেড়ে নিজে একটি গাছের নীচে বসে কৌটোটা খুলল। খুলেই হাত থেকে ফেলে দিয়ে কিষান যে ছিটকে গেল। কারণ কৌটোটা খুলতেই তা থেকে আগুনের ফোয়ারা ছুটে, সেই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সোজা উপরে উঠে গেল গাছে। গাছে আগুন ধরে গেল।

'বাপরে! কী কাণ্ডই না হত। বউ একান্তে খুললে তার মুখ চুল সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেদিন রাত্রে আমার বউ যে নেকড়েটাকে গালাগাল দিয়েছিল তারই বদলা নিতে লম্বা লোকটা আমার বউকে এই কৌটো দিয়েছে!' কিষান বিড়বিড় করে বলল।

একটার-পর-একটা গাছে আগুন লাগছিল। কিষান গোরুটাকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল। সমস্ত অরণ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গাছগুলো ওই দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিষান দম্পতি ওই গোরুটার জন্য বহুদিন সুখে ছিল।

৪০. চালবাজ

এক গ্রামে রাখালদাস নামে একটা লোক ছিল। তার পেশা ছিল মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। বিচারকরা তার বক্তব্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিত না। ফলে রাখালদাস গ্রামান্তরে, দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে লাগল।

পথে রাখালদাস এক টিন ঘি মাথায় করে এক বেনেকে যেতে দেখল। রাখালদাসের পেছনে একজন মজুর যাচ্ছিল।

রাখালদাস ওই মজুরকে বলল, 'ওহে, শোনো তোমাকে একটা মতলব দিচ্ছি, তাতে তোমারই উপকার হবে। একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। করবে?'

'উপকার হলে নিশ্চয় করব।' মজুর বলল।

'ওই যে বেনেটা যাচ্ছে মাথায় ঘিয়ের টিন নিয়ে, ওর ওই টিনটা কেড়ে নিতে নিতে বলবে ওটা তোমার। বেনে যদি বিচার চাইতে কোথাও যায়, আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব। আমার এই মিথ্যে সাক্ষীর জন্য আমাকে কিন্তু দু-টাকা দিতে হবে। আমার লাভ হবে দু-টাকা আর তুমি পাবে এক টিন ঘি। বুঝতে পেরেছ?' রাখালদাস বলল।

মজুর লোভে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বেনের কাছ থেকে ঘিয়ের টিনটা কেড়ে নিল। বলল, 'খুব মজা পেয়েছ না? আমার ঘিয়ের টিন মাথায় করে চলে যাচ্ছ?'

'এ কি, এ তো আমার। আমি পাশের গ্রাম থেকে কিনে আনছি।' বেনে বলল।

'বললেই হল? সাহস থাকেতো চলো বিচারকের কাছে। প্রমাণ হয়ে যাবে এ টিন আমার।' মজুর বলল।

দু-জনে মিলে বিচারকের কাছে গেল। ওদের পেছনে রাখালদাসও গেল।

দু-জনের কথা শুনে বিচারক বলল, 'তোমাদের দু-জনের কথা শুনে কে যে সত্যবাদী বুঝতে পারছি না।'

মজুর বলল, 'আজ্ঞে আমার ছেলে-মেয়ে-বউ আছে। আমি কি মিথ্যা কথা বলতে পারি? আমি সামনের গ্রামে আমার মেয়ের কাছে এই ঘি নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে বেনে আমার কাছ থেকে এই টিন কেড়ে নিতে চাইল। আমি বাধ্য হয়ে এই বেনেটাকে আপনার কাছে এনেছি।'
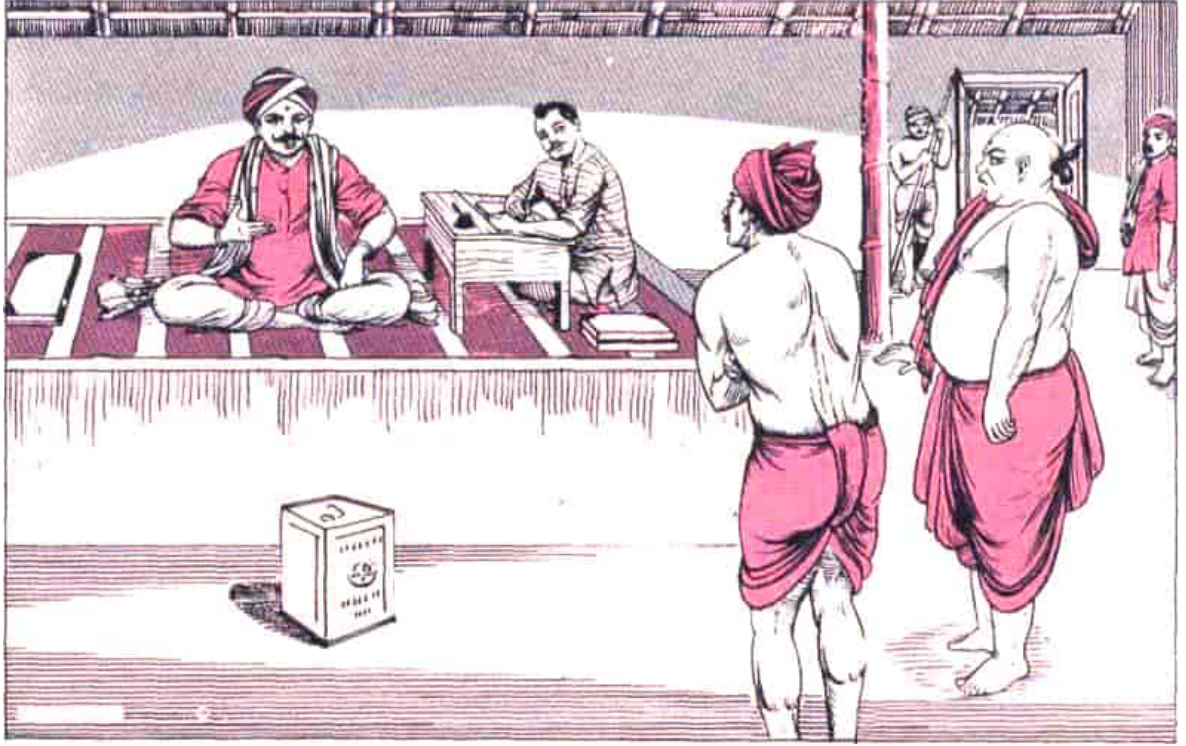
'তুমি যে কথা বলছ তা সত্য কি না প্রমাণ ছাড়া জানব কী করে?' বিচারক মজুরকে বলল।

'আজ্ঞে একজন পথিক দেখেছে। আমি খুঁজে দেখছি পথে তাকে পাই কি না।' বলে মজুর একটু দূরে গিয়ে রাখালদাসকে নিয়ে ফিরল।

বিচারক রাখালদাসকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এদের দু-জনকে চেনো?'

'আজ্ঞে পথে এদের দু-জনকে ঝগড়া করতে দেখেছি।' রাখালদাস বলল।

'তাহলে বল, এই ঘিয়ের টিন কার কাছ থেকে কে কেড়ে নিয়েছে?' বিচারক রাখালদাসকে জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে এই মজুর ঘিয়ের টিন মাথায় করে যাচ্ছিল। এই বেনে তার কাছ থেকে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিল। এ ছাড়া আর কিছু দেখিনি হুজুর।' রাখালদাস বলল।

রাখালদাসের কথা শুনে বিচারক ঘিয়ের টিন মজুরকে দিয়ে দিল। মজুর মহানন্দে ঘিয়ের টিন নিয়ে রাখালদাসকে দুটো টাকা দিয়ে দিল। তারপর তিন জনে পথ চলতে শুরু করে দিল। মজুর পা চালিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে ছিল রাখালদাস এবং বেনে।

রাখালদাসের চালবাজি বেনে বুঝতে পারল। বেনে মনে মনে ঠিক করল রাখালদাসকে ধোকা দিয়ে যেকোনোভাবে সে ওই ঘিয়ের টিন ফেরত নেবে।

বেনে রাখালদাসের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'দেখ ভাই আমি আগে ভেবেছিলাম তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখ। কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেল তোমার চেয়ে ওই মজুর

অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তোমার হাতে মাত্র দুটো টাকা দিয়ে ও কীরকম কুড়ি টাকার ঘি নিয়ে চলে গেল।'

এ কথা শুনে রাখালদাসের মুখ শুকিয়ে গেল। বেনে আবার বলল, 'তুমি যা করলে ওইরকম কাণ্ড করেই ঘিয়ের টিন পেয়েছি। এই ঘিয়ের টিন কিনে ক্রেতা দোকানদারকে টাকা দিচ্ছিল। আমি ঠিক তখনই ওই ক্রেতাকে ইশারায় টাকা দিতে বারণ করেছিলাম। ক্রেতা কী একটা ভেবে দোকানদারকে টাকা দিয়েছি বলল।

'দোকানদার টাকা পাইনি বলল। দু-জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। লোক জমে গেল। ভিড়ের ভেতর থেকে আমি দোকানদারকে বললাম, আরে মশাই আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, আমি নিজে দেখেছি আপনাকে টাকা দিতে।

'আমার কথা শুনে সবাই দোকানদারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে ক্রেতা ঘিয়ের টিন নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

'আমি তার পেছনে পেছনে গেলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে দুটো টাকা দিতে চাইল। কিন্তু আমি তো আর পাগল নই যে মাত্র দু-টাকা নিয়ে আস্ত একটা ঘিয়ের টিন ছেড়ে দেব।

'শেষে আমি ওই ক্রেতার হাতে দু-টাকা দিয়ে এই ঘিয়ের টিনটা নিয়েছিলাম। তুমিও চালাকি করেছ বটে কিন্তু শেষে কী পেলে? যা পেলে তাতে আমার হাসি পাচ্ছে। দুঃখও হচ্ছে। মাত্র দুটো টাকা। এখন মজুর যেভাবে আমার কাছ থেকে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিয়েছে তুমিও সেভাবে তার কাছ থেকে কেড়ে নাও। আমি তোমাকে সাহায্য করব। পরিবর্তে তুমি আমাকে কিছু দিও।' বেনে বলল।

রাখালদাস তাড়াতাড়ি হেঁটে মজুরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ঘিয়ের টিন তুমি অনেক দূর বয়েছ। এবার আমাকে দাও।'

'সে কি! তোমার সাক্ষীর জন্য তোমাকে তো দু-টাকা দিয়েছি। আমাকে ধোকা দেবার চেষ্টা করো না। খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।' মজুর গর্জে উঠে বলল।

রাখালদাস জোর করে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিতে চাইল। মজুর মাথা থেকে ঘিয়ের টিন নাবিয়ে রেখে রাখালদাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-জনে যখন একে অন্যকে প্রচণ্ডভাবে মারছিল তখন বেনে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে আহত হয়ে দু-জনেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। হঠাৎ ওরা দু-জনে দেখতে পেল ঘিয়ের টিন সেখানে নেই। বেনেকেও তারা দেখতে পেল না।

৪১. ফসল

কৃষ্ণদাস ও আবুল দুই বন্ধু। ওরা দু-জনে রামপুর গ্রামে এক বাগান কিনেছিল।

কৃষ্ণদাস চাষের কাজ ভালো জানত না। ভালো-মন্দর সব কিছুর ভার ভগবানের ওপর চালিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে সে দিনের পর দিন বসে থাকত।

আবুল খেত খামারের কাজ খুব ভালো জানত। সারাদিন কাজ করত। ঘাস উপড়ানো, চারা গাছ পোতা, প্রত্যেকটা গাছ জল পাচ্ছে কি না লক্ষ রাখা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকত।

সে বছর ফসল খুব ভালো হয়। ফসল বিক্রি করে ওরা ভালো টাকা পায়। তারপর সমস্যা দেখা দিল টাকাটা কীভাবে ভাগ করবে তা নিয়ে। সমান ভাগ হোক এটা দু-জনের মধ্যে কেউ চায় না।

'আমি সারাদিন খেটেছি, আমার তো বেশি পাওয়া উচিত।' আবুল বলল।

'আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, আমার ওপর খুশি হয়ে ভগবান বেশি ফসল দিয়েছেন। অতএব আমারই বেশি পাওয়া উচিত।' কৃষ্ণদাস জোর দিয়ে বলল।

দু-জনে কথা কাটাকাটি করে শেষে গেল গ্রামের মাতব্বরের কাছে। মাতব্বর দু-জনের কথা শুনে বলল, 'আমি তোমাদের দু-জনকে একটা ছোটো কাজ দিচ্ছি। আজ রাত্রের মধ্যে সেই কাজ করে কাল সকালে আমার সাথে দেখা কর। তখন তোমাদের বিচার করব।'

দু-জনকে দু-বস্তা করে ধান দিয়ে মাতব্বর বলল, 'এই ধান ভেঙে কাল আমার কাছে নিয়ে এসো।'

দু-বস্তা করে ধান নিয়ে কৃষ্ণদাস ও আবুল যে-যার বাড়ি ফিরে গেল।

কৃষ্ণদাস ধান ভাঙার ভার ভগবানের ওপর চাপিয়ে, ভগবানের প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবুল সারারাত ধরে মাত্র এক বস্তা ধান ভাঙতে পারল।

মাঝরাতে মাতব্বর দু-জনেরই ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করে আবুলের ঘর থেকে ধান ভাঙার শব্দ শুনল কিন্তু কৃষ্ণদাসের ঘর থেকে কোনো আওয়াজ পেল না।

পরের দিন কৃষ্ণদাস এবং আবুল ওই বস্তাগুলো নিয়ে মাতব্বরের কাছে এল। মাতব্বর কৃষ্ণদাসের বস্তা খুলে দেখে একটিও চালের কণা নেই। কৃষ্ণদাস ভেবেছিল ভগবান সব ধান চাল করে দিয়েছে। কিন্তু বস্তা খোলার পর যা দেখল তাতে সে অবাক হল। সে ভেবেছিল সমস্ত ধান ভগবান চাল করে দেবে। কিন্তু বস্তায় ছিল শুধু ধান।

আবুল যে বস্তা দুটো নিয়ে এল তার মধ্যে একটিতে চাল অন্যটিতে ধান ছিল।

'কৃষ্ণদাস, দেখলে তো? পরিশ্রম ছাড়া ফল পাওয়া যায় না। তুমি ভগবানের উপর শুধু নির্ভর করেছিলে। তার ফলে তুমি তাঁর অনুগ্রহ পাওনি। ভগবান তোমাকে অনুগ্রহ যদি করতেন তিনি তোমাকে খাটাতেন, ধানগুলো চাল হত। খেতে যে ফসল হয়েছে তা আবুলের পরিশ্রমের ফলে হয়েছে। তুমিও আবুলের সাথে পরিশ্রম করলে আরও অনেক বেশি ফসল ফলত। বেশি রোজগার হত। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তোমরা দু-জনে একসাথে কাজ করে আরও বেশি ফসল ফলাও আর যা পাবে তা দু-জনে সমান ভাবে ভাগ করে নাও।' মাতব্বর বলল।

তারপর থেকে কৃষ্ণদাস আবুলের সাথে কাজ করত। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ওই দুই বন্ধুর মধ্যে কোনোদিন বিবাদ হয়নি।

৪২. রানি-দাসী

বৈশালী নগরে হীরাদত্ত নামে এক ধনী ছিল। তার বহু বছর কোনো সন্তান ছিল না। শেষে চল্লিশ বছর বয়সে সোনার পুতুলের মতো তার এক কন্যা হল। ফলে হীরাদত্তের আনন্দের আর সীমা ছিল না।

কিন্তু তার সেই আনন্দ অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুঃখে পরিণত হল। সেই শিশুটিকে একদিন বাইরের দোলনায় দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কোত্থেকে এক বিরাট বাজ (পাখি) এসে সেই শিশুটিকে ঠোঁটে আর পায়ে জড়িয়ে ধরে উড়ে চলে গেল। হীরাদত্ত সমস্ত শিকারিকে খবর পাঠালেন ওই বাজকে শিকার করে নিজের শিশুটিকে উদ্ধার করতে। প্রত্যেক দেশে ঢাক পিটিয়ে দিলেন যে ওই শিশুকে এনে দেবে সে যত ধন চাইবে তাকে তত ধন দেওয়া হবে।

কিন্তু কোনো ফল হল না। শিশু পাওয়া গেল না। তার কারণ ওই বাজ আসলে কোনো বাজ ছিল না। ছিল এক অভিশপ্ত যক্ষিণী। যক্ষলোক থেকে কিছুদিনের জন্য সে এসেছিল পাখির রূপ ধরে। আকাশে উড়তে উড়তে হীরাদত্তের শিশুকন্যাকে দেখে তার ভীষণ ভালো লাগল। সে ঠিক করল তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজে লালনপালন করবে।

পাখি যেহেতু তুলে নিয়ে গেল সেইহেতু সেই কন্যার নাম হল শকুন্তকুমারী। যক্ষিণীর যত্নে লালিতপালিত হওয়ার ফলে তার অনেক জ্ঞান হয়েছিল। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সে ষোলো বছরে পরিণত হল।

তখন একদিন যক্ষিণী শকুন্তকুমারীকে বলল, 'শোনো মা, আমার অভিশপ্ত থাকার দিন শেষ হয়েছে। এবার আমি নিজের লোকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ। যেকোনো রাজকুমার তোমাকে দেখেই সানন্দে বিয়ে করতে চাইবে। তুমি এই পথে গেলে সোজা তোমার মা-বাবার কাছে বৈশালী নগরে পৌঁছে যাবে। তুমি তোমার মা-বাবার সাথে দেখা করে যোগ্য লোককে বিয়ে কর। আর আমার কাছে যা শিখেছ তা প্রয়োগ করে সুখী জীবনযাপন কর।' এ কথা বলে যক্ষিণী মুহূর্তে নিজের লোকে চলে গেল।

শকুন্তকুমারী নিজের অধিকাংশ জীবন অরণ্যে কাটিয়েছিল বটে তবে শহুরে জীবনের আদবকায়দাগুলো তার শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে ঠিক করল শহুরে জীবনে প্রবেশ করবে। তারপর সে বৈশলী নগরের দিকে চলে গেল।

জঙ্গলের পথে এগোতে এগোতে সে এক জায়গায় এক বিচিত্র মহল দেখতে পেল। শান্তকুমারী সেই মহলে ঢুকল। তাতে হাতি, ঘোড়া, দ্বারপাল, চাকর-বাকর, দাস-দাসী সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। এ-ঘর ও-ঘরের পর সে ঢুকল শয়নকক্ষে।

সেই শয়নকক্ষে এক সুন্দর রাজকুমার ঘুমিয়ে ছিল। ওই কক্ষের দরজার উপর এক ছবি ঝুলছিল। সেই ছবিও ওই রাজকুমারের ঘোড়ায় বসে থাকার ছবি। ওই ছবির রাজকুমারের গলায় একটা হার আছে। কিন্তু ঘুমন্ত রাজকুমারের গলায় ছিল না। ওই হার রাজকুমারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা এক কৌটোতে ছিল।

শকুন্তকুমারী ভাবল, এই হারের সাথে রাজকুমারের ঘুমের একটা সম্পর্ক আছে। তার ভাবনা সত্য কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে ওই হার নিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারের বুকে ঠেকাল। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার নড়েচড়ে উঠল। যেন এক্ষুনি জেগে উঠে বিছানায় বসে পড়বে।

রাজকুমারী আবার সেই হার তুলে নিয়ে কৌটোতে রেখে দিল। অনেক পথ হাঁটার ফলে তার কাপড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। ছিঁড়েও গিয়েছিল। তাই সে ভাবল রাজকুমারের জেগে ওঠার আগে ওই রাজমহলের ভালো কাপড় পরে নেবে। তার আগে চান করে নেবে। ফলে তাকে অনেক সুন্দর দেখাবে।

সে ওই কক্ষ থেকে ভালো ভালো কাপড় নিয়ে স্নান করতে গেল। স্নান করতে গিয়ে সে দেখতে পেল এক কুঁজো মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। মেয়েটি দেখতে যেমন কুঁজো তেমনি কদাকার। কিন্তু ওকে দেখে শকুন্তকুমারীর কেমন যেন মায়া হল। ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? কাঁদছ কেন?'

'আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি মরতে। বাঘের পেটে যেতে চাই। এ ছাড়া আর কোনো পথ আমার সামনে খোলা নেই।' কুঁজো মেয়েটা ভারী গলায় বলল।

'তুমি অত ভেবো না। আমি তোমার খাওয়া-পরার ভার নেব। তুমি এই মহলের কাছে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুনি স্নান করে যাচ্ছি।' শকুন্তকুমারী বলল।

কুঁজো মেয়েটা রাজমহলে ঢুকে রাজকুমারের শোবার ঘরে চলে গেল। সেখানে ওই কোটো দেখে তার কেমন সন্দেহ জাগল। বের করল ওই হার। পরিয়ে দিল রাজকুমারের গলায়। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বিছানা থেকে উঠে পড়ল। পরক্ষণে রাজমহলের সবাই জেগে গেল।

তার ঘুম ভাঙিয়েছে বলে রাজকুমার ওই কুঁজো মেয়েটার সাথেই বিয়ে করবে স্থির করল।

'আমি এক রাজকুমারী। আমার দাসী এক্ষুণি আসছে।' কুঁজো মেয়েটা রাজকুমারকে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শকুন্তকুমারী সেখানে এল। রাজমহলের সবাইকে জাগা দেখে শকুন্তকুমারী ভাবল যে একটা ধোকাবাজি হয়েছে। যা ভেবেছিল তাই। শকুন্তকুমারীকে দেখেই ওই কুঁজো মেয়েটা বলে উঠল, 'এই যে আমার দাসী এসে গেছে।'

শকুন্তকুমারী কুঁজো মেয়েটাকে অনেক গালাগাল দিয়ে রাজকুমারকে সমস্ত ঘটনা জানাল।

তা শুনে রাজকুমার বলল, 'তোমাদের দু-জনের মধ্যে কে যে দাসী আর কে যে রানি, কে যে কাকে ধোকা দিচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছি। আমার ঘুম ভাঙার পরেই এই কুঁজো মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছি। তাই আমার ধারণা আমি এর কাছে ঋণী।' রাজকুমার বলল।
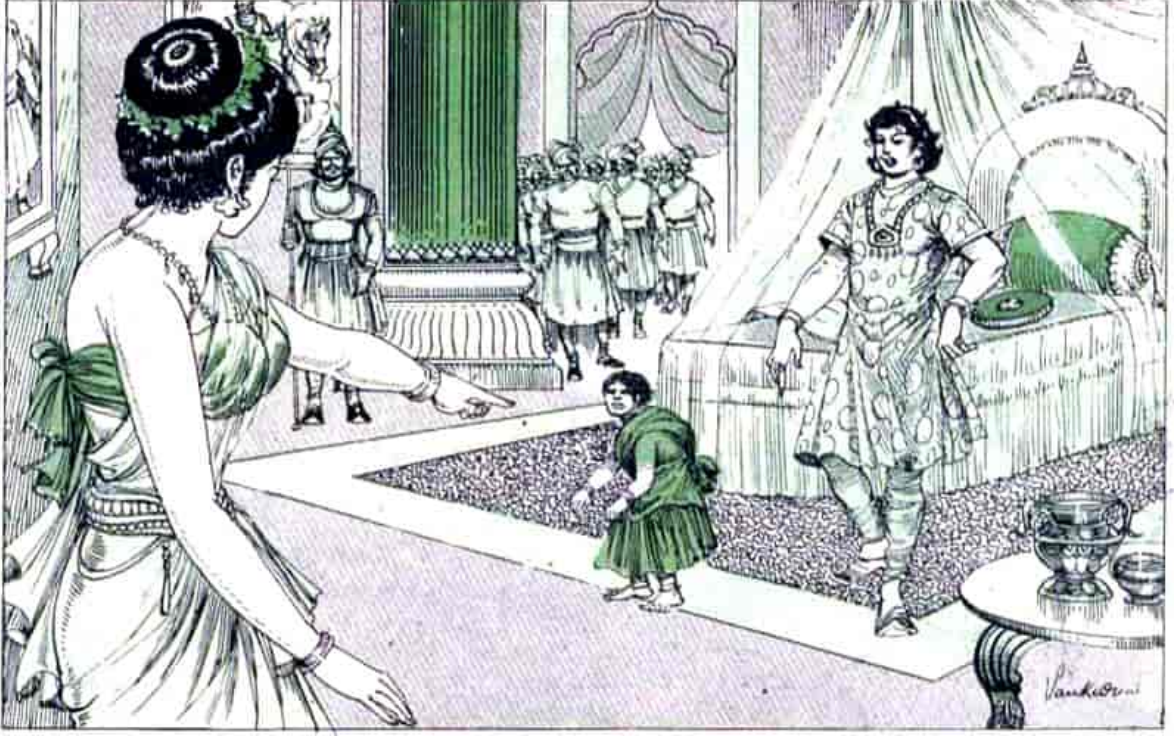
'কে যে রানি আর কে যে দাসী তা আমি এক্ষুনি প্রমাণ করে দেব। কতকগুলো কাগজে আমি ''রানি'' এবং ''দাসী'' লিখে সমস্ত টুকরো একটা বাক্সে ঢালব তার থেকে আমি যেগুলো তুলবো সেসব হবে ''রানি''। তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে কে রানি আর কে দাসী।' বলল শকুন্তকুমারী।

কুঁজো মেয়েটা এই প্রস্তাবে রাজি হল। শকুন্তকুমারী অনেকগুলো কাগজের টুকরোতে রানি এবং দাসী লিখে একটা বাক্সে ফেলে চোখ বুজে সেই বাক্স থেকে 'রানি' লেখা সমস্ত কাগজের টুকরো তুলে ফেলল। বাক্সে যে কাগজের টুকরো পড়েছিল তার প্রত্যেকটাতে লেখা ছিল 'দাসী'।

তা দেখে কুঁজো মেয়েটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। নিজের অপরাধ স্বীকার করল। শকুন্তকুমারী ওই কুঁজো মেয়েটাকে ক্ষমা করে নিজের দাসী হিসেবে রেখে দিল। তারপর রাজকুমার ও শকুন্তকুমারীর বিয়ে খুব ঘটা করে হল। সেই বিয়ে দেখতে বৈশালী নগর থেকে শকুন্তকুমারীর মা-বাবাও এলেন। যে মেয়েকে পাওয়ার কোনো আশাই কোনোদিন করেনি সেই মেয়েকে পেয়ে তাঁরা খুব খুশি হলেন।

তারপর শকুন্তকুমারী সমস্ত ঘটনা মা-বাবাকে জানাল। তার মা বলল, 'সব তো বুঝলাম। কিন্তু বেছে বেছে শুধু রানি লেখা কাগজের টুকরো বের করলি কী করে মা?'
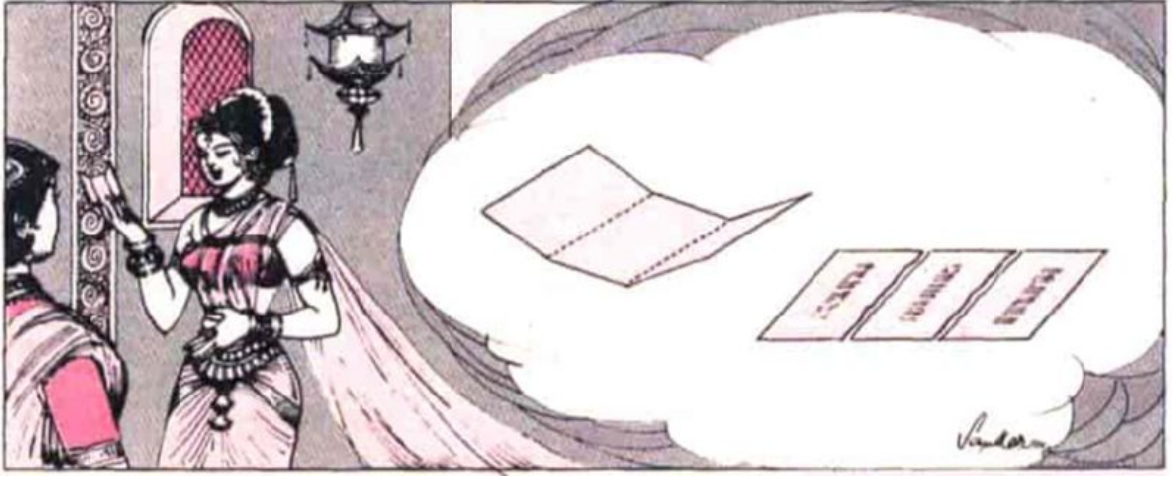
শকুন্তকুমারী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'কাঁচি দিয়ে কাটা কাগজের টুকরোগুলোর প্রত্যেকটা তিন ভাঁজে ভাগ করলাম। তার মাঝের ভাগে 'রানি' লিখে বাকি দুটোতে 'দাসী' লিখেছিলাম। তারপর ছিঁড়ে ফেললাম। ফলে, 'রানি' লেখা প্রত্যেক টুকরোর দু-দিকে অসমান ছিল। আর 'দাসী' লেখা টুকরোর একদিকে মসৃণ ও অন্যদিকে অসমান ছিল। তাই আমি 'রানি' লেখা কাগজ বেছে বেছে তুলে নিতে পেরেছি। কুঁজো মেয়েটা আমাকে একবার ধোকা দিয়েছিল, আমিও বাধ্য হয়ে তাকে ধোকা দিয়ে প্রতিশোধ নিলাম।

৪৩. শ্রমের ফল

পাথর প্রতিমা গ্রামে মঙ্গল চৌধুরি নামে এক জমিদার ছিল। সে ছিল ভীষণ রাগী। কিন্তু তার মধ্যে একটা ভালো গুণও ছিল। সততার সাথে যারা কাজ করত তাদের সে দয়াদাক্ষিণ্য দেখাত।

মঙ্গল চৌধুরি নিজের খেতের কাজ করানোর জন্য দু-জন কিষানকে নিয়োগ করল। তাদের একজনের নাম সমর অন্য জনের নাম সূর্য। সমর খুব কাজ করত। সূর্যের কাজের দিকে মন ছিল না। সমর সবসময় কাজ করত। সূর্য কাজে ফাঁকি দিতে পারলে বেঁচে যেত।

প্রথম দিন কাজে লেগে সমর কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু সূর্য ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে দিল প্রথম দিন থেকেই। কোথায় যেন সে বেড়াতে চলে গেল। সন্ধের সময় কাজ শেষ করে সমর বলদগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিজের হাত-পা ধুল। তখন সূর্য সেখানে গিয়ে নিজের বলদের গায়ে মাটি লাগিয়ে নিজের গায়েও কাদা মেখে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি জমিদার বাড়ি পৌঁছে গেল।

মঙ্গল চৌধুরি তাকে দেখেই ভাবল সূর্য নিশ্চয় সারাদিন ভীষণ কাজ করেছে। সে স্ত্রীকে বলল, 'দেখ, আমার মনে হচ্ছে সূর্য খুব কাজের ছেলে। ওকে বেশি করে খেতে দিয়ো।'

সমর বলদ নিয়ে জমিদার বাড়ি পৌঁছাল। বলদের গায়ে বা সমরের গায়ে কাদার ছোপ ছিল না। সমরকে দেখে মঙ্গল চৌধুরি ভাবল সে কাজ করেনি।

সেদিন থেকে যতটুকু না খাওয়ালে নয় ততটুকুই সমরকে খাওয়ানো হত। আর সূর্য খেত কাঁড়ি কাঁড়ি।

মঙ্গল চৌধুরির মেয়ে কমলা খুব চালাক চতুর মেয়ে। ওদের খাবার সময় লক্ষ করে কমলা বুঝতে পারে যে সমর বেচারা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। অপরপক্ষে সূর্য প্রয়োজনের বেশি খাচ্ছে। ওদের বিষয়ে বাবার বিচার বিবেচনা সঠিক কি না যাচাই করার জন্য একদিন কমলা খেতে গেল। উদ্দেশ্য, ওদের কাজকর্ম দেখা। খেতে সমর একাই কাজ করছিল। সূর্যের অপেক্ষায় থেকে থেকে শেষে তাকে খুঁজতে আরম্ভ করল কমলা। দেখতে পেল সূর্য দূরের এক গাছের নীচে ঘুমোচ্ছে। যারা খাটে তাদের প্রতি বাবার মতো কমলাও খুব দরদি। সে সমরের কাছে গিয়ে কাজের ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করল। ওর কাজ করার পদ্ধতি অনেকক্ষণ দেখে খুশি হয়ে সে বাড়ি ফিরল। সূর্য গায়ে কাদা মেখে কীভাবে যে বাবাকে ঠকাচ্ছে তা সে বুঝতে পারল।

বাড়ি ফেরার পর সে তার বাবাকে বলল, 'বাবা, খেতের সমস্ত কাজ একা সমরই করছে। সূর্য সারাদিন গাছের নীচে ঘুমিয়ে সন্ধের সময় বলদের গায়ে আর নিজের গায়ে কাদা মেখে বাড়ি ফেরে। তা দেখে তুমি ভাব যে সূর্য বেশি খাটছে। সেইজন্যই তাকে বেশি খেতে দাও। ও যা খায় তা তার হজম হয় না। তাই সে যখন-তখন উপোস করে। আর সারাদিন যে খেটে মরছে সে বেচারা খেতে পাচ্ছে না। ও বেচারা না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে।' কমলা বলল।

সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যকে মঙ্গল চৌধুরি বলল, 'কি রে, কাজ কর্ম না করে গায়ে কাদা মেখে বাড়ি ফিরছিস?'

'আজ্ঞে, আমি সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফিরছি। আপনাকে কেউ হয়তো মিথ্যে কথা বলেছে!' বলল সূর্য।

ততক্ষণে সমর ফিরল। মঙ্গল চৌধুরি সমরকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বলত, সূর্য কি সারাদিন খেতের কাজ করে?'

'সূর্যকে আমি কাজ করতে কখনো দেখিনি বাবু।' সমর বলল।

'তাহলে এ-কথা আমাকে এতদিন কেন বলনি?' মঙ্গল চৌধুরি সমরকে জিজ্ঞেস করল।

'আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি বলে আমি আপনাকে বলিনি। আমি তো আর তার কাজকর্ম দেখার জন্য নই।' সমর বলল।

এ-কথা শুনে মঙ্গল চৌধুরি সূর্যের দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি কাজ করছ না বলে আমার মেয়ে বলেছে। এখন সমরও বলল। এবার তুমি কী বলবে?'

সূর্য তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ্ঞে হুজুর আসল ব্যাপার তা নয়। আপনার মেয়ে প্রত্যেকদিন খেতে গিয়ে সমরের সাথে গল্পগুজব করে। পাছে আমি তা প্রকাশ করে ফেলি তাই ওই দু-জন আমার বিরুদ্ধে যা তা লাগাচ্ছে।' বলল সূর্য।

মঙ্গল চৌধুরি তড়িঘড়ি করে কাজ করার লোক। সে আর কাল বিলম্ব না করে সমরকে ভীষণ মেরে কমলাকে বলল, 'আবার যদি কোনোদিন খেতে যাবি তো তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।' সেদিন রাত্রে সমরের খাওয়াও বন্ধ করে দিতে মঙ্গল চৌধুরি তার স্ত্রীকে বলল।

সূর্য ভীষণ খুশি। ভাবল আর কেউ তার কাজের দিকে নজর রাখবে না।

সূর্য যেভাবে মিথ্যা কথা বলে অন্যদের দোষী করল তাতে কমলার মনে অদ্ভুত একটা ধারণা হল। বাবার কাছে সমরের মার খাওয়ার পর থেকে তার প্রতি আরও বেশি করে টান অনুভব করল কমলা।

সেই রাত্রে সে খাবার নিয়ে গিয়ে সমরকে গোপনে খাওয়াল। তারপর নিজের মাকে সূর্যের মিথ্যা অপকর্মের কথা বলল। তার জন্য সমর যে কীভাবে মার খেল তাও জানাল। বলল, 'জানো মা, সমর সত্যি খুব কাজের লোক। খুব সৎ। আমি যে প্রত্যেকদিন খেতে গিয়ে তার সাথে ভালো ভাবে কথা বলিনি, সেটা আমারই অপরাধ হয়েছে।'

মেয়ের মনের অবস্থা মা বুঝল। পরের দিন সমর এবং সূর্য খেতে যাওয়ার পর সে তার স্বামীকে বলল, 'ওদের কাজে নেবার পর থেকে আপনি একদিনও খেতে যাননি। কেমন কাজ হচ্ছে আপনিও একবার দেখে আসুন না।'

স্ত্রীর কথা সত্য ভেবে মঙ্গল চৌধুরি দুপুরে খেতে কাজ দেখতে গেল। দেখল সমর একমনে খেতের কাজ করছে। মনে হচ্ছে যেন সে নিজের খেতে কাজ করছে। আর সূর্য গাছের নীচে টেনে ঘুমোচ্ছে। তখন মঙ্গল চৌধুরি ভাবল মেয়ে কমলার কথাই সত্য। নিজের মারাত্মক ভুলের জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত হল। কাজে ফাঁকি যে লোকটা দিল, তাকে সে ভরপেট খাইয়েছে আর যে খেটে মরছে তাকে না খাইয়ে মেরেছে। ওই ফাঁকিবাজটার কথা

শুনে সমরকে মেরে কী ভুল না করেছে। এই সব কথা ভেবে মঙ্গল চৌধুরি লজ্জায় অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরল।

স্ত্রীকে জানাল সব ব্যাপার। সে ভেবে পাচ্ছিল না কীভাবে সে নিজের কাজের সংশোধন করবে।

'আপনি প্রত্যেকটি কাজ তড়িঘড়ি করে করেন। ফলে এক করতে আর এক হয়। মেয়ে আমাকে আসল ব্যাপার জানিয়েছে। সমর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। সে যেন আমাদেরই পরিবারের একজন। সমরের সাথেই কমলার বিয়ে হলে মেয়ে-জামাই আমাদের চোখের সামনেই থাকবে।' স্ত্রী বলল।

স্ত্রীর কথা শুনে মঙ্গল চৌধুরির মনে হল বহু সমস্যা তার সমাধান হয়ে গেছে। সেই জন্য স্ত্রীর পরামর্শ কার্যকরী করার কথা ভাবল। সেই সন্ধের আগে মঙ্গল চৌধুরি কয়েকটা বিষয়ে ঠিক করে নিল।

সমর ও সূর্য বাড়ি ফেরার পর মঙ্গল চৌধুরি সূর্যকে বলল, 'আরে এই সূর্য, সমরের গায়ে আচ্ছা করে হলুদবাটা ঘষে তাকে গরম জলে স্নান করাও।'

'আপনি কী বলছেন। আমি সারাদিন খেটেখুটে এসেছি, আমি এই ফাঁকিবাজটাকে চান করাব!' সূর্য বলল।

'যা বলছি তা মুখ বুজে না করলে তোর হাড়গোড় ভেঙে দেব।' মঙ্গল চৌধুরি বলল।

সূর্য কর্তার মেজাজ বুঝে আর কোনো কথা বলল না। সমরের গা হলুদ তেল দিয়ে ঘষে মালিশ করে তাকে গরম জলে ভালো করে স্নান করাল। এসব যে কেন হচ্ছে তা সমর বুঝতে পারল না। স্নান করানোর পর মঙ্গল চৌধুরি সমরকে নিজের সাথে একসারিতে খেতে বসাল। সমর অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে দেখে মঙ্গল চৌধুরি তাকে বলল, 'সমর খাও। একসারিতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি কারণ তুমি যে আমার ভাবী জামাই।'

তখন সমর সব বুঝতে পারল। তারপর, এক ভালো দিনক্ষণ দেখে মঙ্গল চৌধুরি সমর ও কমলার বিয়ে ঘটা করে দিল।

এই ঘটনার পর সূর্য বুঝতে পারল যে সৎ এবং পরিশ্রমী লোক সুখী হয়। সেদিন থেকে সূর্য সততার সাথে কাজ করতে লাগল। তার এই পরিবর্তন দেখে মঙ্গল চৌধুরি খুশি হল।

৪৪. অসভ্য

বাগদাদ শহরে আহমদ নামে এক খলিফা শাসন করতেন। তাঁর মনে ছিল অনেক দেশ জয় করে বাদশাহ হবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর মেয়ে মেহর পছন্দ করত না বাপের এই ইচ্ছা।

খলিফা মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন।

'আমাকে যে বিয়ে করতে আসবে তাকে আমি একটা গল্প বলব। তারপর তাকে একটা প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব যে দিতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব।' মেহর বলল। খলিফা এই শর্ত মেনে নিলেন।

মেহরের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারলে পাছে অপমানিত হতে হয় সেই ভয়ে অনেক যুবক কেটে পড়ল। কিন্তু এক সুলতানের যুবক পুত্র রজাক মেহরের প্রশ্নের জবাব দিতে চাইল।

রজাকসহ দরবারের সমস্ত লোকের সামনে মেহর এই কাহিনি শোনাল'প্রাচীন কালে ইজিপ্টে আবদুল সামাদ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই রাজা অত ছোটো রাজ্যে যেন খুশি ছিলেন না। তাই বিরাট এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে পররাজ্য আক্রমণ করতে বেরুলেন। আফ্রিকার বহু রাজা বশ্যতা স্বীকার করলেন।

'কিন্তু বেটসুফা নামে, একজন কোনোক্রমেই বিনা যুদ্ধে আবদুলের বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না। তার গোটা রাজ্য ছিল পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। তার সেনারাও জঙ্গলেই ছিল। তিনি অতির্কিতে এক-এক বার ইজিপ্টের সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিতেন। তাঁকে সামনাসামনি মোকাবিলা করা আবদুলের সেনাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

'আসলে বেটসুফার রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্য ছিল না। আবদুল চেয়েছিলেন বেটসুফা তার বশ্যতা স্বীকার করুক, তার কাছে পরাধীনের মতো থাকুক। এই ছিল আবদুলের চাহিদা। আবার বেটসুফার মত ছিল স্বাধীনভাবে বাঁচব। তাঁর এই বাঁচার স্বাদ ঘুচিয়ে দিতে চান আবদুল।

'শেষে কোনোক্রমেই যখন পেরে উঠতে পারলেন না তখন আবদুল নিজের সেনাদের দিয়ে বেটসুফার রাজ্যের সমস্ত বনজঙ্গল কাটিয়ে দিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে দিলে বেটসুফার সেনারা লুকোতে পারবে না। লুকোতে না পারলে সহজেই তাঁর সেনাদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে।

'অন্য দিকে বেটসুফা বাধ্য হয়ে আবদুলকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে তৈরি হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ইজিপ্টের সেনারাই জয়ী হল। জয়ী হলেও বেটসুফার সেনারা নানান কায়দায় আবদুলের বহুগুণ বেশি সেনা খতম করল। বেটসুফার সেনারা বীরের মতো মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে গেল।

'যুদ্ধের শেষে বেটসুফার মৃতদেহ দেখার ইচ্ছে জাগল আবদুলের। কয়েক জন সেনাকে নিয়ে আবদুল যুদ্ধক্ষেত্রে গেল।

'যুদ্ধক্ষেত্রে বহু মৃত দেহের মাঝে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কলো ছায়ামূর্তি চারদিকে তাকাচ্ছে।

'এই ছায়ামূর্তি কার?' আবদুল তার সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি আফ্রিকার জঙ্গলে মাংসখেকো মানুষ আছে। আমার ধারণা এ হয়তো মৃতদেহগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে এসেছে।' বলল সেনাপতি।

'এ-কথা শুনে আবদুল ওই ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার যতগুলো দরকার নিয়ে যাও। অমন ঘুরে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী খুঁজছ?'

'এতগুলো মৃতদেহ কোনো লোক নিশ্চয় খাবার জন্যেই মেরেছে। আমার তো একটা মৃতদেহ হলেই চলবে। আমি খুঁজছি সেই লোকটাকে যে এতগুলো মৃতদেহ খেতে চায়, যে লোকটা এতগুলো মানুষকে মেরে ফেলেছে। তা ছাড়া ওই লোকটার অনুমতি না নিয়ে আমিই বা একটা মৃতদেহ নেব কী করে।' কালো মূর্তি বলল।

এ-কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে আবদুল বলল, 'আরে এসব তো আমি মেরেছি। তবে তুমি যে ভাবছ এসব খাবার জন্য মেরেছি তা নয়, বুঝলে?'

কালো মূর্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কীসের জন্য এতগুলো লোককে মেরে ফেলেছ?'

তখন সেই রাজা আবদুল নিজের সেনাপতিকে বলল, 'আফ্রিকার এই লোকগুলো এত অসভ্য যে এদের কিছু বোঝানো যায় না। এমন অদ্ভুত প্রশ্নের কী জবাব দেব?'

কালো মূর্তি হো-হো করে হাসতে হাসতে কোথায় যেন চলে গেল।'

মেহর এই কাহিনি শুনিয়ে যুবরাজ রজাককে জিজ্ঞেস করল, 'কালো মূর্তি হো-হো করে হাসল কেন?'

'অসভ্য এবং জংলি আফ্রিকার ওই কালো লোকটা একমাত্র খিদে পেলেই মানুষকে মেরে ফেলে। কিন্তু নিজেকে সভ্য জগতের লোক ভেবে শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য আবদুল হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলল। ভালোভাবে দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব ওই দু-জনের মধ্যে কে অসভ্য। সেইজন্যেই কালো লোকটা হাসল।' রজাক জবাবে বলল।

রজাকের জবাবই সঠিক জবাব বলে মেহর ঘোষণা করল। তারপর তাদের দু-জনের বিয়ে হল।

মেহর যে কাহিনি শোনাল এবং রজাক মেহরের প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর দিল--- সব শুনে মেহরের বাপের মনে পররাজ্য আক্রমণের যে প্রচণ্ড আকাঙ্খা ছিল তা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে লাগল।

৪৫. হারানো আংটি

এক শবর রাজার কাছে ইল্ল ও মল্ল নামে দু-জন চাকর ছিল। দু-জনেই বিশ্বাসী পাত্র। কিন্তু রাজা ইল্লকে বেশি ভালোবাসত।

একদিন রাজা দু-জনকেই ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'তোমরা দু-জনে ছুটি নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে যাও। তিন দিন পরে এখানে একটা মেলা বসবে, সেই মেলা দেখতে অবশ্যই এসো। নাও, তোমরা দু-জনে এই পুরস্কার নাও।' এ-কথা বলে রাজা ইল্লকে একটা ছোটো পাথর এবং মল্লকে একটা কন্দ দিল।

রাজা ইল্লকে একটা পাথর দেওয়ায় ইল্ল মনে মনে ভীষণ চটে ছিল। সে বলল, 'এই ফালতু পাথরটা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকারটা কি!'

'না না অমন কাজ করো না। আমি এই কন্দ বইতে পারছি না। নিজেদের জিনিস বদল করে নি।' মল্ল বলল।

দু-জনে পুরস্কার অদলবদল করে বাড়ি ফিরে গেল। ইল্ল কন্দ রান্না করিয়ে খেয়ে ফেলল। বাড়ির আঙিনায় মল্ল জ্যোৎস্না রাতে বসে সেই পাথরটা যাচাই করছিল। ঠিক সেইসময় পাথরের এক কোণ থেকে কী যেন চমকাচ্ছিল দেখতে পেল মল্ল। সে পাথরটাকে ভেঙে দেখল। সেই পাথরের ভিতরে সযত্নে যেন একটা সোনার অলংকার রাখা ছিল।

মল্ল বুঝতে পারল যে ইল্লর প্রতি রাজা পক্ষ পাতিত্য করেছে। রাজা গোপনে ইল্লকে এই সোনার অলংকার দিতে চেয়েছে। যাই হোক, মল্ল সেই অলংকার নিজের কাছে রেখে দিল।

তিন দিন পরে মেলা বসল। সেদিন রাজার বাড়িতেও অনেক লোক নিমন্ত্রণ খেতে বসল। সেইসময় মল্লের গায়ে সেই অলংকার দেখে রাজা অবাক হল। রাজা জিজ্ঞেস করল, 'মল্ল এই অলংকার তুমি কোত্থেকে পেলে?'

মল্ল রাজাকে সত্য কথাই বলে দিল। ইল্ল অদলবদল করার অপরাধ স্বীকার করে রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। পাথরের ভিতর অলংকার ছিল বলে সে যে জানত না তাও ইল্ল জানাল।

রাজা ইল্লকে ক্ষমা করল। কিন্তু মল্লকে বধ করার সিদ্ধান্ত করল রাজা। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সবাই যখন বিদায় নিয়ে ফিরছিল তখন রাজাকে মল্ল বলল, 'আমি এই অলংকারের কথা আপনাকে আগে জানাইনি তারজন্য আমাকে ক্ষমা করুন। যে পুরস্কার দিয়েছিলেন তা আমি বদলেছি। আমার ভুল হয়েছে। কন্দটাকে ইল্ল এবং তার স্ত্রী খেয়ে নিয়েছে।'

'আমি যে ক্ষমা করছি তার চিহ্ন স্বরূপ আমি তোমাকে একটা আংটি দিচ্ছি। তুমি এটাকে যত্নে রেখে আগামী সপ্তায় দেখাবে। এটা হারালে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে।' রাজা বলল।

মল্ল বুঝল যে রাজা তাকে ভালো চোখে দেখে না। মল্ল ভাবতে লাগল কীভাবে এই মনোভাবের পরিবর্তন করানো যায়। সাত-পাঁচ ভেবে সে আংটিটাকে কুটিরে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা পেল না।

গভীর রাতে মল্ল উঠল। তার বউ-ছেলে-মেয়ে ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে একটা ফুটো করে তাতে আংটি রেখে আবার কাদামাটি দিয়ে ঢেকে দিল সেই ফুটো। এমনভাবে ঢেকে দিল যেন বোঝা না যায়।

সকালে উঠে দেখে চমৎকার দেওয়ালের সাথে ওই ফুটো ঢাকা জায়গাটা মিশে গেছে। তখন মল্ল নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে ভাবল আর আংটি হারানোর ভয় নেই। অতএব তার প্রাণেরও ভয় নেই।

এই ঘটনার দু-দিন পরে রাজা মল্লের স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'তোমার স্বামী একটা আংটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জানো? তুমি সেটা এনে দাও। পরিবর্তে আমি তোমাকে অনেক সোনা দেব। তবে এ-কথা তুমি আগেভাগে তোমার কর্তাকে বল না। হঠাৎ অনেক সোনা দেখে তোমার কর্তা একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

মল্লের বউ এ-কথা কল্পনাই করতে পারেনি যে তার স্বামীকে বধ করার জন্যই রাজা এসব কথা বলছেন। এত সোনা দিতে চাইছেন ওই আংটির পরিবর্তে। মল্লের বউ বাড়ি ফিরে তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওই আংটি। কিন্তু খোঁজাই সার হল, আংটি পেল না।

সেদিন সন্ধ্যায় মল্ল বাড়ি ফেরার পর তার বউ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা তোমার আংটিটা কোথায়?'

মল্ল ভাবল তার বউ আংটি দেখে নিয়েছে। তাই সে বলল, 'আংটিটা আমি ওই দরজার কাছে লুকিয়ে রেখেছি।'

পরের দিন মল্ল কাজে বেরিয়ে যাবার পর তার বউ দরজার কাছাকাছি যেখানে যেখানে তার সন্দেহ জেগেছিল তার প্রত্যেকটা খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজল। শেষে পেল সেই আংটি। আংটি বের করে ওই জায়গাটা বুজিয়ে দিল। মল্লের বউ ছুটে গেল রাজার কাছে।

রাজা ওই আংটি নিয়ে মল্লের বউকে একটা ছোটো থলে করে সোনা দিল।

মল্লর বউ খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে বাড়ির পিছনে একটা গর্ত করে ওই থলি পুঁতে রেখে দিল।
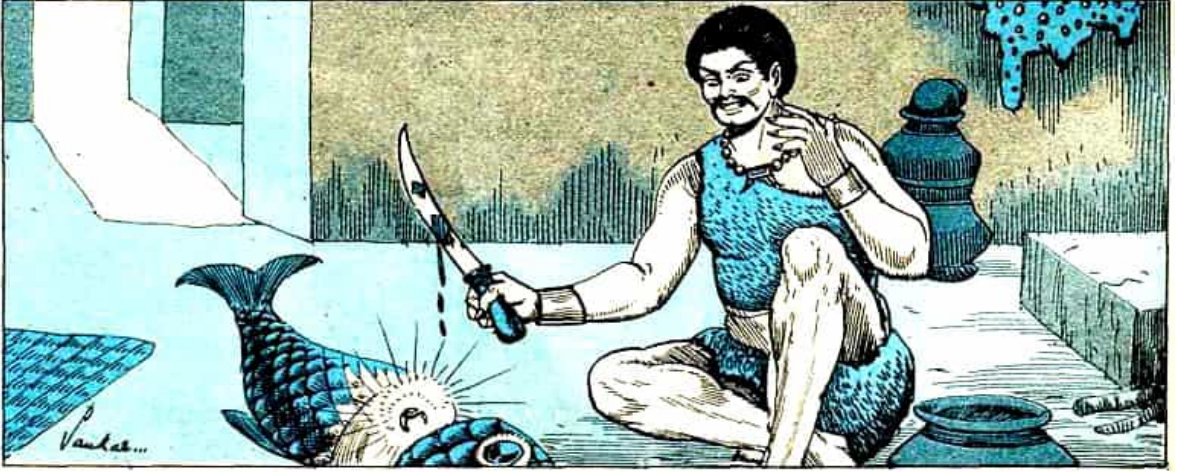
এক সপ্তাহ হতেই রাজার এক অনুচর মল্লকে বলল, 'আংটিটা নিয়ে রাজা তোমাকে ডাকছেন।'

মল্ল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ওই আংটি খুঁজতে লাগল। অনেক খুঁজেও যখন পেল না তখন সে মৃত্যুভয়ে, আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমি মারা গেলাম। আমি আর বাঁচব না!'

মল্ল বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি, তুমি আমার আংটি দেখেছ? আমার আংটি?'

মল্লের হাবভাব দেখে বউ ভয় পেয়ে আংটি দেখেনি বলে দিল। মল্ল হতাশ হয়ে পা টেনে টেনে কোনোরকমে রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমি আংটি এক্ষুনি দেখাতে পারছি না।'

'তাহলে কথামতো তোমাকে আজ বধ করা হবে।' রাজা বলল।

'মহারাজ, আমাকে কাল বধ করুন। এই এক দিনে আমি বকেয়া কাজ করে নিচ্ছি।' মল্ল আবেদন করল।

'ঠিক আছে। কাল সকালে তোমাকে বধ করার জন্য আমি কসাইকে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' রাজা বলল।

মল্ল কোনোরকমে মনে মনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরার পথে ভাবল, কাল যখন আমাকে মরতে হবে তার আগে আমার সাধ মিটিয়ে নি। একটা মাছ ধরে ভালোভাবে রেঁধে খেয়েনি। এই কথা ভেবে সে মাছ ধরতে বসে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ছিপে একটা সাদা মাছ ধরা পড়ল। মল্ল ওই মাছটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার বউ বাড়িতে নেই। তখন সে নিজেই মাছটাকে কেটেই চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি! আমি রাজার আংটি পেয়েছি!'

মল্ল ওই আংটি নিয়ে রাজার কাছে ছুটে যেতে যেতে যার সাথে দেখা হয় তাকেই বলতে লাগল, 'আমি ভেবেছিলাম আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না! এখন আমি

বেঁচে গেছি!'

সে রাজার কাছে পৌঁছাল। তার পিছনে কৌতূহলী লোকও পৌঁছাল।

রাজা অনুচরদের জিজ্ঞেস করল, 'আরে বাইরে এত লোক কীসের? এত চেঁচামেচি কেন?'

সেইসময় মল্ল তার পিছনে পিছনে যারা এসেছিল, তাদের নিয়ে, রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই নিন আপনার আংটি এবং আমার মৃত্যুদণ্ড রদ করুন।'

রাজা বাধ্য হয়ে সবার সামনে মল্লের মৃত্যুদণ্ড রদ করল। কোন মায়ায়, কোন জাদুর ফলে যে মল্ল ওই আংটি পেয়ে গেল তা রাজা কিছুতে ভেবে পেল না। রাজা আর কোনোদিন মল্লের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি।

আসল ঘটনা ঘটেছিল এইভাবে মল্লের বউ রাজাকে আংটি দেবার পর রাজা ওই আংটি নিজের বিছানায় মাথার কাছে রেখেছিল। রাত্রে ওই আংটি কীভাবে গড়িয়ে একটি পাত্রে পড়ে যায়। ওই পাত্রে রাজার রাত্রের খাবার জল থাকত। প্রত্যেক দিনের মতো সেদিন সকালেও চাকর ওই পাত্রের জল ফেলে দিয়ে নতুন জল তুলে রাখল। সেই জল আংটি সহ গড়াতে গড়াতে চলে গেছে সেই জলাশয়ে যেটাতে মল্ল ওই মাছ পেয়েছিল।

এত যে সব ঘটে গেছে তা রাজার অজানা ছিল। তাই রাজা বুঝতে পারেনি কী করে মল্লের হাতে ওই আংটি গেল।

৪৬. স্থান-কাল-পাত্র

এক গ্রামে ভদ্রসেন নামে এক নামকরা জ্যোতিষী ছিল। আশপাশের প্রত্যেক গ্রামের লোক তার কাছে হাত দেখিয়ে যেত। সে যেকোনো লোকের হাত দেখে তার মনের কথা বলে দিতে পারত। সাথে সাথে সে তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দিত।

ভদ্রসেনের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে ওই অঞ্চলে অন্য কোনো জ্যোতিষী ঢুকে পড়লে ভদ্রসেন তাকে নানান প্রশ্ন করে গ্রামবাসীর সামনে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দিত।

একবার ওই গ্রামে রামশাস্ত্রী নামে এক জ্যোতিষী গেল। ভদ্রসেন যে সেই গ্রামে থাকে তা রামশাস্ত্রী জানত না।

ভদ্রসেন জানতে পারে রামশাস্ত্রী একজন জ্যোতিষী। সে রামশাস্ত্রীকে পঞ্চাননতলায় ডেকে অনেক প্রশ্ন করল, 'হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্রের কোন ভাগ তুমি পড়েছ? কোন গ্রামের লোক তুমি? আদি বাড়ি কোথায় ছিল?'

'আজ্ঞে, হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত! আমি যেটুকু জানি তাই জানিয়ে কোনো রকমে পেট চালাই। যে গ্রামের লোক খেতে দেয় সেই গ্রামকেই নিজের গ্রাম মনে করি।' রামশাস্ত্রী সবিনয়ে জবাব দিল।

পঞ্চাননতলায় ইতিমধ্যে অনেক লোক জড় হয়েছিল। রামশাস্ত্রীর বিনয় ভাব লক্ষ করে ভদ্রসেন অবাক হয়ে বলল, 'তোমার বিদ্যের বহর দেখে এই গ্রামের লোক তোমাকে খেতে দেবে কোন দুঃখে? ভালো কথা, তুমি কি আমার নাম শোননি? হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্রে আমার গভীর জ্ঞান আছে। অতএব, বুঝতে পারছ, আমি থাকতে এ গ্রামে তোমায় থাকতে দেওয়া তো দূরের কথা এক ফোঁটা জলও কেউ তোমাকে দেবে না। তাই বলছি, অন্য কোনো গ্রামে চলে যাও, তোমার তাতে ভালোই হবে।'

এ-কথা শুনে রামশাস্ত্রীর ভীষণ রাগ হল। মনে মনে সে ঠিক করল, ভদ্রসেনের অহংকার চূর্ণ করেই সে এই গ্রাম থেকে যাবে। সে শান্ত স্বরে বলল, 'আজ্ঞে, আমাকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। একমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রামাণ হয় কে বড়ো কে ছোটো।'

সেখানে যারা ছিল তারা বলল, 'রামশাস্ত্রী ঠিক কথা বলছেন। কোনো অজানা লোকের হাত দু-জনে দেখলে প্রমাণ হয়ে যাবে কার জ্ঞান কত বেশি।'

এমন সময় নতুন একজনকে ওরা দেখতে পেল। লোকটা ধনী। পঞ্চাননতলার লোক তাকে ডেকে বলল, 'এই যে ও মশাই, শুনুন। এখানে দু-জন জ্যোতিষীর মধ্যে কে যে বড়ো তার একটা পরীক্ষা হবে। আপনি এই দু-জন জ্যোতিষীকে হাত দেখান।'

ধনী লোকটা পঞ্চাননতলায় এসে হাত বাড়াল। ভদ্রসেন লোকটার হাতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'দেখুন মশাই, এখানে পরীক্ষা হচ্ছে। রেখে-ঢেকে বলতে পারছি না। যা সত্য তা বলে দিচ্ছি। আপনার অগাধ ধনসম্পত্তি আছে। কিন্তু আপনি হাড়কেপ্পন লোক। আপনি বউয়ের কথামতো ওঠেন বসেন।'

ধনী লোকটা তেলে-বেগুনে চটে গিয়ে বলল, 'চমৎকার! অপমান করার জন্য আমাকে ডেকেছেন আপনারা?'

রামশাস্ত্রী ওই লোকটাকে বলল, 'দেখুন মশাই, অত রাগ করছেন কেন? জগতে কিছু লোক আছেন যাঁরা নিজেদের জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত মনে করেন। সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র যেন তাঁরাই গুলে খেয়েছেন। আপনার হাত একটু দেখতে দিন তো। বা! আপনার হাত তো লক্ষ্মী হাত। রেখায় রেখায় উদারতা ফুটে উঠেছে। বড়ো বড়ো লোক আপনার কাছে বেড়ালের মতো নত হয়। আপনার পূর্বজর্ন্মের পুণ্যের ফলে আপনি মনের মতো আপনার উপযুক্ত স্ত্রী পেয়েছেন।'

এ-কথা শুনে ধনী লোকটার খুব আনন্দ হল। সে বলল, 'সাবাস, আপনার প্রত্যেকটা কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' সবাই তার কথা যেন গিলছে। তারপর রামশাস্ত্রী বলল, 'এই মুহূর্তে আপনার কী ইচ্ছে করছে বলে দিতে পারি।'

'কী বলুন?' ধনী জিজ্ঞেস করল।

'আমার জ্যোতির্বিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে এই আংটিটা আপনি আমাকে উপহার দেবার কথা ভাবছেন।' রামশাস্ত্রী বলল।

এ-কথা শুনে ধনী লোকটা কেমন যেন দমে গেল। রামশাস্ত্রী তাকে বলল, 'আমি কি ঠিক কথা বলিনি? আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি?'

ধনী লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আরে না, না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি ভাবছিলাম আমার মনের কথা কী করে জানতে পারলেন? আপনার অসীম ক্ষমতা।'
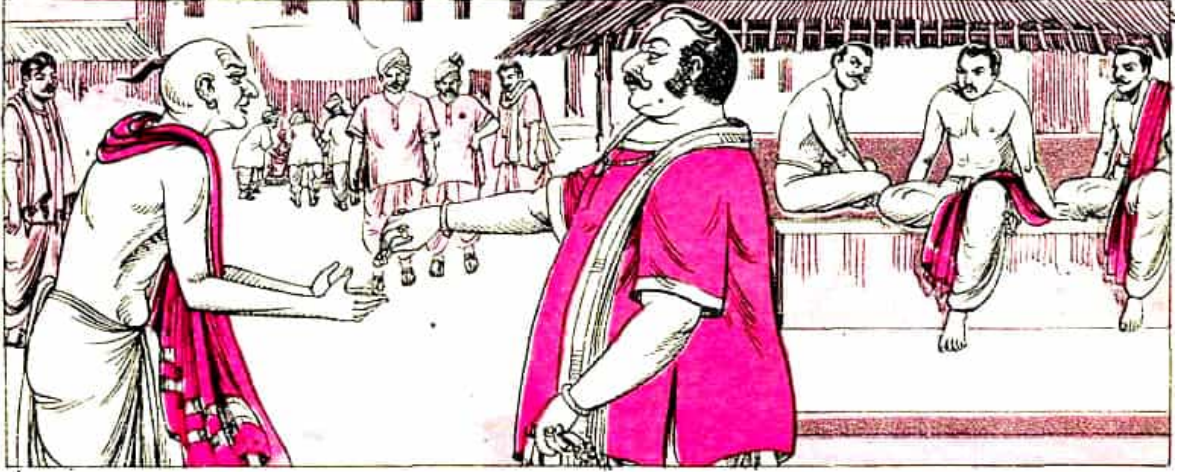
এ-কথা বলে ধনী লোকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের দামি আংটিটা বের করে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। তারপর পঞ্চাননতলায় যারা ছিল তারা দু-হাত তুলে রামশাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল। পঞ্চমুখে তারা তাকে প্রশংসা করল। পরীক্ষায় রামশাস্ত্রী যে জিতেছে এ-কথা যেন খুব ভালোভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। ভদ্রসেন মাথা নীচু করে বসে রইল।

তখন পঞ্চাননতলার সবাইকে রামশাস্ত্রী বলল, 'দেখুন, ভদ্রসেন সত্যি হস্ত-সামুদ্রিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু এই বিদ্যাকে যদি পেশা করতে হয় তাহলে আমার মতো লোকের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞানও থাকা চাই। বাস্তব জ্ঞান না থাকলে অহংকার বেড়ে যায়। আর অহংকার বেড়ে গেলেই অপমানিত হতে হয়।

৪৭. সোনার পাখি

সুন্দরবনের এক বিরাট আম গাছে এক পেঁচা বসে ছিল। জ্যোৎস্না রাতে জঙ্গলের শোভা খোশমেজাজে দেখছিল পেঁচা। ঠিক তখনই তার কানে গেল গোঙানি। নীচে তাকিয়ে দেখে এক মস্তবড়ো সাপ। সাপের মুখে পাখির ডিম। সাপ ওই ডিম মুখে করে এনে গাছের উপরে উঠল। একটি পাখির নীড়ে সেই ডিম রেখে নিজের পথে চলে গেল।

সকালে পেঁচা ওই নীড়ে দেখতে পেল এক ছোট্ট সদ্যজাত পাখি। তার গায়ে সোনার আভা। তার গা দিয়ে যেন সোনা ঝরে পড়ছে।

ওই পাখির উপর পেঁচার সহানুভূতি জাগল। পেঁচা ওই পাখির ছানা এনে নিজের নীড়ে রাখল। লালনপালন করল স্নেহ আদরে। দু-মাসের মধ্যে ওই ছানা সুন্দর সোনার পাখিতে পরিণত হল।

সোনার পাখিটিকে বিয়ে করতে বনের সমস্ত পাখি ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পাখিটি রাজি হল না।

সুন্দরবনের পাখিদের রাজা ছিল দুটো মাথার এক বিচিত্র পাখি। তার রানি ময়ূরী ছিল ভীষণ দেমাগি। নিজের রূপের অহংকার ছিল তার। সোনার পাখির রূপের বাহারের কথা কানে যেতেই তার প্রতি ময়ূরীর ভীষণ ঈর্ষা জাগল। নিজে নানান ধরণের নকল জিনিস পরে সেজে গেল সেই সোনার পাখির কাছে।

তাকে দেখেই সোনার পাখি হেসে উঠল। ওর হাসি দেখে ময়ূরীর রাগ আরও বেড়ে গেল। রানি ময়ূরী আদেশ জারি করল কালো কাকের সাথে যেন সোনার পাখির বিয়ে দেওয়া হয়। এই আদেশ বলে সোনার পাখির সাথে কালো কাকের বিয়ে হল। ওরা দু-জনে একটি গাছে ঘর সংসার করছিল।
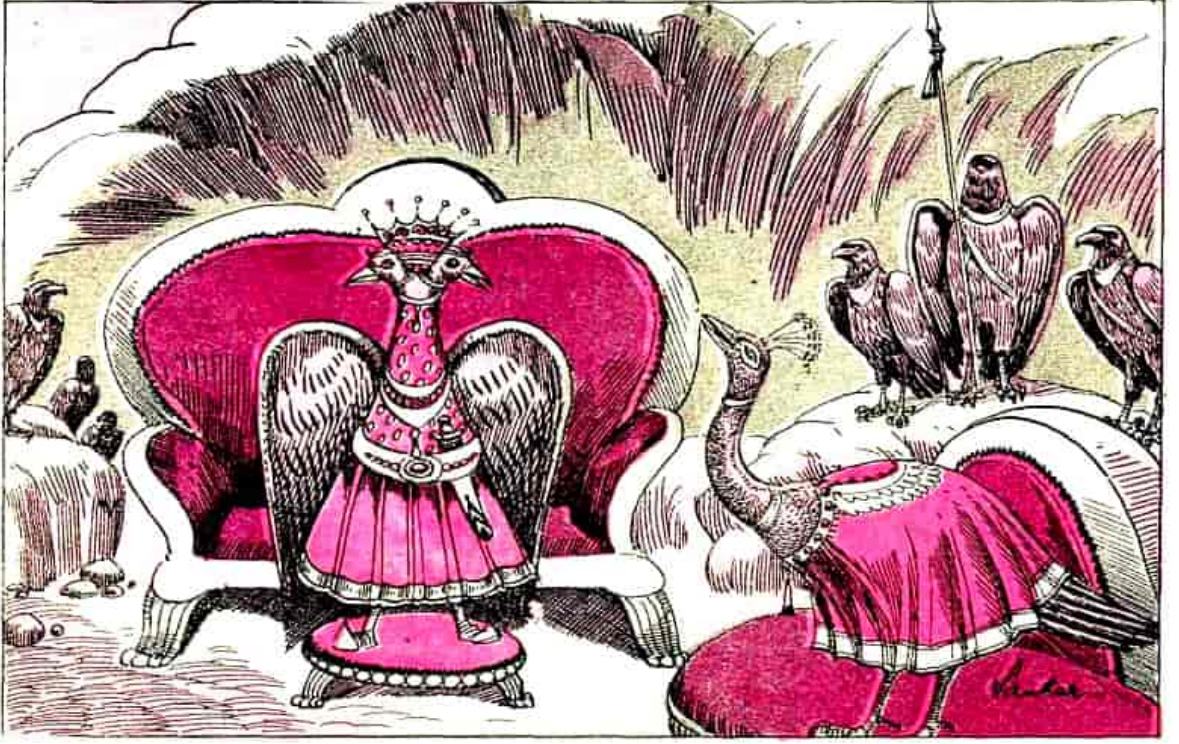
এত করেও রানি ময়ূরীর যেন রাগ পড়ল না। ওর ধারণা হল কাক আর সোনার পাখি নিশ্চয় খুব সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের এত শান্তিতে বাস করতে দেওয়া যায় না। ওদের ঘর ভাঙাতে হবে। রানি এসব কথা ভেবে শেষে নিজের স্বামীকে বলল, 'রাজা, তুমি দিনকে-দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছ। এভাবে চললে তুমি তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে। আর বুড়ো হয়ে গেলে রাজত্ব চালাবে কী করে? তুমি যদি প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ডিম খেতে পার তাহলে তোমার যৌবন অটুট থাকবে। তুমি লোক পাঠিয়ে সোনার পাখির নীড় পাহারা দিতে বল। ডিমগুলো তোমার লোক তুলে আনবে। তুমি খেতে পারবে।'

রাজা লোক পাঠিয়ে দিলেন সোনার পাখির বাসা পাহারা দিতে। ওই নীড় থেকে ডিম আনতে রাজার লোক চলে গেল।

রাজার আদেশের কথা শুনে সোনার পাখি রাজার লোককে বাধা দিল না। সোনার পাখি ভেবেছিল স্বামী সহ সে অন্য কোনো বনে পালাবে। কিন্তু পালানো সম্ভব হল না। সোনার পাখির নীড়কে ঘিরে রয়েছে পঞ্চাশটা বাজ পাখি।

একদিন পেঁচা সোনার পাখিটিকে দেখতে এসে সমস্ত ব্যাপার জানতে পারল। সব কথা শুনে পেঁচা সোনার পাখিকে কথা দিল একটা কিছু উপায় সে বের করবে।

পাখি চিকিৎসার জ্ঞান পেঁচার ছিল। রাজার চিকিৎসা করে অতীতে সে রাজার প্রশংসা পেয়েছিল। পেঁচা ভাবল রানি কাছে থাকলে সে রাজার মন পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই ময়ূরী রানিকে দূরে কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
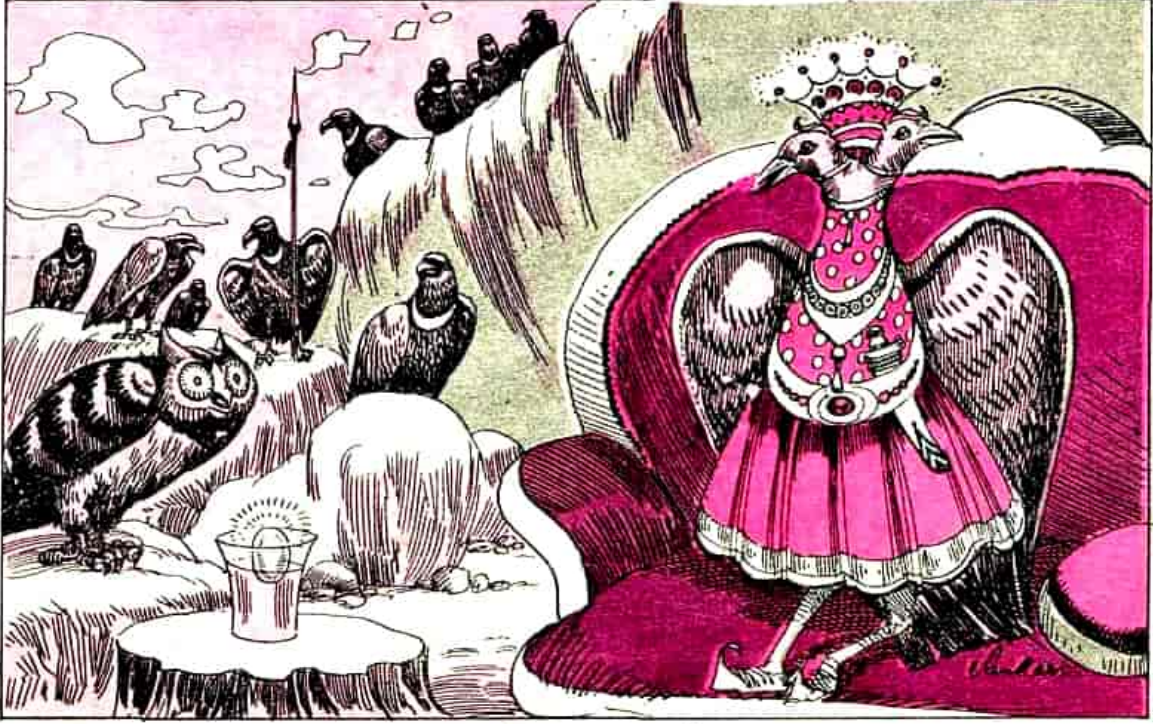
এই কাজ করার উদ্দেশ্যে পেঁচা অন্য বনে চলে গেল। সেই বনে ছিল রানি ময়ূরীর বাবা-মা। পেঁচা রানির বাবা-মাকে ঘটা করে নিমন্ত্রণ করল। খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে রানির বাবা-মাকে সে খাওয়াল। ফলে রানির বাবা-মা অসুখে পড়ে গেল।

রানি ময়ূরী তার বাবা-মার অসুখে পড়ার খবর জানতে পারল। রানি ময়ূরী রাজার অনুমতি নিয়ে বাবা-মাকে দেখতে গেল। পরের দিন সকালেই পেঁচা সোজা রাজার কাছে গেল। গিয়েই দেখে রাজা সোনার পাখির ডিম খেতে যাচ্ছেন।

'মহারাজ, তাড়াহুড়ো করে আপনি ওই সোনার ডিম খেতে যাবেন না। ওই ডিম তাজা ডিম নয়। বাসি পচা ডিম হতে পারে ওটা।' পেঁচা বলল।

'এই ডিম তো কাল রাত্রের দেয়া।' রাজা জবাবে বলল।

'পরীক্ষা করে দেখুন। জল ভরতি এই পাত্রে ডিমটা ফেলে দিন। তাজা ডিম হলে জলে ডুবে যাবে। আর পচা ডিম হলে জলে ভেসে উঠবে।' পেঁচা যেন বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

'তা তো আমিও জানি।' এই কথা বলে রাজা ওই ডিম পেঁচা যে জলের পাত্রে ঢালতে বলেছিল সেই পাত্রে ঢেলে দিল। সেই ডিম জলে ডুবল না, ভেসে উঠল।

'তোমার কথাই সত্য হল দেখছি। এটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও।' পাখিদের রাজা বলল। পেঁচা ওই ডিম নিয়ে গিয়ে সোনার পাখিকে দিল। সে খুব খুশি হয়ে বলল, 'এটাকে তুমি বাঁচালে কী করে?'

পেঁচা হেসে জবাব দিল, 'আমি এক কৌশল করেছি। এই কৌশল আমি এক ছেলের কাছে শিখে ছিলাম। কৌশলটা হল, এমনি জলে ছেলেটা ডিম ছেড়ে দিত। ডিম ডুবে যেত। তারপর সেই ডিম তুলে নিত। ওই জলে অনেক নুন ঢেলে দিত। তখন এমন ভাব করত যেন মন্ত্র পড়ছে। তারপর ওই ডিম ওই লবণাক্ত জলে ঢেলে দিত। ডিম ভাসত। আমিও পাখির রাজার কাছে একই কৌশল খাটিয়েছি। ডিম যথারীতি ভেসে উঠেছিল। রাজা বিশ্বাস করলেন যে ডিম পচা।'

সেই ডিম সোনার পাখির বাসায় রাখা বিপজ্জনক ছিল। সেইজন্য পেঁচা সেই ডিমটাকে নিজের নীড়ে নিয়ে গেল। সেখানে তা দিয়ে ডিম ফোটাল। এক রাত্রে ওই সোনার পাখির ছানা নিয়ে অন্য বনে চলে গেল ওই পেঁচা।

রানি ময়ূরী মা-বাবাকে দেখে ফিরছিল। তখন কোনো এক শিকারি তাকে তির বিদ্ধ করে মেরে ফেলল। তার কিছুদিন পরে পাখির রাজাও মারা গেল। তারপর থেকে সোনার পাখি এবং কাক সুখে দিনযাপন করছিল। তারা চলে গেল সেই বনে যেখানে পেঁচার আশ্রয়ে তাদের ছানা ছিল। ওরা সেখানেই সুখে দিন কাটাচ্ছিল।

৪৮. হাতির পঞ্চায়েত

আফ্রিকার এক বড়ো সরোবরের তীরে রামোগী নামে এক বুড়ো বাস করত। সাত ছেলে আর বউদের নিয়ে বুড়োর সংসার। কালে তার নাতি নাতনিদের নিয়ে সেই অঞ্চল একটা ছোটোখাটো গ্রামে পরিণত হয়েছিল।

রামোগীর মারা যাবার পর সেই অঞ্চলের অধিকার রামোগীর বড়ো ছেলের হয়ে গেল। ফলে অন্য ছেলেরা সপরিবারে অন্যান্য জায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা করতে লাগল।

তাদের মধ্যে শেষ দুই ভায়ের খুব মিল ছিল। পোধু এবং অরুবা। কোনোদিন একজনকে ছেড়ে অন্য জন থাকতে পারত না। তারা বাচ্চা বয়স থেকে একসাথে খেলত, খেত, ঘুমোত। বড়ো হয়ে ওরা দু-জনে দুই বোনকে বিয়ে করল।

এইসব কারণে ওরা কোনো এক জায়গায় একসাথে থাকবে ঠিক করল। এইভাবে দুই ভাই একত্রে থাকা রীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু তারা প্রচিলত রীতি ভঙ্গ করল।

তারপর তাদের ভাবনা হল কোথায় তারা থাকবে। রামোগীর আস্তানা যেখানে ছিল তার পূর্ব দিকে বিরাট গভীর এক অরণ্য ছিল। ওরা দুই ভাই ঠিক করল ওই পুবের অরণ্যেই বসবাস করবে। চাষ-আবাদ করবে।

ওরা খুব সাহসের সাথে ওই অরণ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ ওই অরণ্যে হাতি ছিল অনেক। আর অরণ্যটা ছিল গভীর ও ভয়ংকর। ওই অরণ্যে যারা ঢুকত তারা হয় গিরগিটি অথবা অন্য কোনো জন্তু হয়ে যেত। লোকের ধারণা ওই অরণ্যের হাতিগুলো মন্ত্র জানে।

এহেন অরণ্যে পোধু ও আরুবা ঘর বেঁধে থাকতে শুরু করে দিল। যবের চাষ করতে লাগল।

একদিন আরুবা মোষ-গোরু হাঁকতে হাঁকতে বাইরে চলে গেল। পোধু বাড়িতেই ছিল। হঠাৎ সে বাচ্চাদের আর্তনাদ শুনতে পেল, 'হাতি এসেছে। হাতি এসেছে!' পোধু বল্লম নিয়ে এল।

পোধু দেখল হাতির দল শুঁড় দিয়ে বাড়ন্ত যব গাছগুলো উপড়ে ফেলছে। পোধু গর্জে উঠল। সাথে সাথে বহু হাতি পোধুর দিকে ধেয়ে এল।

এতগুলো হাতিকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে পোধু হাতের বল্লমটিকে ওই হাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হাতির দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই বল্লম সোজা হাতির বগলে ঢুকে গেল। হাতি আর্তনাদ করে ফিরে যেতে লাগল। তার যাওয়ার সাথে সাথে অন্য

হাতিরাও পরামর্শ করে ফিরে যেতে লাগল।

এই ঘটনার ফলে পোধু এক মারাত্মক অপরাধ করে ফেলল। সেই বল্লমটি সাধারণ বল্লম ছিল না। রামোগী বংশের সেই বল্লম ছিল বহু পুরুষের। কথিত আছে যে কোনো এক যুগে নন্দো বংশের লোক ওই বল্লম তৈরি করেছিল। রামোগী কিন্তু কোনোদিন ওই বল্লম প্রয়োগ করেনি। যত্নে রেখে দিয়েছিল। আরুবা ওই বল্লমটাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। তাড়াহুড়ো করে পোধু ওই বল্লম তুলে এনে হাতির উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। আর বল্লম বিদ্ধ হাতি ওই বল্লমসহ গভীর অরণ্যে ঢুকে গেল।
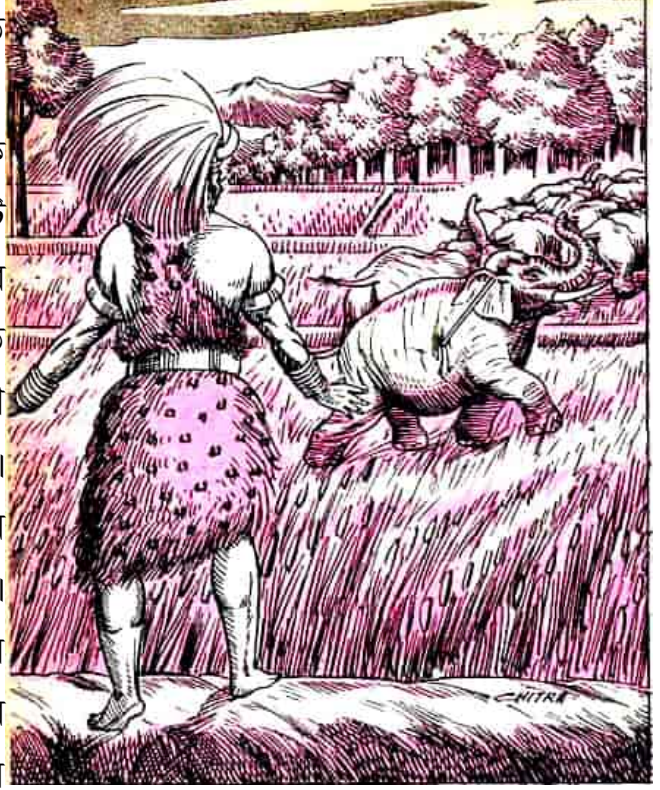
আরুবা বাড়ি ফিরে বল্লম যে কীভাবে হারিয়ে গেছে তা জানতে পারল। রেগে গিয়ে সে পোধুকে বলল, 'আমার বল্লম আমাকে ফেরত দাও।'

'আরুবা তোমার বল্লম হাতির সাথে ভয়ংকর গভীর অরণ্যে চলে গেছে। ওই বল্লম আনা যাবে কী করে! তার পরিবর্তে আমি তোমাকে ভালো একটা বল্লম কিনে দেব।' পোধু সবিনয়ে বলল।

'আমি আমার ওই বল্লমটাই চাই। ওটা তুমি না এনে দিলে, তোমাকে আমি মেরে ফেলব।' অরুবা বলল।

'ঠিক আছে। হয় আমি তোমার বল্লম এনে তোমার হাতে দেব আর না হয় তোমার বল্লমটা আনার চেষ্টা করতে করতে মরব।' পোধু বলল।

পরের দিন ভোরে উঠে পোধু রওনা হল। সাথে নিল একটা বল্লম আর একটা চামড়ার থলি। অরণ্যের গভীরে শীত ছিল বেশি। অন্ধকারও ছিল ঘন।

সন্ধ্যা হতেই আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এত ঘন অন্ধকার যে এক পা-ও এগোতে পারছে না। তখন বাধ্য হয়ে এক বিরাট গাছে নীচে বসে পড়ল পোধু। ওই গাছের খোপরে পোধু আশ্রয় নিল। যবের রুটি খেয়ে নিল। পরের দিন সকালে আবার বেরিয়ে পড়ল। হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটাও হাতির পাত্তা নেই। অনেক দূর হাঁটার পর একটা ফাঁকা

জায়গা দেখতে পেল। সেখানে কোনো গাছ নেই। অন্ধকার নেই। আলো আছে। ওখানে একটি কুটির আছে। কুটির থেকে ধোঁয়া আসছে।

পোধু হঠাৎ দেখতে পেল ওই কুটির থেকে বুড়ি কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এল। কাঠ চিরতে চিরতে বুড়ি আপন মনে বলছিল, 'এই বুড়ো বয়সে আর পারি! নিজের বলতে কেউ নেই।'

পোধু তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি কাঠ চিরে দেব মা?' বলতে বলতে তার হাত থেকে কুঠার নিয়ে অনেক কাঠ চিরল।

বুড়ি হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি বাবা খুব ভালো ছেলে। তোমাকে দেখে অবাক হচ্ছি। এখানে, এই বনে ঢুকলে কোন দুঃখে?' পোধু নিজের কাহিনি আগাগোড়া বলল।

সব কথা শুনে বুড়ি বলল, 'তোমার এখানে এভাবে আসা মারাত্মক কাজ হয়েছে। এত সাহস তোমার! তোমাকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারব কিনা পরে জানাব। এক্ষুনি কিছুই বলতে পারছি না বাবা। এখন তুমি আমার কাছে থেকে যাও। আমার কাঠ চের।'

পোধু এক মাস ধরে ওই বুড়ির কাছে রয়ে গেল। সারা দিন কাঠ কাটত। বুড়িটা কিছু-না-কিছু বলত। মাঝে মাঝে বলত, 'অকম্মার ঢেঁকি!'

পোধু মনে মনে তখন ভাবল বুড়ি হয়তো তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। সে কেমন নিরাশ হতে লাগল। পোধুর যখন মনের অবস্থা এইরকম তখন বুড়ি তার পাশে বসে তাকে বলল, 'বাবা, আমার কাছে এতদিন তোমার থাকা বৃথা হয়েছে ভেব না। সাহস, সহনশীলতা আর ভালোমানুষি এই তিনটে গুণ না থাকলে হাতির কাছ থেকে কোনো কাজ হাসিল করা যায় না। তোমার মধ্যে এই তিনটে গুণ আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তুমি একটা হাতির ভীষণ ক্ষতি করেছ। হাতি অপকারীকে কোনোদিন ভোলে না। সেইজন্য তোমার উপকারের জন্য আমি একটা জিনিস দেব।' বুড়ি তার হাতে একটা নীল রঙের পুঁতি দিল।

পরের দিন সকালে পোধুকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল বুড়ি। ওই রাস্তা দিয়ে গেলে পোধু হাতিরা যেখানে আছে সেই অঞ্চলে যেতে পারবে।

বুড়ি যে পথ দেখিয়েছিল সেই পথ ধরে পোধু সোজা হাঁটতে হাঁটতে চার ঘণ্টার মধ্যে হাতিগুলো যে অঞ্চলে ছিল সেখানে পৌঁছাল। বনের মাঝে এক বিশাল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের চারদিকে উঁচু উঁচু গাছ। তার শাখা-প্রশাখা ওই প্রান্তরের আচ্ছাদন তৈরি করেছে। গাছগুলো যেন পাশাপাশি দেওয়ালের কাজ করছে।

ওই আচ্ছাদনের নীচে যেন কয়েক হাজার হাতি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে একটা মদ্দ হাতি ছোটো একা পাহাড়ের মতো পড়ে ছিল। ওটাই হাতিদের রাজা ছিল।

পোধু হাতির রাজার কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাপতে লাগল।

হাতির রাজা কী যেন বলল। পোধুর মনে হল হাতিরা যেন তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি এখানে কেন এলে?' সাহসে ভর করে মাথা তুলে উচ্চ স্বরে বলল, 'হে হাতিগণ, তোমরা যখন আমার খেতের ফসল নষ্ট করতে গিয়েছিলে তখন আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি আমার ভাইয়ের বল্লম তোমাদের একজনের শরীর লক্ষ করে ছুঁড়েছি! সেই বল্লম ওই আহত হাতির সাথে চলে এসেছে। আমার ভাই বলল, ওই বল্লম তাকে ফেরত না দিলে সে আমাকে মেরে ফেলবে। সেই বল্লম ফেরত নিয়ে যেতে আমি এখানে এসেছি। এখন হয় তোমরা ওই বল্লম ফেরত দাও নয়তো আমাকে মেরে ফেল! বল্লম না পেলে ওখানে অথবা এখানে মরা আমার কাছে সমান।'

অনেকক্ষণ হাতিগুলো কোনো সাড়াশব্দ করল না। তারপর হাতির রাজা কী যেন ধ্বনি দিল। পরক্ষণে হাতিগুলো কী যেন গুঁ-গুঁ করে বলল। তারপর দুটো হাতি পোধুকে নিয়ে গেল দূরের একটা গাছের নীচে।

তারপর হাতির পঞ্চায়েত বসল। অনেকক্ষণ ধরে ওদের পঞ্চায়েত চলল। মাঝে মাঝে হাতিগুলো কী যেন বলাবলি করে উঠল। অনেকক্ষণ পরে পঞ্চায়েত ভাঙল। পোধুকে ওই হাতি দুটো আবার রাজার কাছে নিয়ে গেল। হাতির রাজা আবার কী যেন বলল।

তারপর হাতিগুলো পোধুকে একটা গাছের নীচে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলো বল্লম ছিল। পোধু বেছে নিজে যে বল্লমটা ছুঁড়েছিল সেটা তুলে নিল। তারপর হাতিদের সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে নমস্কার করল। সকৃতজ্ঞ নমস্কারের পর পোধু বাড়ির পথ ধরল।

ফেরার সময় পোধু হয়তো পথ চিনতে পারল না। সে বুড়ির কুটির খুঁজে পেল না। বুড়ি তাকে যে নীল রঙের পুঁতি দিয়েছিল সেটা তার কাছেই রয়ে গেল। পথ ভুলে হাঁটতে হাঁটতে সে তিন দিনে বাড়ি পৌঁছাল।

নিজের বল্লম ফেরত পেয়ে আরুবা খুব খুশি হল। পোধু নিজের বিচিত্র অনুভূতির কথা সবাইকে জানাল। তারপর পোধু সবাইকে সেই কাচের পুঁতি দেখাল। প্রত্যেকে হাতে করে ওই পুঁতি দেখল। কেউ অবাক হল। কেউ আনন্দিত হল। এইভাবে দেখতে দেখতে সেই পুঁতি আরুবার বাচচ্চা ছেলে মুখে পুরে গিলে ফেলল।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই বাড়িতে আবার অশান্তি দেখা দিল। পোধুর বউ সেই ছেলেটাকে মারল। ফলে আরুবার বউ দিদির প্রতি কোনোরকম সম্মান না দেখিয়ে গালাগাল দিল।
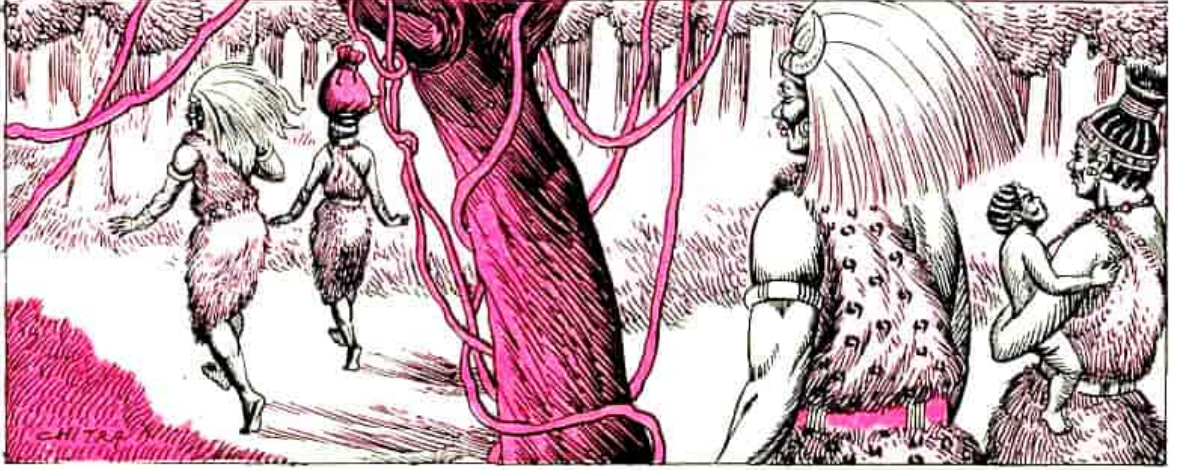
তারপরে পোধু আরুবাকে বলল, 'ভাই, আমি তোমার বল্লম হারালে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে বলেছিলে। আমি জীবন বিপন্ন করে তোমার বল্লম এনে দিয়েছি। এখন তোমার ছেলে যে আমার অত দামি নীল পুঁতি গিলে ফেলেছে। এখন তুমি কী করবে?'

'কাল থেকে আমি আলাদা থাকব। কুকুর বিড়ালও মিলেমিশে থাকতে পারে কিন্তু মানুষ পারে না বলে কোনো এক বুড়োর কাছে শুনেছিলাম। ঠিক আছে আমি নিজেদের থাকার জন্য আলাদা একটা আস্তানা গড়ে তুলছি।' আরুবা জবাবে বলল।

'তা থাকতে চাও থাক। তবে আমার কাচের পুঁতি যে ছেলে গিলেছে সেই ছেলেকে আমাকে দিয়ে দাও।' পোধু স্পষ্ট ভাষায় বলল।

আরুবা তাতে রাজি হল। পোধুকে সেই ছেলেকে দিয়ে পরিবার নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

৪৯. অগ্নিপরীক্ষা

পুরন্দর রাজ্যের রাজকুমারী লাবণ্য রূপে অপরূপা। সৌন্দর্যে অপ্সরীরাও হার মানে। রাজা যোগ্য বরের খোঁজ করছিলেন। পুরন্দর দেশটা ছিল অন্যান্য দেশ থেকে অনেক দূরে। ওই দেশের চারদিকে ভয়ংকর বন ছিল। তাই অন্যান্য দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে অনেক পাহাড় আর অরণ্য পেরিয়ে যেতে হত। সেইটাই লাবণ্যের যোগ্য পাত্র পেতে মস্তবড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাধা অতিক্রম করা সহজ নয়।

লাবণ্যর বিয়ে করার খুব ইচ্ছে। জীবনটা তার কাছে ক্লান্তিকর লাগছিল। কোনো আনন্দ নেই তার জীবনে। দাসীরা যে গল্প শুনিয়ে আনন্দ দিতে চাইত তাকে সে ওই গল্প বহু বার ওদের কাছেই শুনেছে। যেসব খেলা দেখাত সে খেলাগুলো বহু বার দেখেছে লাবণ্য। এইসব কারণে রাজকুমারী লাবণ্যর সময় যেন আর কিছুতেই ভালো কাটছিল না। মনমেজাজ খারাপ ছিল তার। সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে।

একদিন রাজকুমারী লাবণ্য রাজমহলের কাউকে না জানিয়ে রাজধানীর উত্তর দিকে বনপথ ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে তো হাঁটছেই। আর ভাবছে। অবশেষে সে এক সুন্দর উদ্যানে পৌঁছোল। অপূর্ব সুন্দর ফুলের বাহার চারদিকে। ওই ধরণের ফুলের গাছ আর ফুল লাবণ্য জীবনে কোনোদিন দেখেনি। কোনো মানুষের হাতে তৈরি উদ্যান বলে মনে হচ্ছিল না। সেটা যেন প্রকৃতির আপন খেয়ালের সৃষ্টি। কোনো পাখি নেই, কোনো পশু নেই সেই উদ্যানে। পশুপাখিহীন উদ্যান যে কত ভয়ংকর সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তা ওই উদ্যান না দেখলে বোঝা যায় না।

লাবণ্য প্রত্যেক ফুলের কাছে গিয়ে দেখে আর শুঁকে অবাক হচ্ছিল। শেষে একটা ফুল তুলে গুঁজে নিল বেণীতে।

'ফুল কে ছিঁড়ছে?' জিজ্ঞেস করতে করতে গাছের আড়াল থেকে এক যুবক লাবণ্যর সামনে এসে দাঁড়াল। লাবণ্যকে দেখেই যুবক তো অবাক। তার মুখে কথা নেই। হাঁ করে সে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে রইল।

'ফুল ছেঁড়া যে বারণ আমি তা জানতাম না। কাউকে তো দেখতে পাইনি যে জিজ্ঞেস করব। আমি ভেবেছিলাম যে এখানে কেউ নেই। লাবণ্য অজানা পরিবেশে অচেনা যুবকের প্রশ্নের জবাবে নির্ভিকভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বলল।

যুবক চাপা হাসি হেসে বলল, 'ঠিক তাই। এখানে কেউ থাকে না। আমি একাই এই উদ্যান পাহারা দিয়ে থাকি।' এই কথা বলে যুবকটি ওই গাছ থেকেই আরও কয়েকটা ফুল তুলে লাবণ্যর হাতে দিল।

'আপনি এক্ষুনি বলছিলেন না, ফুল ছেঁড়া নিষেধ?' লাবণ্য জিজ্ঞেস করল।

'আপনার মতো সুন্দরীর ক্ষেত্রে ওই নিয়ম পালন করার দরকার নেই।' যুবক বলল। কেন বলল, এভাবে বলার উদ্দেশ্য যে কি তা লাবণ্য ঠিক বুঝতে পারল না।

'আপনি কে?' লাবণ্য জিজ্ঞেস করল।

'আমার নাম সুব্রত। আমি এই গন্ধর্ব উদ্যানের রক্ষক।' সুব্রত জবাবে বলল।

অন্যদের মতো লাবণ্যরও গন্ধর্বদের সম্পর্কে ভয় ছিল। গন্ধর্বদের সাথে সম্পর্ক রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সবসময় ভালো হয় না। গন্ধর্বরা অনেক রকমের বিদ্যার অধিকারী হয়। লাবণ্য এর আগে জানত না যে গন্ধর্বরা তার দেশের এত কাছেই আছে।

লাবণ্য অস্বস্তি বোধ করছে দেখে সুব্রত বলল, 'রাজকুমারী, ভয় পাবেন না। আমি এখন গন্ধর্বদের সেবক বটে তবে আমিও আগে একজন মানুষই ছিলাম। আমার দাদু পূর্ব দিকের সিন্ধু দেশে রাজা ছিলেন। আমার অল্প বয়সে বাবা-মার মৃত্যু হওয়ায় আমার দাদু আমাকে নিজের কাছে রেখে লালনপালন করেছিলেন। বড়ো হয়ে আমি আমার দাদুর সাথে এখানে শিকার করতে এসেছিলাম। সেইসময় এক গন্ধর্বরানি আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তার ধারণা ছিল আমি তাকে ভালোবাসব। তার সাথে থাকব। কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসতে পারিনি। তাই রানি দিনের বেলায় এই উদ্যান পাহারা দেওয়ার কাজ আমাকে দিয়েছে। রাত হলেই রানি আমাকে তার কাছে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন এই গন্ধর্বদের সাথে আমার ভালো লাগছে না। আমি আশায় আছি। কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনো দিন আমাকে এই মায়াজাল থেকে উদ্ধার করবেই। কিন্তু আমার আশা কবে যে পূর্ণ হবে কে জানে। একটা উপায় আছে তবে...' বলতে বলতে যুবক থেমে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লাবণ্য ওই যুবকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বলল, 'কী উপায়?'

সুব্রত লাবণ্যর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, 'প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে গন্ধর্বরানি নিজের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন। আমিও সেইসময় তাঁর সাথেই থাকি। তখন কোনো মানবী আমাকে যদি জড়িয়ে ধরে থাকে তাহলে আমি উদ্ধার পাব। গন্ধর্বরানি অনেক কৌশল খাটাবেন। কিন্তু জোরে ধরে থাকলে আমি ঠিক উদ্ধার হতে পারব। কে আমার জন্য এত করতে যাবে? আমার প্রতি কার এত টান আছে! কে অত সাহস করবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কেউ নেই! আমাকে উদ্ধার করার লোক দুনিয়ায় কেউ নেই। আমি একা! আমি বড়ো একা।'

এই কথা বলে গভীর নিশ্বাস ফেলে সুব্রত বলল, 'সূর্য ডুবছে। আপনাকে হয়তো অনেক দূর যেতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আপনার পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক হবে।'

'আপনি উদ্ধার অবিলম্বে পাবেন। আর বেশি দেরি নেই।' বলে লাবণ্য ফিরে গেল নগরের দিকে।

পূর্ণিমার আর বাকি ছিল চার দিন। ওই দিন লাবণ্য শুধু সুব্রতর কথাই ভাবছিল। তাকে উদ্ধার করার কথা। ঠিক করল প্রয়োজন হলে সে নিজের জীবন দেবে।

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় লাবণ্য একাই গন্ধর্ব উদ্যানে এল। লাবণ্য এমন পোশাক পরে নিল যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়। গাছের আড়ালে লাবণ্য লুকালো। নিজের চুল দিয়ে নিজেকে আরও ভালোভাবে ঢেকে নিল। গভীর রাত হতেই গন্ধর্বরা জোড়ায় জোড়ায় বিহার করতে লাগল সেই উদ্যানে।

মধ্যরাত্রে সুব্রত এবং এক গন্ধর্বরানি ওই অঞ্চলে এল। লাবণ্য সহজেই বুঝতে পারল যে সুব্রতর সাথে যে আছে সে ওই গন্ধর্বরানি। ওরা কাছাকাছি আসতেই লাবণ্য মুহূর্তকাল অপচয় না করে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল।

গন্ধর্বরানি কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পারল যে এতদিন পর সুব্রত তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন গন্ধর্বরানি তার মায়াজাল বিস্তার করল।

গন্ধর্বরানি সুব্রতকে এক অজগর সাপ করে ফেলল। লাবণ্য সেই সাপকেই বুকে জড়িয়ে ধরে রইল। পরক্ষণে সেই সাপ সিংহ হয়ে গেল। সিংহকে দেখে লাবণ্য ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিতে বুকে জড়িয়ে ধরে রইল সেই সিংহকে। তারপর সেই সিংহ হয়ে গেল এক জ্বলন্ত শাবল। লাবণ্যর শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতেও লাবণ্য দমল না। জ্বলন্ত শাবলটাকে জড়িয়ে রইল বুকে। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করে রইল। তবু ছাড়ল না।

সুব্রতকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলে নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও লাবণ্য যে বদ্ধপরিকর! এক মুহূর্তের জন্যও লাবণ্য তা ভোলেনি। কিন্তু কষ্ট সহ্য করারও একটা সীমা আছে। লাবণ্য আর পারছিল না। তারপর যে কী হল সে তা জানে না। যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সেই উদ্যানে কেউ ছিল না। সুব্রত তখনও তার আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল। পরক্ষণে সুব্রতও জ্ঞান ফিরে পেল।

'আপনি আমাকে গন্ধর্বরানির হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। আমি যে কীভাবে এই ঋণ শোধ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। আগে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর নিজের বাড়ি ফেরার কথা ভাবব।' সুব্রত বলল লাবণ্যকে।

রাজকুমারী লাবণ্যকে দেখতে না পেয়ে রাজমহলের সবাই খোঁজাখুঁজি করছিল। রাজকুমারী সুব্রতসহ বাবার কাছে এসে সব কথা বলল। রাজা সব কথা শুনে সুব্রতকে বললেন, 'তোমাকে বাঁচাবার জন্যই আমার কন্যা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে। তাই, তোমার চেয়ে তার আপনজন আর কে হতে পারে।'

তারপর রাজার আশীর্বাদে ও উদ্যোগে লাবণ্য এবং সুব্রতর বিয়ের ব্যবস্থা হল।

৫০. উপায়

তাসখন্দ শহরে মীরকমল নামে এক ব্যাবসাদার ছিল। সে আর তার বউ ছিল খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই অন্য কোনো সমস্যা ছিল না। মীরকমল সপ্তাহে ছ-দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত। আর শুধু বুধবার সারাদিন বাড়িতে থাকত।

কোনো এক বুধবার মীরকমলের বউ কাঁদতে কাঁদতে বলল তার স্বামীকে, 'আমি আর পারছি না। একা একা টানা ছ-দিন এই বাড়িতে থাকতে। তুমি একটা ছাগল ছানা কিনে আনলে তো পার।'

মীরকমল দু-বছর বয়সি একটা দুর্বল ভেড়া পথ থেকে কিনে আনল সস্তা দামে। তারপর থেকে মীরকমলের বউ জমীরার সময় ভালো কাটছিল। সবসময় ভেড়া ডাকতে থাকে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি অনেক ঘাস ছিল, ভেড়া ওখানে ঘুরে বেড়াত। যা পেত তাই খেত। কিন্তু তার ডাক কমত না। সারাদিন সারারাত সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আর কাশে। আর খায়।

পরের বুধবার মীরকমল বাড়িতে রইল। জমীরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি আমাকে শেষ করতে চাও। সেইজন্যই এই ভেড়াটাকে কিনে এনেছ। হয় এই ভেড়াটাকে কোথাও রেখে এসো আর না হয় আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

'বাপের বাড়ি যাবে কেন? দেখছি কী করা যায়।' মীরকমল বলল।

সেইদিন মীরকমল নিজের মার কবরের কাছে গেল। উদ্দেশ্য প্রণাম করা। কবরের উপর অনেক ঘাস দেখে মীরকমল ভাবল, এই ঘাস ভেড়াকে খাওয়ালে ভালোই হবে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভেড়াটাকে নিয়ে গেল। কবরের পাহারাদারকে বলল, 'আরে ভাই আমি বুড়ো হয়েছি। আমার ছেলে-মেয়ে নেই। আমাকে যখন আল্লাহ ডাক দেবে তখন তো হঠাৎ আমাকে চলে যেতে হবে। তুমিই আমাকে কবর দেবে। খরচপত্তর কে দেবে না দেবে ঠিক নেই। তাই, আগেভাগে তোমার কাছে এই ভেড়াটাকে জমা রাখতে চাই।'
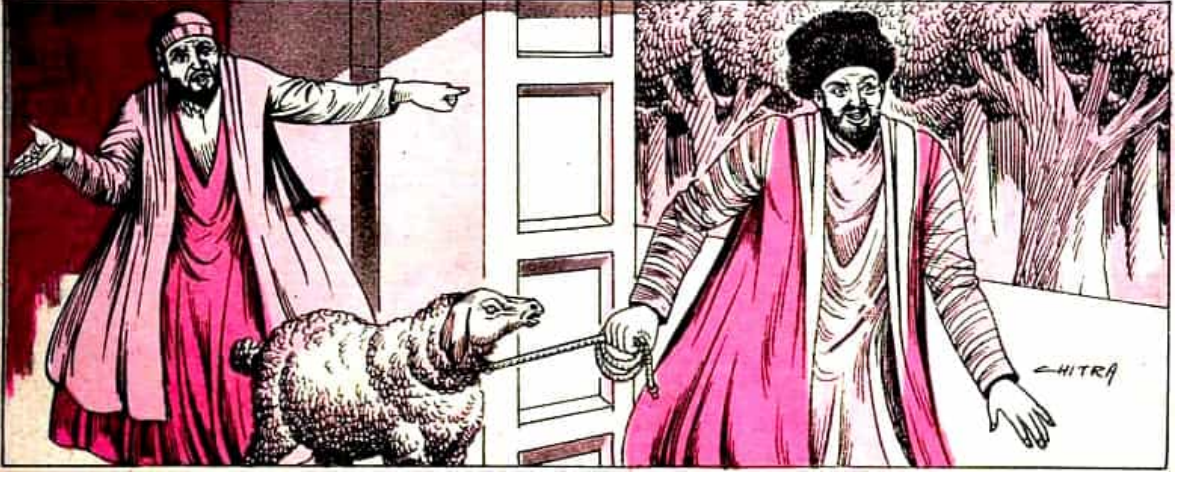
কবরের পাহারাদার রাজি হল।

দু-মাস কেটে গেল। একদিন মীরকমল কবরের কাছে গিয়ে ভেড়াটাকে চিনতে পারল না। ভেড়াটা মোটা হয়ে গেছে।

এর ওজন দেখছি দু-মনের কম হবে না। এত বড়ো ভেড়াটাকে কবরের পাহারাদারকে ফোকটে দেওয়া বোকামো হয়েছে। যেকোনোভাবে ভেড়াটাকে ফেরত নিতেই হবে। মীরকমল মনে মনে ভাবল।

তারপর সে পাহারাদারের কাছে গেল। তাকে বলল, 'আরে ভাই, আমি এক বড়ো বিপদে পড়ে গেছি। একটা ছেলে অসুখে পড়েছিল। তাকে আমি আধ চামচ রসকর্পূর দিয়েছি। ছেলেটা হঠাৎ মারা গেছে। কাল আমাকে তাসখন্দ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমার উপর আদেশ হয়েছে। তুমিও চল আমার সাথে।'

'আমি কেন যাব তোমার সাথে?' পাহারাদার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'যাবে না মানে? যেতেই হবে। আমাকে কবর দেবার কথা আছে না! সেই শর্তেই তো আমি তোমাকে আমার ভেড়া দিয়েছি।' মীরকমল বলল।

'আরে দুর তুমি যেখানে মরতে যাচ্ছ, যাও না। তুমি মর। আর সেখানে তোমার ভেড়াটাও মরুক।' কবরের পাহারাদার ধিক্কার দিতে দিতে বলল।

মীরকমলের কৌশল খেটে গেল। তাই সে মহা আনন্দে নাচতে নাচতে ভেড়াটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

৫১. যাচাই

এক জমিদার বাড়িতে রামী নামে এক ঝি ছিল। তার স্বামী সেই জমিদারের কাছেই কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে।

জীবন নামে রামীর এক ছেলে ছিল। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান কিন্তু ভীষণ অলস। একদিন রামী তার ছেলেকে বলল, 'তুমি কাজকর্ম কিছু করবে না? এভাবে চললে বাঁচবে কী করে? খাবে কী?'

জীবন বলল, 'মা, আমাকে কোনো কাজ পাইয়ে দাও না, দেখবে ঠিক কাজ করব।'

রামী খুব খুশি হল। সে জমিদারকে বলল। তার কথা শুনে জমিদার বলল, 'তুমি বলছ কিন্তু অলস ছেলেকে কী কাজ দেব বল তো? তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে আমার এখানে কাজ করেছ, তাই তোমার অনুরোধ সরাসরি ফেলতে পারছি না। ঠিক আছে নিয়ে এসো, দেখি কী করতে পারি।'

পরের দিন রামী জীবনকে নিয়ে এল। জমিদার জীবনকে বলল, 'তুমি আমার মোষ চরাতে পার। তবে মনে রেখ, এক-একটা মোষের দাম পাঁচ-পাঁচ-শো টাকা। একটা মোষ হারিয়ে গেলে তোমার কাছে পাঁচ-শো টাকা আদায় করব।' তারপর রামীকে জমিদার বলল, 'তোমার ছেলে যদি কোনো দোষ করে তারজন্য তুমি দায়ী থাকবে।'

রামী ভাবল, মোষের দাম তো পাঁচ-শো হবে না। তবে জীবনকে ভয় পাইয়ে দিতে জমিদার বেশি দাম বলে ভালোই করেছেন।

সেদিন থেকে জীবন জমিদারের মোষ চরাতে লাগল। কিন্তু মোষ চরানো জীবনের একদম ভালো লাগছিল না। কারণ সে একটু লেখাপড়া জানত। হিসেব কষতে পারত। জমিদার তাকে অন্য কোনো ভালো কাজ দিলে পারত। জীবনের ইচ্ছা করল মনের কথা জমিদারের কাছে জানাতে। কিন্তু ভাবল কেমন করে জানাবে।

একদিন জীবন অন্য একটা ছেলেকে জমিদারের মোষ চরানোর ভার দিল। তাকে জিলিপি খেতে দিল। নিজে চলে গেল অন্য গ্রামে। সাথে নিল একটা মোষ। মোষের পিঠে চুন দিয়ে লিখে দিল, 'এই মোষের দাম এক টাকা। যে কিনতে চাও সন্ধ্যার সময় মাঠে এসো।'

মাত্র এক টাকা দিয়ে মোষ কেনার আশায় প্রায় দু-হাজার লোক সন্ধ্যার সময় মাঠে পৌঁছাল। জীবন ওদের বলল, 'আপনারা সবাই এক টাকায় মোষ কিনতে চান। আমিও বেচতে চাই। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে পাবেন কী করে। তাই ভাবছি ভাগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। যাঁরা ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় যোগ দিতে চান তাঁরা একটা করে টাকা দিন।' সবাই জীবনকে একটা করে টাকা দিল। জীবন প্রত্যেকের নাম আলাদা আলাদা কাগজের টুকরোতে লিখে দিল।

যারা জড়ো হয়েছিল তাদের একজনকে কাগজের টুকরো জীবন তুলতে বলল। যার নামের কাগজের টুকরো উঠল তাকে ওই মোষটা দিয়ে জমিদার বাড়ি পৌঁছাল। জমিদারকে সে বলল, 'আপনার মোষ হারিয়ে গেছে। এই নিন আপনার টাকা।' এইকথা বলে জীবন সমস্ত টাকা জমিদারের সামনে রেখে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

জমিদার সব শুনে বলল, 'আরে জীবন, তোমার যে এত বুদ্ধি তা তো জানতাম না। না না তোমাকে আর মোষ চরাতে হবে না।' বলে, জমিদার জীবনকে কিছু টাকা উপহার দিয়ে তাকে হিসেবের খাতা দেখার ভার দিল। ছেলের বুদ্ধির এবং নতুন কাজের কথা শুনে রামী খুশি হল।

৫২. চুরির সাজা

কৃষ্ণা নদীর তীরে এক গ্রামে গঙ্গারাম ও যমুনাদাস নামে দু-জন কিষান ছিল। গঙ্গারাম ছিল অলস এবং ধূর্ত। আর যমুনাদাস ছিল পরিশ্রমী ও নম্র স্বভাবের। সেইজন্য যমুনাদাসের খেতে ফসল হত বেশি। তার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু গঙ্গারাম খেতখামারের কাজে মন দিত না। সে সবসময় নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা মেরে বেড়াত।

যমুনাদাসের কাছে টাকাপয়সা জমলে সে ডিমের ব্যাবসা করতে আরম্ভ করল। ডিমের ব্যাবসাতেও তার অনেক লাভ হল।

গঙ্গারামকে তার বন্ধুরা বলল, 'যমুনাদাস ডিমের ব্যাবসা করে অনেক টাকা করেছে। তোমার খেতে তো বেশি ফসল হয় না। তাই, তুমিও ডিমের ব্যাবসা কর না কেন?' গঙ্গারাম যমুনাদাসের বাড়ি গেল। ডিমের ব্যাবসার সব কথা জানতে চাইল। অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে সব কথা খুলে বলল যমুনাদাস।

গঙ্গারাম কয়েকটা মুরগি কিনে আনল। কিন্তু সেগুলোকে ঠিকমতো পোষার ধৈর্য তার ছিল না। যমুনাদাস মুরগির কাছ থেকে বেশি ডিম পেত।

যমুনাদাস ও গঙ্গারামের দোকান দুটো পাশাপাশি ছিল। গঙ্গারাম বেশি লোভী ছিল। সুযোগ পেলেই সে যমুনাদাসের দোকান থেকে ডিম চুরি করত।

যমুনাদাসের দোকান থেকে গঙ্গারাম প্রায় প্রত্যেক দিন ডিম চুরি করত। একদিন হাতেনাতে গঙ্গারামকে ধরে আর কোনোদিন চুরি না করতে শাসিয়ে দিল যমুনাদাস। কিন্তু স্বভাব না যায় মলে। সে ঠিক এক ফাঁকে চুরি করে নিত।

একদিন বাধ্য হয়ে যমুনাদাস বিচারপতির কাছে গঙ্গারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সেদিন তার কুড়িটা ডিম চুরি করেছিল। গঙ্গারাম বিচারপতির কাছে চুরি করার ব্যাপারটা অস্বীকার করল। প্রমাণের অভাবে বিচারপতি যমুনাদাসের অভিযোগ গ্রহণ করতে পারল না।

যমুনাদাস ভাবনায় পড়ে গেল। তার ওই অবস্থা দেখে বউ বলল, 'তুমি এত ভাবছ কেন? ভাবলে ওই চোরটার কী হবে? ওকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায় তাই ভাব।'

'আমি অনেক ভেবেছি। আর ভাবতে পারছি না। কোনো উপায় বের করতে পারছি না।' যমুনাদাস জবাবে বলল।

'আমার মামা গণপতি মন্ত্রতন্ত্র জানে। তার কাছ থেকে পরামর্শ নাও না কেন?' যমুনাদাসের বউ বলল।

'ঠিক আছে কাল সকালে যাব। পরামর্শ করে দেখি কী বলেন।' যমুনাদাস বলল। পরের দিন সকালে যমুনাদাস গণপতির বাড়ি গিয়ে নিজের কথা জানাল।

গণপতি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'যমুনাদাস, আমার কথামত চললে চোর সহজেই ধরা পড়বে।' তারপর যমুনাদাসকে একটা উপায় গণপতি জানিয়ে দিল।

ফেরার পথে যমুনাদাস কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফিরে একা একটা ঘরে বসে কী যেন করে নিল।

যমুনাদাসের সেদিন ডিম নিয়ে দোকানে যেতে দেরি হল। ডিমের ঝুড়ি দোকানে রেখে জল খেয়ে আসার নাম করে সে দোকান ছেড়ে চলে গেল। তার ফেরার আগেই গঙ্গারাম কিছু ডিম চুরি করে নিল।

যমুনাদাস কিছুক্ষণ পর দোকানে ফিরে এসে বুঝতে পারল যে তার কিছু ডিম চুরি হয়ে গেছে। সে চিৎকার করে উঠল, 'চোর! চোর!' তার চিৎকার শুনে সেপাই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ভাই, চেঁচাচ্ছ কেন?'

'এই গঙ্গারাম আবার ডিম চুরি করেছে।' যমুনাদাস অভিযোগ করল।

'এ ডাহা মিথ্যা কথা।' গঙ্গারাম বলল।

'যমুনাদাস, তুমি এর আগেও একবার চুরির অভিযোগ করেছিলে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি।'

'কিন্তু এবার আমি প্রমাণ করে দেব।' যমুনাদাস বলল।

গঙ্গারাম ও যমুনাদাস নিজের নিজের মালপত্র নিয়ে বিচারালয়ে গেল। যমুনাদাসকে দেখেই বিচারপতি বলল, 'তুমি আবার এলে?'

'আজ্ঞে হুজুর যমুনাদাস বলছে গঙ্গারাম তার ডিম চুরি করেছে।' সেপাই বিচারপতিকে বলল।

'কোনো প্রমাণ আছে?' বিচারপতি জিজ্ঞেস করল।

'গঙ্গারাম কাঁচা ডিম বিক্রি করে, তার কাছে সিদ্ধ করা ডিম থাকে কী করে? আজকে আমি ইচ্ছে করে সিদ্ধ করা ডিম এনেছিলাম।' যমুনাদাস বলল।

'আমার বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে আমিও আজকে কিছু ডিম সিদ্ধ করে এনেছিলাম।' গঙ্গারাম বলল।

'হুজুর, আপনি গঙ্গারামের ঝুড়ির সিদ্ধ ডিমগুলো ভেঙে দেখে নিন। চোকলার নীচে আমার নাম লেখা আছে। আপনি দয়া করে যাচাই করে দেখুন।' যমুনাদাস বলল।

'ভালো কথা। দেখছি।' এ-কথা বলে বিচারপতি গঙ্গারামের ঝুড়ি থেকে ডিম বের করাল। ভাঙিয়ে তাতে যমুনাদাসের নাম লেখা আছে কি না পরীক্ষা করাল। সিদ্ধ ডিমের চোকলার নীচে যমুনাদাসের নাম লেখা ছিল।

যমুনাদাস হাসতে হাসতে বলল, 'হুজুর, আপনি গঙ্গারামকে জিজ্ঞেস করুন, কীভাবে, কোন জাদু বলে ডিমের চোকলার ভিতরে সে নাম লিখল।'

গঙ্গারাম কোনো জবাব দিতে পারল না। বিচারপতি বুঝতে পারল যে গঙ্গারাম ডিম চুরি করেছে। তাই গঙ্গারামকে সাজা দিল বিচারপতি।

যমুনাদাস খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে বউকে বলল, 'গঙ্গারামের চুরির উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছি।'

'তুমি প্রমাণ করলে কী করে যে গঙ্গারাম চোর। যমুনাদাসের বউ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। যমুনাদাস হাসতে হাসতে তাকে বলল, 'গঙ্গারাম যে ডিমগুলো চুরি করেছিল সেই ডিমগুলোর চোকলার নীচে আমার নাম লেখা ছিল। সেই নাম দেখেই বিচারপতি ভালোভাবেই বুঝল যে গঙ্গারাম চোর।

'আচ্ছা, ডিমের চোকলার নীচে তোমার নাম লেখা ছিল কী করে?' যমুনাদাসের বউ জিজ্ঞেস করল।

'বলছি। গণপতি মামার কাছে যা শিখেছি তাই করেছি। মামার কাছ থেকে ফেরার পথে আমি দোকান থেকে অম্লসুরা আর ফিটকিরি কিনে এনেছিলাম। তারপর ওই অম্লসুরা ও ফিটকিরি মিশিয়ে যে দ্রবপদার্থ তৈরি হল সেই পদার্থ দিয়ে ওই ঘরে একা একা বসে ডিমের উপর আমার নাম লিখেছিলাম। সেটা শুকিয়ে যাওয়ার পর তুমি ডিমগুলো সিদ্ধ করলে। ব্যাস, এই যা করেছিলাম।' যমুনাদাস বলল।

৫৩. টান

এক গ্রামে শিবরাম নামে এক কিষান ছিল। তার কিছু জমিজায়গা ছিল। আর ছিল তিনটি ছেলে। তিন জনই বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করত।

ছেলেরা বড়ো হলে শিবরাম তাদের বিয়ে দিয়ে চাষ-আবাদের সমস্ত ভার তাদের হাতে সঁপে দিল।

বউমাদের বাড়িতে আনার সাথে সাথে শিবরামের জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। ভোরে ঘুম ভাঙতেই এক বউ তার মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিত। মুখ ধোওয়ার সাথে সাথে অন্য বউ তার জন্য জলযোগের খাবার নিয়ে হাজির হত। জলযোগের পরে তৃতীয় বউ বড়ো পিঁড়ি আঙিনায় নিয়ে হাজির হত।

বউরা শিবরামের সব রকমের সুব্যবস্থা করে দিত। ছেলেরা চাষ-আবাদ করে যা রোজগার করত তাই এনে দিত বাপের হাতে।

শিবরাম ভাবত তার মতো সুখী জগতে আর কোনো বাপ নয়। সামনে দিয়ে কেউ গেলে তাকে কাছে ডাকত, পাশে বসাত। আর সে যে কত ভালো আছে তাই জানাত।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও রামনাথকে সে তার সুখে আনন্দে থাকার কথা জানাল। বউ এবং ছেলেরা যে তাকে কত ভালো রেখেছে তাও জানাল। সব শুনে রামনাথ বলল, 'একটা কাজ করলে তুমি আরও সুখী হবে, আরও আনন্দে দিন কাটাতে পারবে। তোমার সমস্ত জমিজায়গা তিন ছেলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দাও। তাহলে মরেও শান্তি পাবে। তা না হলে তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে ছেলেরা লাঠালাঠি করবে।' এ-কথা বলে রামনাথ চলে গেল।

শিবরাম বন্ধু রামনাথের কথা রাত্রে ভেবে বিচার করে ঠিক করল ভাগ করে ছেলেদের দিয়ে দেওয়াই ভালো। পরের দিনই ছেলেদেরে ওই সমস্ত জমি সমান ভাগে ভাগ করে দিল।

এই ঘটনার পরের দিন থেকেই শিবরামের জীবন আর এক মোড় নিল। তার সেবা করা বন্ধ করে দিল। তার কখন কী দরকার তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। চাষ-আবাদ করে কে যে কত রোজগার করছে তা বাপের হাতে দেওয়া তো দূরের কথা তাকে জানায়ও না।

শিবরামের কাছে নিজের জীবন ভার মনে হল। আঙিনায় মাথা গুঁজে বসে থাকত। সামনে দিয়ে যারা যাতায়াত করত তাদের ডেকে নিজের দুঃখের কথা জানাত। শিবরামের অন্য বন্ধু পবিত্র একদিন সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, 'তোমার বিষয়সম্পত্তির জন্যই ছেলে আর বউমারা তোমাকে ভালোভাবে দেখত। সম্পত্তি ভাগ করার পর তোমার কাছে তাদের আর কোনো প্রয়োজন রইল না। আবার যদি সুখী হতে চাও তো একটি মাত্র পথই খোলা আছে তোমার সামনে। আমি তোমাকে একটা টিনের বাক্সে করে এক-শো টাকার খুচরো দেব। রাত্রে তুমি তোমার ঘরের খিল এঁটে ওই খুচরো সব মেঝেতে ফেলে একটা একটা মুদ্রা সশব্দে টিনের বাক্সে উঁচু করে ফেলবে। ফেলবে আর আস্তে আস্তে করে তুলবে। এইভাবে এক ঘণ্টা ধরে গুনবে। তারপর দেখবে কী হয়।'

সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন শিবরামের বউমারা অনেকক্ষণ ধরে টাকাপয়সা গোনার শব্দ শুনতে পেল। প্রথম প্রথম বউগুলো অবাক হত। পরে শ্বশুর মশাইয়ের উপর তাদের টান যেন দিনকে দিন হু-হু করে বেড়ে যেতে লাগল। তার প্রতি বউদের ব্যবহার আগের মতোই হয়ে গেল। ছেলেরাও চাষবাসের ব্যাপারে বাপের কাছে সমস্ত জানাতে বসত। শিবরামের দিনকাল ভালো ভাবে কাটছে দেখে তার বন্ধু পবিত্র খুব খুশি হল।

কয়েক বছর পরে শিবরামের অসুখ করল। শিবরাম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। বউরা আর ছেলেরা ওই টিনের বাক্সে কত টাকা আছে জানার জন্য ছটফট করছে। তখন মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে দেখতে গেল পবিত্র। শিবরামের ছেলে আর বউমাদের হাঁকপাকানি দেখে সে ওদের বলল, 'আরে তোমরা ওই টিনের বাক্সের কাছে বসে আছ কেন? আগে শিবরামের কাছে বসো। তিনি মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তি করে দশ জনকে ডেকে বাক্সটা খুলবে। যা পাবে তিন জনে ভাগ করে নেবে।'

পবিত্রের কথা শুনল ছেলেরা এবং বউরা। শিবরামের মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা শ্রাদ্ধশান্তি করল। তারপর দশ জনকে ডেকে ওই টিনের বাক্স খুলল। তাতে মাত্র কিছু খুচরো পয়সা ছিল। আর সেই খুচরোর মধ্যে একটা চিরকুটে লেখা ছিল এই টিনের বাক্স এবং তাতে যে এক-শো টাকার খুচরো আছে তা আমার বন্ধু পবিত্রকে যেন দেওয়া হয়। এই খুচরো পয়সা সব তার। বাক্সটাও তারই।

চিরকুটের বয়ান পড়ে ছেলেরা আর বউরা তো অবাক। পবিত্র ওই টিনের বাক্সসহ খুচরো নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

৫৪. অহংকার

পাণ্ডু রাজার সভায় বিষ্ণুশর্মার নামে এক পণ্ডিত ছিল। রাজা ওই পণ্ডিতকে বিশেষভাবে খাতির করতেন। ওই ধরনের পণ্ডিত তাঁর প্রাসাদে থাকার জন্য তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন। রাজার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেই পণ্ডিত অন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে কর আদায় করত। কর দিতে যে রাজি হত না তাকে শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করে বিষ্ণুশর্মাকে হারাতে হত। এই কারণে বিষ্ণুশর্মার নাম ঝগড়ুটে পণ্ডিত নামে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বহু পণ্ডিত ওই রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেল।

ওই রাজ্যে আর একজন পণ্ডিত ছিলেন। নাম তাঁর মহাভাষ্য ভট্ট। তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। উনিও অন্য পণ্ডিতদের মতো যথারীতি কর দিতেন বিষ্ণুশর্মাকে।

মহাভাষ্য ভট্টের এক শিষ্য ছিল। নাম তার যামুনু। শিষ্যটি ছিল খুব চরিত্রবান এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিজের গুরুকে সে দেবতার মতো ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করত। গুরুর কাছে সে সমস্ত রকমের বিদ্যা অর্জন করেছিল।

মহাভাষ্য ভট্ট দু-বছর কর দিতে পারেননি। তাঁর কাছ থেকে কর আদায় করে আনতে বিষ্ণুশর্মা তার একজন শিষ্য ভঞ্জকে পাঠালেন। ভঞ্জ ছিল অত্যন্ত বদ মেজাজের লোক।

ভঞ্জ মহাভাষ্য ভট্টের বাড়ি গিয়ে দেখে তিনি বাড়ি নেই। কোনো কাজে তিনি অন্য গ্রামে গেছেন। মহাভাষ্য ভট্ট সম্পর্কে সে বাজে রসিকতা করে কথা বলল।

ভঞ্জর কথা যামুনুর ভালো লাগল না। ভেতরে ভেতরে তার খুব রাগ হল। গুরুর অপমান যামুনু আর সহ্য না করতে পেরে বলল, 'আমার গুরুর কাছ থেকে তোমার গুরুর কর আদায় করার দরকারটা কী? শাস্ত্রজ্ঞানে কি আমার গুরু তোমার গুরুর চেয়ে জ্ঞান কম রাখেন? কোনোদিন কি তা প্রমাণ হয়ে গেছে?'

'তাহলে তুমি তোমার গুরুকে গিয়ে বল, যদি সাহস থাকে তো আমার গুরুকে যেন তর্ক করে হারিয়ে দেয়। তাহলে আর কর চাইতে কেউ তাঁর কাছে আসবে না।' ভঞ্জ বলল।

'তোমার গুরুকে হারাতে আমার গুরুকে অত দূর যেতে হবে! চল আমি যাচ্ছি তোমার গুরুর সাথে তর্ক করতে। আর কাউকে কোনোদিন কর দিতে হবে না।' বলে যামুনু ভঞ্জের সাথে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাজ দরবারে যামুনুর আসার কারণ অন্য সব পণ্ডিতরা জানতে পেরে মনে মনে ভাবল, হাতি ঘোড়া হল তল, মশা বলে কত জল? ছোকরাটার সাহস তো দেখছি কম নয়।

বিষ্ণুশর্মার প্রতি রাজার টান থাকলেও রানির কিন্তু একটুও ছিল না। যামুনুকে দেখে রানি ভাবলেন, এ তো দেখছি একটা আগুনের ফুলকি। খড়ের গাদা যত বড়োই হোক না সেটাকে পুড়িয়ে ছাই করার পক্ষে একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট।

বিষ্ণুশর্মা রাজ দরবারে যামুনুকে বলল, 'তুমি তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো যুক্তি খাড়া কর, আমি তার খণ্ডন করব। আমি খণ্ডন করতে না পারলে তুমি খণ্ডন করবে। তখন তোমার জয় হবে।'

যামুনু হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার মা বন্ধ্যা নন।'

'এ-কথা ধ্রুব সত্য। এটা খণ্ডন করা যায় না।' ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

'পাণ্ডুরাজা ধর্মাত্মা পুরুষ।' যামুনু বলল।

'এ-কথাও ধ্রুব সত্য। এ খণ্ডন করা যায় না।' ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

'মহারানি পতিব্রতা।' যামুনু বলল।

'এ-কথাও ধ্রুব সত্য।' ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

'আপনি হেরে গেছেন। আমি যে তিনটি কথা বলেছি সেগুলো আমি খণ্ডন করতে পারি।' যামুনু বলল।

এই কথাগুলো শুনে দরবারের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আপনি আপনার মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। মনুসংহিতায় বলেছে, ''এক পুত্রো হ্যপুত্র ইতি লোকবাদাৎ।'' তাই আপনি আপনার মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আপনার মা বন্ধ্যা।
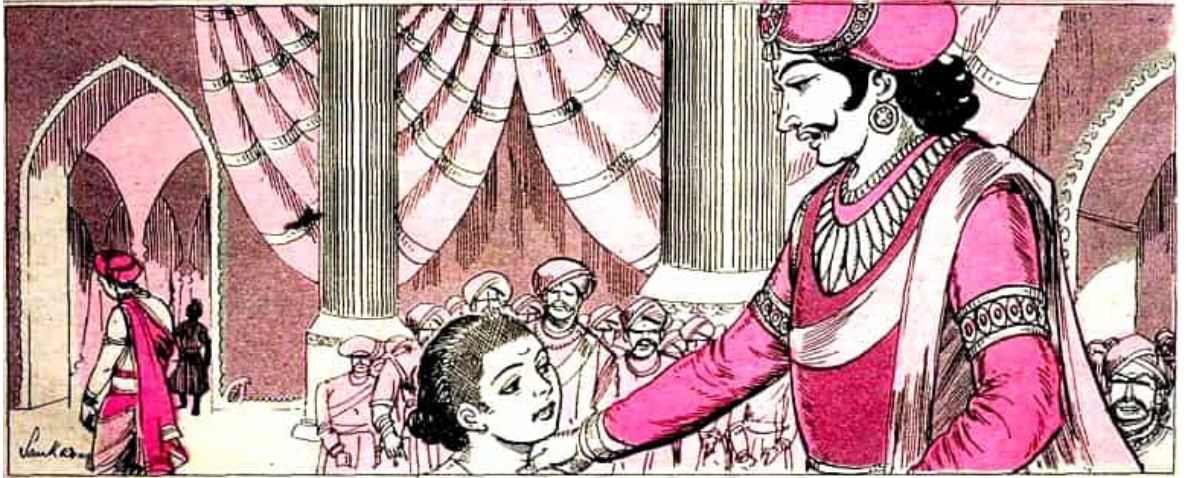
'এখন বাকি রইল রাজার ব্যাপার। ''সর্বতো ধর্ম ষডভাগো, রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ অর্ধমাদপি ষডভাগো, ভবত্যস্যহ্য রক্ষতঃ'' এটাও মনুসংহিতায় আছে। অর্থাৎ প্রজারা যে

পাপ-পুণ্য করে তার ছ-ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য হয়। এই কলি যুগে রাজা যত বড়োই ধর্মাত্মা হোক না কেন প্রজারা অধর্মমূলক কাজ অবশ্যই করে থাকে এবং এই অধর্ম কাজের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা পেয়েছেন। অতএব আমাদের রাজা সম্পূর্ণ ধর্মাত্মা হতে পারে না।

'এখন বাকি থাকে রানির প্রসঙ্গ। মনুসংহিতায় রাজার বিষয়ে আছে, ''সোগ্নির্ভবতি, বায়ুশ্চ, সোর্ক, সসোম, সসধর্মরাট, সকুবের, সসবরুণঃ, সমহেন্দ্রঃ, প্রভাবতঃ'' রাজার মধ্যে এইভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র প্রমুখ আট জনের অস্তিত্ব থাকে। এহেন রাজার স্ত্রী পতিব্রতা হয় কী করে?' যমুনু জিজ্ঞেস করল।

রাজা ও রাজদরবারের প্রত্যেকে যামুনুর অকাট্য যুক্তি শুনে খুশি হল। ঝগড়ুটে পণ্ডিত পরাজিত হয়ে মাথা নীচু করে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

৫৫. কিপটে বুড়ি

এক গ্রামে এক কিপটে বুড়ি ছিল। তার কিপটেমির বিষয়ে অনেক ধরনের গল্প প্রচলিত ছিল। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা পড়ো পড়ো কুঁড়ে ঘর। একটা বাদাম গাছ আর একটা নিম গাছ। সে কাউকে তার কাছে ঘেঁষতে দিত না।

কেউ তার কাছে নিমপাতা চাইতে এলে এক মুঠো চালের পরিবর্তে এক আঁটি নিমপাতা দিত। কেউ বাদাম চাইতে এলে এক পয়সার পরিবর্তে একটা বাদাম দিত। রান্না খাওয়ার বাসন বলতে ছিল শুধু কয়েকটা মাটির পাত্র। বিছানা বলতে ছিল এক দুর্গন্ধযুক্ত বালিশ। আর ছিল একটি ছেঁড়া কম্বল।

সেই গাঁয়ে কেষ্ট নামে এক ভবঘুরে বেকার ছেলে ছিল। বুড়ির কাছে থাকলে ভালোই হবে। বুড়ি বেশি দিন তো বাঁচবে না। সে মরে গেলে তার সমস্ত সম্পত্তির সেই হবে মালিক।

একদিন কেষ্ট বুড়ির কুঁড়ে ঘরে গেল। বুড়ি তখন বাদাম গাছের নীচে কম্বল বিছিয়ে মাথার নীচে বালিশ দিয়ে শুয়ে কাঠবিড়ালি পাহারা দিচ্ছিল।

'দিদিমা, গাছের বাদাম খেতে কেমন লাগে?' কেষ্ট বলল।

বুড়ি কেষ্টর দিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'বাবা, বাদাম যে খেতে কেমন তা তো আমি কোনোদিন দেখিনি। তুমি এক পয়সা দিয়ে খেয়ে দেখে আমাকে বলতো কেমন লাগে।'

এ-কথা শুনে হেসে উঠে কেষ্ট বলল, 'দিদিমা, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমাকে তোমার ঘরে রেখে দাও না কেন।' কেষ্ট বলল।

'তুমি কি কাজে আসবে আমার? তোমাকে যা খেতে দেব তাই আমার অপচয়।' বুড়ি জবাবে বলল।

'কাজে আসব না কে বলল? দু-দিন আমাকে তোমার কাছে রেখেই দেখ না। যদি মনে কর আমাকে রাখার দরকার নেই। তাহলে রেখো না। তোমার বাদাম আর নিম আমি বাজারে বিক্রি করব। তোমার রোজগার দু-পয়সা বেশি হবে।' কেষ্ট বলল।

বুড়ি একটু ভেবে বলল, 'ভালো কথা। এখন কাঠবিড়ালি পাহারায় লেগে যাও। তোমার কাজে খুশি হলে আমি তোমাকে রাখব।' এ-কথা বলে বুড়ি কম্বল আর বালিশ নিয়ে ঢুকে গেল কুঁড়ের ভিতর।

বুড়ি কেষ্টকে খাওয়াত বটে তবে সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাত। বাদাম এবং নিমের আঁটি গুনে দিত। বাজারে বিক্রি করতে বলত। এক পয়সাও এদিক-ওদিক হলে বকুনি দিত। এত কষ্ট সহ্য করেও কেষ্ট বুড়ির কাছে পড়ে থাকত।

কয়েক দিন পরে বুড়ি একবারে দুর্বল হয়ে গেল। বুঝতে পারল যে তার মরার দিন এগিয়ে এসেছে। বুড়ি ভাবল মারা গেলে তো কুঁড়ে ঘরটা অন্যের হাতে চলে যাবে। তাই সে এক বেনের কাছে কুঁড়ে ঘরটাকে বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে নিল।

বুড়ি মারা যাবার পর বেনেটা কেষ্টকে ডেকে বলল, 'হ্যাঁরে কেষ্ট, তোর দিদিমা তো কুঁড়ে ঘরটাকে দু-শো টাকায় বাঁধা রেখে গেছে। ওই ঘরে তোর ভাগ আছে না কি?'

কেষ্ট কোনো কথা না বলে কুঁড়ে ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, এতগুলো টাকা বুড়ি রাখল কোথায়!

প্রত্যেক দিন বুড়ি ঘুমাত ওই কুঁড়ে ঘরে আর কেষ্ট ঘুমাত বাদাম গাছের নীচে। একদিন রাত্রে শব্দ পেয়ে কেষ্ট ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভিতর তাকাল। দেখতে পেল প্রদীপের আলোতে বুড়ি টাকাপয়সা গুনছে। বুড়ি যতই গোনো, তোমার মারা যাবার পর এইসব টাকা আমার হাতেই পড়বে। মনে মনে কেষ্ট ভাবল। ফিরে এল গাছের নীচে।

একদিন বুড়ি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। শ্বাস-প্রশ্বাসও তার চলছে না ভালো ভাবে। বুড়ি ভাবল সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। সে কেষ্টকে ডেকে বলল, 'বাবা কেষ্ট, আমি আর বাঁচব না। মরে গেলে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে কিছু লোক তো লাগবেই। তারা কিছু খরচও করতে বলবে। তুমি বরং এখনই আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাও। আমি ওখানেই মরব।'

কেষ্ট রেগে গিয়ে বলল, 'শ্মশানে মরে গেলে কি খরচ লাগবে না। কাঠ তো চাই, মানুষ ছাড়া আমি একা পোড়াতে পারব কী করে!'

'ওরে কেষ্ট তুমি আমার দেহটাকে কেন মিছামিছি পোড়াতে চাইছ। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। গর্ত খুঁড়ে আমাকে কবর দিলেই তো পার। অন্যদের বলবে কেন, তুমি নিজেই এখন গর্ত খুঁড়ে রাখ। প্রাণ বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে গর্তে ফেলে দেবে। ব্যাস কোনো খরচ নেই, ঝামেলা নেই।' বুড়ি যেন একটা নতুন উপায় বলল।
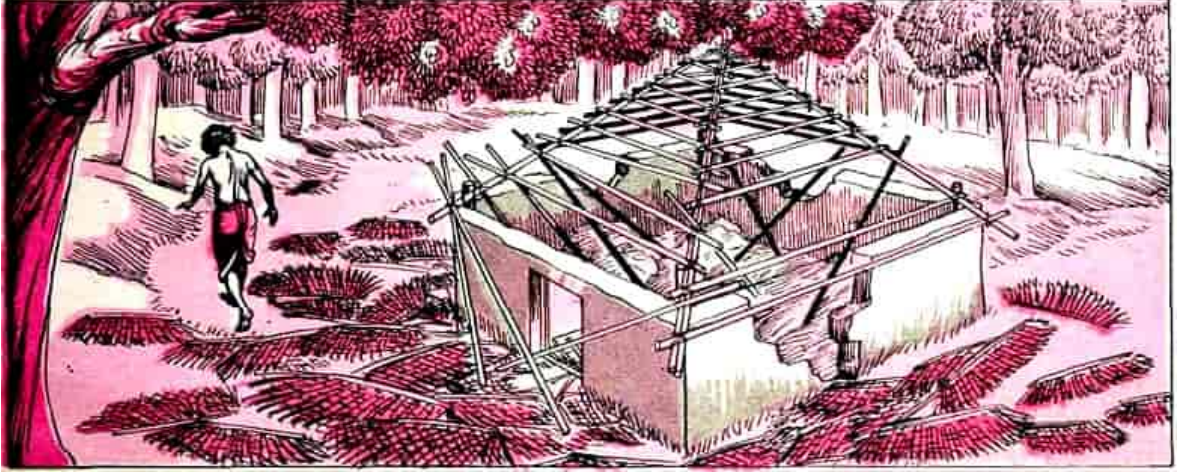
কেষ্ট ভাবল বুড়ির যা কিছু বাঁচবে তা তো তারই হবে। তারপর বুড়ি কম্বল আর বালিশ বগল দাবা করে কবর খানায় পৌঁছাল। কবর খানায় তখন কেউ ছিল না। একটা তেঁতুল গাছের নীচে বুড়ি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

কেষ্ট গর্ত খুঁড়তে লাগল। বুড়ি জিজ্ঞেস করল, 'বাবা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছ?'

'গর্ত খোঁড়া শেষ হলে তোমাকে জানাব।' কেষ্ট বলল।

কেষ্টর গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে ভোর হয়ে এল।

'দিদিমা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছি।' কেষ্ট বলল।

বুড়ি কথা বলল না। কেষ্ট ভাবল বুড়ি অক্কা পেয়েছে। এখন বুড়ির যা কিছু আছে সব আমার। মনে মনে কেষ্ট খুব খুশি। একটা লাঠি দিয়ে বুড়ির নোংরা কম্বল আর বালিশ ফেলে দিলে গর্তে। তারপর বুড়িকেও ওই গর্তে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে কুঁড়ে ঘরের দিকে ফিরে এল।

কুঁড়ে ঘরে ঢুকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে এক কানাকড়িও পায়নি। মেঝেতে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখল। কোথাও এক পয়সা নেই। চালাটাকে নাবিয়ে নাবিয়ে খুঁজল সেখানেও নেই কানাকড়ি। কেষ্ট ভাবল যেদিন বুড়ি ঘরটাকে বাঁধা রেখে দিল সেই দিনই টাকাটা খুঁজলে পেয়ে যেত। মনকে বোঝাতে লাগল। বুড়ির কাছে হয়তো আগের জন্মের ঋণ ছিল তাই সে শোধ করে দিল।

কেষ্টর মনে একবারও জাগল না যে সে নিজের হাতে করে বুড়ির সমস্ত টাকাপয়সা গর্তে ফেলে দিয়েছে। সে বুঝতে পারল না বুড়ি যে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত বালিশটা কাছ ছাড়া করত না সেই বালিশেই সব টাকা ছিল। বুড়ি নিজের সাথেই বালিশ নিয়ে কবরে গেছে।

সকাল হয়ে গেল। কুঁড়ে ঘরটা ভেঙেচুরে দিয়েছে। এবার বেনেটা এসে তাকে শাস্তি দেবে ভেবে কেষ্ট পা চালিয়ে ওই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

৫৬. পুরস্কার

এক জমিদারের চারটি মেয়ে ছিল। বিয়ের বয়স হওয়ার পর একজন বাদে তিন জনের বিয়ে হয়ে গেল। সবার বিয়ে হল এমন পাত্রদের সাথে যারা ঘরজামাই থাকতে রাজি।

এবার চতুর্থ মেয়ের বিয়ের পালা। চতুর্থ মেয়ে কিন্তু ওই বাড়ির চাকর রামের সাথেই বিয়ে করতে চায়। রাম বাচ্চা বয়স থেকেই ওই জমিদার বাড়িতেই কাজ করছিল। তাই জমিদার মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজের ছোটো মেয়ের বিয়ে রামের সাথেই দিয়ে মেয়েকে বললেন, 'মা আমি তোমার স্বামীকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাকে নিয়ে আলাদা ঘর করে থাক। রামের সাথে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, বিয়ে দিয়েছি। আমি চাই না তোমার একার জন্য তোমার বোনদের আর তাদের স্বামীদের লজ্জায় মাথা কাটা যাক।'

এ-কথা কানে যেতেই রাম জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তার জন্য জমিদার বাড়ির মেয়ে দাসী হোক এটা সে চাইছিল না। সে ভাবল যে তার বউকে সসম্মানে রাখবে। তার ব্যবস্থা করতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। যেদিন বউকে ভালো ভাবে রাখার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে সেদিন সে ফিরে আসবে। নিজের ভাগ্যকে একবার যাচাই করে নিতে রাম বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

যেতে যেতে পরের দিন সকালে রাম এক বনে পৌঁছাল। বনের মাঝে একটা ময়দান ছিল। সেই ময়দানে একপাল গোরু চরছিল। একটি গাছের নীচে এক বুড়ো খেতে বসেছিল। এমন সময় এক গর্ভবতী গাই ডাক ছাড়ল। বুড়ো ওখানেই খাবার ফেলে রেখে দৌড়ে গেল। গোরুটির বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত সে ওইখানেই ছিল। খাবারের কাছে পৌঁছে গেল কাক আর কুকুর। রাম ওই কাক আর কুকুর তাড়াচ্ছিল।

'বাবা আমার খাবার পাহারা দিয়ে খুব উপকার করেছ। তুমি না থাকলে খাবার কুকুর আর কাকের পেটে যেত। তুমি কে বাবা?' বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।

'জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছি। আমার আপনজন কেউ নেই।' রাম জবাবে বলল।

বৃদ্ধ কিছু খাবার ওকে খেতে দিয়ে নিজের কাহিনি শোনাল।

ওই বৃদ্ধের কাছে এক-শো-টি গোরু আছে। বৃদ্ধের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। গোরু চরাতে আগে সে একটা চাকর রেখেছিল। কিন্তু চাকরটা গোরু বিক্রি করে টাকা মেরে দিল। অগত্যা বৃদ্ধ নিজেই গোরু চরায়। বৃদ্ধের কাহিনি শুনে রাম বলল, 'আপনি বুড়ো

হয়েছেন। আমি আপনার সেবা করতে চাই। আপনার গোরু চরাতে চাই। তার পরিবর্তে আপনার যা ইচ্ছে তাই আমাকে দেবেন।'

বৃদ্ধ রাজি হয়ে গেল। রাম গোরুর দুধ দুইত। দুধ বিক্রি করে টাকা এনে বৃদ্ধকে দিত। গোরু চরানো, জাব দেওয়া প্রভৃতি কাজ রাম একাই করত।

পনেরো দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রামকে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখল। বৃদ্ধ বুঝতে পারল যে রাম বিশ্বাসী লোক। তাই বৃদ্ধ রামকে বলল, 'বাবা ভালো মেয়ে দেখে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই।'

'হুজুর ক্ষমা করবেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। টাকাপয়সা রোজগারের জন্য বেরিয়েছি।' রাম নিজের কাহিনি শোনাল।

বৃদ্ধ রামের কাহিনি শুনে বলল, 'তাহলে তুমি এর চেয়ে ভালো কোনো কাজের খোঁজ করছ না কেন? আমার কাছে কাজ করে তুমি কত আর রোজগার করতে পারবে?'

'হুজুর এর চেয়ে বেশি রোজগার করার বা কাজ করার ক্ষমতা কি আমার আছে? আমি কি পারব? ভাগ্যে যদি থাকে তো এতেই হয়ে যাবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি এই ধরনের সাধারণ কাজই করে আসছি। এ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার রুটিই প্রথম খেয়েছি। আপনাকে খুশি করাই আমার প্রধান কর্তব্য।'

রামের কথা শুনে বৃদ্ধ চুপ করে বসে রইল। কিছুদিন পরে একদিন বৃদ্ধ রামকে বলল, 'বাবা, গোরুগুলোর জন্য একটা গোয়াল দরকার। যেখানে দাগ দিয়েছি আজ রাত্রে সেখানে গর্ত খুঁড়বে। বাকি কাজ কাল সারা যাবে।'

সেদিন রাত্রে বৃদ্ধের ঘুমানোর পর রাম গর্ত খুঁড়ল। দুটোতেই রাম ধন ভরতি দুটো হাঁড়ি পেল। রাম গর্ত থেকে হাঁড়ি দুটো বের করে খুব সাবধানে ঘরে রাখল। আর সকাল হতেই রাম ওই হাঁড়ি দুটো বৃদ্ধকে দিয়ে দিল। বৃদ্ধ হাঁড়ি দুটো দেখে বলল, 'রাম তুমি যে সৌভাগ্যের অপেক্ষায় ছিলে এতদিনে তার সন্ধান পেলে। এই হাঁড়ি দুটো নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে গেলেই পারতে। এতক্ষণ বসে আছ কেন?' আসলে বৃদ্ধ রামকে পরীক্ষা করার জন্য ওই দুটো হাঁড়ি পুঁতে রেখেছিল।

'এ তো আপনার সম্পত্তি। আমি কী করে নিতে পারি?' রাম বলল।

'সেকথা ঠিক নয় বাবা। তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস। তুমি এই ধনসম্পত্তি নিয়ে গিয়ে যদি জমিদারের যোগ্য জামাই হতে পার তো নিয়ে যাও। আর তা না হলে তোমার বউকে এখানে নিয়ে এসো। তুমিই আমার ছেলের মতো থাকবে আমার কাছে। আর তোমার বউ থাকবে আমার বউমার মতো।' বৃদ্ধ বুঝিয়ে বলল।

রাম জমিদার বাড়ি গেল। বউকে নিয়ে বৃদ্ধের কাছে ফিরে এল।

৫৭. ধনী-গরিব

এক গ্রামে দুই ভাই ছিল। বড়ো ভাই ছিল ধনী আর ছোটো ভাই গরিব।

সেবছর খেতে ফসল কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। খেতে পাহারা দেবার ভার ছিল ছোটো ভাইয়ের উপর। তার মনমেজাজ খারাপ। এক কোণে বসে গালে হাত দিয়ে ছোটো ভাই ভাবছিল। এমন সময় সাদা কাপড় পরে এক নারীকে ঘুরে বেড়াতে দেখল সে। খেতে এভাবে এক নারীর ঘোরাফেরা দেখে ছোটো ভাইয়ের মনে কৌতূহল জাগল।

কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ছোটো ভাই প্রশ্ন করল, 'বোন, তুমি কে? কেন ঘুরছ?'

'আমি তোমার বড়ো ভাইয়ের ভাগ্যদেবী। যেসব খড়কুটো ছড়ানো আছে তা কুড়িয়ে পোড়াচ্ছি। কাজে লাগবে। খেতে ফসল ভালো হবে।' নারীমূর্তি জবাবে বলল।

'তাই বুঝি? আচ্ছা, আমার ভাগ্যদেবী কোথায়?' ছোটো ভাই বলল।

ওই সামনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ওপারে যাও, দেখতে পাবে তোমার ভাগ্যদেবীকে।' বলেই নারীমূর্তি অদৃশ্য হলেন। ছোটো ভাই ঠিক করে ফেলল ভাগ্যদেবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। সোজা নিজের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সামান্য কিছু যা ছিল তা পোঁটলা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই উনানের পিছন থেকে দারিদ্রদেবী উঠে 'হাউমাউ' স্বরে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ কেঁদে বলল, 'আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আর যেতেই যদি হয়, আমাকে সাথে নিয়ে যাও।'

ছোটো ভাই অনেক বোঝাল। তাকে অনেক দূর যেতে হবে। অনেক পথ হাঁটতে হবে। সে তার সাথে অতটা পথ হাঁটতে পারবে না। কিন্তু দারিদ্রদেবী তাকে কোনোক্রমেই ছাড়তে রাজি হল না।

অবশেষে ছোটো ভাই বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকেও সাথে নিচ্ছি। তুমি এই বোতলে ঢুকে পড়।'

দারিদ্রদেবী ছোটো হয়ে ওই বোতলে ঢুকে পড়ল। ছোটো ভাই বোতলে জোরে ছিপি এঁটে দিল। বেরিয়ে পড়ল ওটা নিয়ে। পথে এক জায়গায় কাদা ভরে ছিল। সে ওই বোতলটাকে কাদায় ঢুকিয়ে নিজের পথে হাঁটতে লাগল।

অনেক দিন হাঁটার পর ছোটো ভাই দক্ষিণী পাহাড়ের ওপারে পৌঁছাল। ছোট্ট একটি শহর। সেই শহরের কয়েক জন ভদ্রলোক ছোটো ভাইকে বলল, 'আমাদের জন্য একটা

ডোবা খুঁড়ে দিতে হবে। মজুরী দেব না। তবে খুঁড়তে খুঁড়তে যা পাবে তা তোমাকে দিয়ে দেব।'

এই শর্তে ছোটো ভাই রাজি হয়ে গেল। কাজে হাত দিল। ঘণ্টা খানেক খুঁড়তেই সে অনেক সোনা পেল। ভদ্রলোকরা ছোটো ভাইকে সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে বলল। কিন্তু ছোটো ভাই অর্ধেক সোনা ওদের দিয়ে নিজে অর্ধেক সোনা নিল।

সোনা পেয়ে ছোটো ভাই কাজ থামিয়ে দেয়নি। কাজ করে যেতে লাগল। যত মাটি খোঁড়ে তত পায় সোনা মণি মুক্তো জহরত। আর পেল একটা বাক্স। সেই বাক্সের ভিতর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি বাক্স খোল।'

ছোটো ভাই বাক্স খুলল। তার ভিতর থেকে এক নারী বেরিয়ে এল। পরনে তার সাদা কাপড়।

'কে তুমি?' ছোটো ভাই সেই নারীকে প্রশ্ন করল।

'আমি তোমার ভাগ্যদেবী। তুমি তো আমারই খোঁজে বেরিয়েছ? আজ থেকে আমি তোমার বাড়িতেই থাকব। তোমাকে ছেড়ে যাব না।' এ-কথা বলে ওই নারী অদৃশ্য হলেন।

খোঁড়ার সময় যা পাওয়া গেল সব আধা আধি ভাগ হয়ে গেল। ভদ্রলোক পেল অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক নিল ছোটো ভাই।

ছোটো ভাই ফিরল নিজের গ্রামে। নিজে যে অতীতে গরিব ছিল তা সে কোনোদিন ভুলল না। গরিবদের যতটা পারল সাহায্য করল সারাজীবন।

একদিন পথে দুই ভাইয়ের মুখোমুখি দেখা। ছোটো ভাই সাদরে বড়ো ভাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কয়েক দিন খাইয়ে পরিয়ে অনেক কাপড় জামা ও দামি জিনিস উপহার দিয়ে বিদায় দিল। ওই ক-দিন দুই ভায়ের মধ্যে অনেক কথা হল। ছোটো ভাইয়ের এত বিষয়সম্পত্তি দেখে বড়ো ভাইয়ের ঈর্ষা হল। মনে মনে ঠিক করল দারিদ্রদেবীকে আবার ছোটো ভাইয়ের ঘরে এনে ছেড়ে দেবে।

সে ছোটো ভাইয়ের কাছে শুনেছিল কোন জায়গার কাদায় দারিদ্রদেবীকে পুঁতে রাখা আছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড়ো ভাই ওই বোতল পেল। ছিপি খুলে দিল সে। পরক্ষণেই বোতলের ভিতর থেকে দারিদ্রদেবী বেরিয়ে বড়ো ভাইয়ের গলায় ঝুলে বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচালে। তোমার এই উপকারের কথা জীবনে ভুলব না। আমি সারাজীবন তোমার ঘরেই থাকব।'

বড়ো ভাই কত চেষ্টা করল ওই দারিদ্রদেবীকে আবার ওই বোতলে পুরে রাখার। কিন্তু সে কোনোক্রমেই পারল না। ছোটো ভাইয়ের কাছ থেকে যা পেয়েছিল পথেই লুণ্ঠনকারীরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। বাড়ি ফিরে সে দেখল, তার বাড়ি, ধানের গোলা প্রভৃতি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বন্যার জলে ভেসে গেছে তার খেতের ফসল। বড়ো ভাইয়ের নিজের বলতে আর কিছুই রইল না।

৫৮. পৈতার ওজন

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। লেখাপড়া জানত না। কিন্তু টাকাপয়সা রোজগারের ইচ্ছা তার ছিল প্রবল।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ অন্য এক গ্রামে গেল। গ্রামে মণ্ডপে এক বুড়ো বসে পৈতা বিক্রি করছিল। একটি পাল্লায় তামার পয়সা, রুপোর মুদ্রা দিয়ে পৈতা নিয়ে নিত। ওজনের সাথে পৈতা কেনা-বেচার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এই ব্যাপারটা লক্ষ করে গ্রামের ওই ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দেখে বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, 'মশাই, আমি খুব গরিব, আমাকে একটা পৈতা দান করবেন?'

বুড়ো গরিব ব্রাহ্মণকে একটা পৈতা দিল। ব্রাহ্মণ ওই দেশের রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার কাছে এক অমূল্য পৈতা আছে। আপনি এই পৈতা নিয়ে এর সমান ওজন সোনা পাইয়ে দিন।'

রাজা ব্রাহ্মণের কথায় রাজি হলেন। মন্ত্রী একটা দাঁড়িপাল্লা আনালেন। একটা পাল্লায় পৈতা রেখে অন্য পাল্লায় সোনা রাখলেন। কিন্তু পৈতার ওজন বেশি ছিল। মন্ত্রী পাল্লায় আরও একটু সোনা রাখলেন। তাতেও পৈতার দিকের পাল্লাই ভারী ছিল। মন্ত্রী একটু একটু করে সোনা বাড়াতে লাগলেন কিন্তু পৈতার ওজন তখনও ভারী ছিল।

ফলে রাজা ও মন্ত্রী একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রীর মাথায় একটা মতলব এল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে বলেলেন, 'এখন খাবার সময় হয়ে গেছে। খেয়ে এসে আমরা তোমার পৈতার ওজনের সমান সোনা দেব।'

মন্ত্রী চাল আনালেন। পৈতার সমান ওজনে চাল ওজন করিয়ে খেতে দিল। সেই চাল ছিল মাত্র এক পোয়া ওজনের সমান। রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হল। ব্রাহ্মণের পেট ভরে গেল।
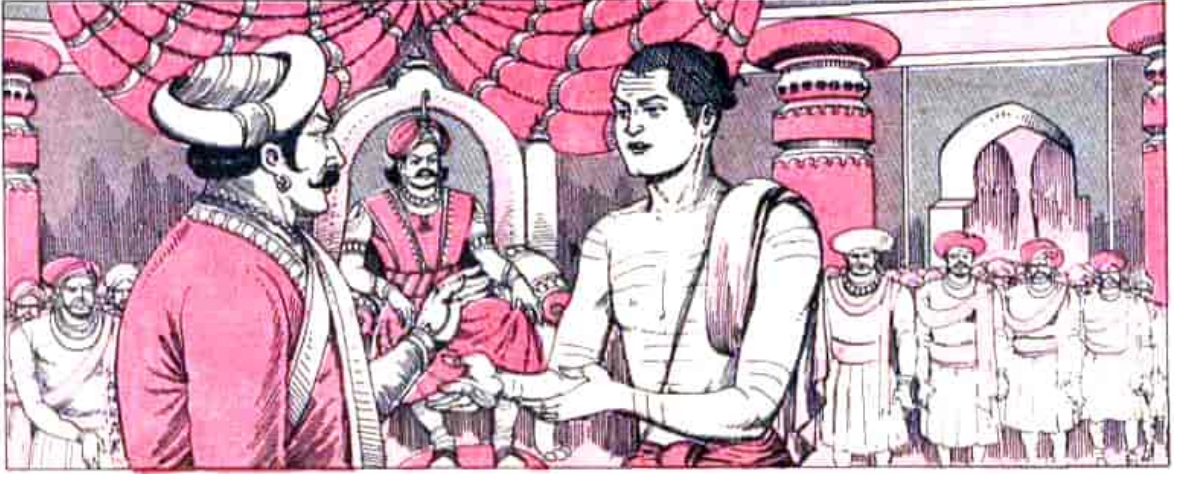
তারপর মন্ত্রী রাজাকে গোপনে বললেন, 'মহারাজ, আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। এই পৈতার ওজন ব্রাহ্মণের নিজের আকাঙ্খার ওপর নির্ভরশীল। সেইজন্যই এক-পো চালেই পৈতার সমান ওজন হয়ে গেছে। ওই পরিমাণ সোনায় ব্রাহ্মণের আকাঙ্খা মিটবে না?'

'তাহলে এখন কী করা যায়? আমি যে তাকে কথা দিয়েছি তার পৈতার ওজনের সমান সোনা দেব বলে।' রাজা বললেন।

'আপনি এই কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।' মন্ত্রী বললেন।

ব্রাহ্মণ খাওয়ার পর মাত্র কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে এসে বলল, 'পৈতার সমান ওজনের সোনা দিয়ে বিদায় করে দিন।'

'আমি তোমাকে সোনা দিতে পারি। কিন্তু তুমি তো সেই সোনা বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। পথে খোওয়া যাবে। চোর ডাকাতের হাত থেকে অত সেনা বাঁচিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া তোমার কর্ম নয়। তুমি তো দেখলে তোমার পৈতার ওজন এক-পো চালের সমান। তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক দিন রাজার বাড়িতে এসে এক-পো চালের ভাত খেয়ে যেতে পার। এখন তুমি ভেবে বল, কী চাও? সোনা নেবে না রোজ খেয়ে যাবে?' মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রাহ্মণ ভাবল তার পৈতার ওজন এক-পো সোনার সমান হবে। সে বলল, 'আমি প্রত্যেক দিন রাজার বাড়িতে খেয়ে যাব।'

৫৯. বুদ্ধি

এক রাজার একটি মাত্র মেয়ে ছিল। রাজার মেয়ে খুব কথা বলতে পারত। তাই রাজা ঘোষণা করলেন, যে যুবক নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে রাজকুমারীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারবে তার সাথে রাজকুমারীর বিয়ে হবে এবং অর্ধেক রাজত্বও তাকে দেওয়া হবে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকুমারীকে পাবার আশায় বহু দেশের যুবক এসেছিল। কিন্তু প্রত্যেকে রাজকুমারীর প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে ফিরে গেল।

শেষে রাজা বিরক্ত হয়ে একটা শর্ত ঘোষণা করে দিলেন, যে যুবক ব্যর্থ হবে তার কান গরম শলাকা দিয়ে জ্বালানো হবে।

রাজকুমারীর বিয়ের কথা শুনে তিন ভাই বেরিয়ে পড়ল। পথে একটা মরা ময়না দেখতে পেল। তৃতীয় ভাইটি ওই ময়নাটাকে হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলতো আমি কী পেয়েছি?'

'আরে ওটাকে ফেলে দে। ওটা দিয়ে কী হবে?' বড়ো ভাই ধমক দিল।

'হয়তো কোনো কাজে আসতে পারে।' এ-কথা বিড়বিড় করে বলে ছোটো ভাই মরা ময়নাটাকে লুকিয়ে ফেলল।

কিছু দূর যাওয়ার পর ছোটো ভাই পর পর পেল, একটি মাটির পাত্র, ভেড়ার দুটো সিং, একটি কাঠের খুঁটি ও একটি ছেঁড়া জুতো।

বড়ো ভাই প্রত্যেকটা কুড়োনোর সময় বারণ করছিল কিন্তু ছোটো ভাই প্রত্যেকটাই লুকিয়ে নিয়ে চলল।

প্রথমে বড়ো ভাই রাজকন্যার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলল, 'আজকের দিনটি বেশ মনোরম। তবে এখানে খুব গরম।'

'ওটা আরও গরম।' বলে রাজকন্যা একটা জ্বলন্ত চুল্লি দেখাল। তাতে ছিল দুটো শলাকা। জ্বলন্ত শলাকা দেখে বড়ো ভাইয়ের মুখে কথা সরল না।

দ্বিতীয় ভাইটির বেলায়ও তাই হল।
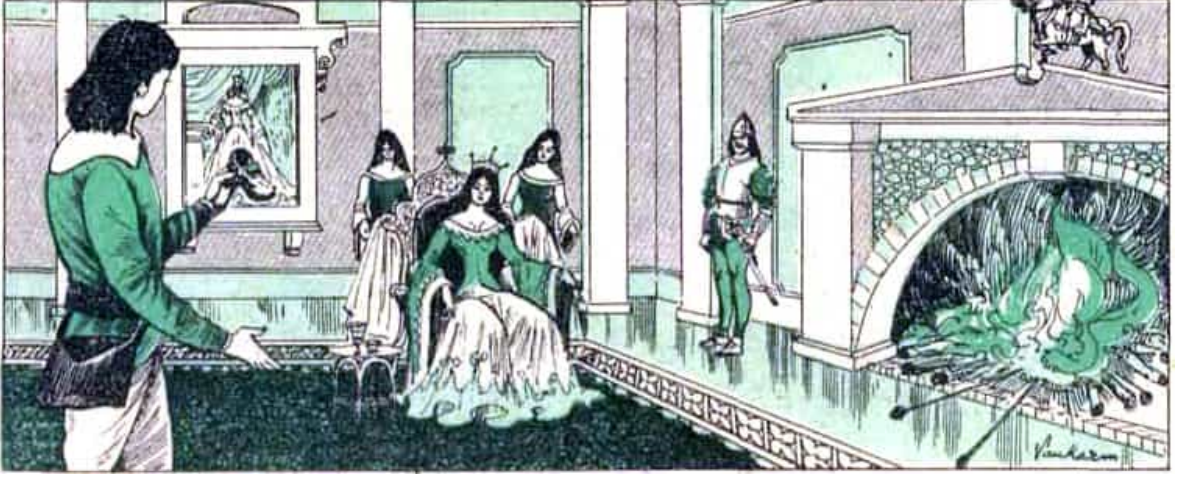
তৃতীয় ভাই বলল, 'আজ খুব ভালো দিন। এখানে তত গরম বা ঠান্ডা নেই।'

রাজকুমারী জ্বলন্ত চুল্লি দেখিয়ে বলল, 'ওদিকে গরম দেখতে পাওয়া যাবে।'

'ওই চুল্লিতে এই ময়না ভেজে নিতে পারি।' ছোটো ভাই বলল।

'ওটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাবে।' রাজকুমারী বলল।

'এই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা যাবে।' ছোটো ভাই জবাব দিল।

'দড়িটা ঢিলে হয়ে ছিঁড়ে যাবে।' রাজকুমারী বলল।

'এই খুঁটিটা গুঁজে আরও শক্ত করে নেওয়া যাবে।' ছোটো ভাই জবাবে বলল।

'প্রত্যেক কথা পেঁচিয়ে বলার অভ্যাস দেখছি বেশ আছে।' রাজকুমারী বলল।

'আমার কথা আর কতটুকু প্যাঁচানো, এটাকে দেখুন।' ছোটো ভাই ভেড়ার একটা সিং বের করে দেখাল।

'এ-রকম জিনিস তো আমি কোথাও দেখিনি।' রাজকুমারী বলল।

'এই ধরনের আরও একটা আছে এই যে।' ছোটো ভাই অন্য সিং দেখাল।

'আমাকে পরাজিত করার জন্য অনেক খানি দলিত হতে হচ্ছে দেখছি।' রাজকুমারী বলল।

'আমি দলিত হই না, দলিত হয় এই জুতো।' ছোটো ভাই জুতো বের করে দেখাল।

তারপর রাজকুমারীর মুখে আর কথা সরল না। অবশেষে রাজকুমারী নিজের পরাজয় স্বীকার করল। ছোটো ভাই পেল অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

৬০. চুরি বিদ্যা

প্রাচীন কালে কোনো এক রাজার দরবারে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। একবার দরবারে প্রশ্ন ওঠে কোন বিদ্যা সবচেয়ে কঠিন। বিভিন্ন পণ্ডিত নিজের মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দরবারের ওই মহাপণ্ডিত বলেন, 'মহারাজ, সবচেয়ে কঠিন বিদ্যা হল চুরি বিদ্যা।'

এই কথা শুনেই রাজা রেগে গিয়ে বললেন, 'তা কী করে হয়? যে লেখাপড়া করে না, সেই তো চুরি করে। চোরদের মধ্যে প্রতিভাশালীকে দেখতে পাই না।'

'মহারাজ, পরীক্ষার মধ্য দিয়েই সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হয়। চুরি করতে গেলেই টের পাবেন চুরি বিদ্যা কত কঠিন।' মহাপণ্ডিত বললেন। রাজাও পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

'আপনি এই পোশাকে গেলে আপনি যা চাইবেন, যা নেবেন কেউ কিছু বলবে না। চোর এমন পোশাক পরে চুরি করতে যায় যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। সবার চোখে ধুলো দিয়ে তাকে চুরি করে আনতে হয়। আপনারও উচিত অন্য পোশাকে চুরি করতে যাওয়া।' মহাপণ্ডিত বললেন।

রাজা তাতে রাজি হলেন। রাজা গায়ে মেখে নিলেন কাঠকয়লার গুঁড়ো। কালো পোশাক পরে নিলেন। মাঝরাতের অন্ধকারে বেরুলেন। রাজা ধনীদের পাড়ার দিকে গেলেন প্রথমে। কিন্তু ধনীদের বাড়ির ভেতর ঢোকা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাড়ির দরজা বিরাট এবং মজবুত। বাড়ির সামনে পাহারাদার বসানো। রাজা বুঝলেন বড়ো লোকের পাড়ায় চুরি করা সম্ভব নয়।

রাজা ভাবলেন মহাপণ্ডিত তো আর বড়ো লোকের বাড়িতেই চুরি করতে হবে এমন কোনো কথা বলেননি। যেকোনো বাড়ি থেকে ছোটোখাটো জিনিস চুরি করলেই পারি। আমি চুরি করতে পারলেই মহাপণ্ডিতের মত ভুল প্রমাণিত হবে। রাজা এবার গরিবদের বস্তিতে গেলেন। সেখানেও বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ ছিল।

অবশেষে এক কুমোরের বাড়ির সামনে দেখতে পেলেন মাটির হাঁড়ি থরে থরে সাজানো আছে। বাড়ির ভিতরে লোক ঘুমোচ্ছে। রাজা ভাবলেন এর থেকে একটা হাঁড়ি চুরি করতে পারলেই তো হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে উপরে যে হাঁড়ি আছে তা নাবানো যায় না। হাতের নাগালের বাইরে সেই হাঁড়ি। তাই মাঝের একটি হাঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে টান দিলেন। সাথে সাথে হুড়মুড় করে উপরের হাঁড়িগুলো পড়ে যেতে লাগল রাজার উপর। রাজা নীচে পড়ে গেলেন। তার মাথায় গায়ে চারপাশে হাঁড়ির ঢিপি।

হুড়মুড় করে হাঁড়িগুলো পড়ার আওয়াজ পেয়ে কুমোর বাড়ির সবাই জেগে গেল। বেরিয়ে চোরকে দেখেই সবাই 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে উঠল। প্রতিবেশীরা রাজাকে চিনতে পারল না। চোর ভেবেই রাজাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে বলতে লাগল, 'ব্যাটা, হারামজাদা, চুরি করার আর জিনিস পাওনি। লোকে ঘটি বাটি চুরি করে আর তুমি এসেছে কিনা মাটির জিনিস চুরি করতে! উঁ। পাজি। নচ্ছার! একটা হাঁড়ি চুরি করতে হাজারটা হাঁড়ি ভাঙলে।'

রাজা ধোলাই খেয়ে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলেন ভোর রাত্রে।

পরের দিন দরবারে রাজা মহাপণ্ডিতকে বললেন, 'পণ্ডিত মশাই, আপনার কথাই ঠিক। চুরি বিদ্যাই সবচেয়ে কঠিন।'

আরও দুটি বই...

চাঁদমামা
বেতাল কথা সমগ্র

চাঁদমামা
সেরা উপন্যাস সমগ্র

Table of Contents